চল-বিদ্যুৎ

রায়-সাহেব

শ্রীজগদানন্দ রায়-প্রণীত

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ,

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস্‌—২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

১৯২৯

[স্বত্ব রক্ষিত] [মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড —এলাহাবাদ

প্রাপ্তিস্থান :—
(১। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা
২। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

প্রিণ্টার
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—বেনারস ব্রাঞ্চ

নিবেদন

"চল-বিদ্যুৎ" প্রকাশিত হইল। আজকাল ঘরে-বাহিরে বিদ্যুতের নানা কার্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু কি-প্রণালীতে সেই সকল কার্য্য চলে, অবৈজ্ঞানিক সাধারণ লোকের তাহা জানিবার উপায় নাই। বিদ্যুৎ-তত্ত্বের মূল সূত্রগুলি দুর্ব্বোধ্য বিদেশী ভাষায় লিখিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তকে ছড়াইয়া আছে। এই সকল পুস্তকের আলোচ্য বিষয়গুলি যাহাতে আমাদের বালক-বালিকারা এবং অন্তঃপুরের মহিলারাও বুঝিতে পারেন, রচনাকালে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমার বিশ্বাস, অবৈজ্ঞানিক পাঠকমাত্রেই আলোচিত বিষয়গুলি বুঝিতে পারিবেন; তা'ছাড়া যে-সকল ছাত্র কলেজে বিজ্ঞান-শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা মাতৃভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানি একবার পড়িয়া লইলে বিশেষ উপকার পাইবেন। ইহাই চল-বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বাংলা ভাষার প্রথম পুস্তক। রচনা-কালে কাহারো সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণের সৌভাগ্য ঘটে নাই। যদি ইহাতে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকে, বিজ্ঞ পাঠক ক্ষমা করিবেন।

বিদ্যুৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সকল বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দ সাধারণের নিকটে সুপরিচিত, সেগুলির কিম্ভূতকিমাকার বাংলা পরিভাষা গড়িয়া পুস্তকে ব্যবহার করি নাই। জর্ম্মান্ পণ্ডিতেরা যে-পরিভাষার গঠন করিয়াছেন, ইংরেজ-বৈজ্ঞানিকেরা

তাহা অসঙ্কোচে ব্যবহার করেন; আবার ইংরেজেরা যে-সকল পরিভাষা রচনা করিয়াছেন, সেগুলিকে ফরাসী জাপানী বা রুশ বৈজ্ঞানিকেরা ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা দেখা যাইতেছে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ বিদেশী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আমরা কেন আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকে ব্যবহার করিব না, তাহার কোনো হেতু পাওয়া যায় না। সংস্কৃত-ভাষামূলক কটমটো দেশী পরিভাষা বৈদেশিক পরিভাষার চেয়ে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে করি।

পরিশেষে নিবেদন, "চল-বিদ্যুৎ" পড়িবার পূর্ব্বে যদি পাঠক আমার প্রণীত "চুম্বক" ও "স্থির-বিদ্যুৎ" নামক পুস্তক দুইখানি একবার পড়িয়া লইতে পারেন, তবে আলোচিত বিষয়গুলি বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই পুস্তকের কোনো কোনো স্থলে উক্ত দুই পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের উল্লেখ আছে।

বাংলা বৈজ্ঞানিক পুস্তকের আদর আমাদের দেশে নাই। ইহা ধ্রুব সত্য। ইহা জানিয়াও এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস বহু ব্যয়ে পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলেন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। এই সুযোগে প্রকাশক মহাশয়গণকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ বিনায়ক মেসেজি পুস্তকের প্রচ্ছদ-পট অঙ্কিত করিয়া আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শান্তিনিকেতন,
বৈশাখ, ১৩৩৬

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সূচীপত্র

প্রথম কথা	১
প্রবাহ-আবিষ্কারের ইতিহাস	৬
ভল্‌টার পাইল্‌ ও বিদ্যুৎ-কোষ	৯
কোষে রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রবাহক-বল ...	১৫
কোষ-নির্ম্মাণে সতর্কতা	২৩
বিদ্যুৎ-পথে বাধা ও বিদ্যুতের পরিমাণ ...	২৮
ওম্‌সের নিয়ম	৩৩
বৈদ্যুতিক পরিমাপ	৩৫
বাধার পরিমাণ নির্দ্ধারণ	৪২
রিওষ্টাট্‌	৪৮
কয়েকটি বিদ্যুৎ-কোষের বিবরণ	৫৩
বিদ্যুৎ-কোষের ব্যাটারি	৬৬
সণ্ট্‌স্‌	৭৩
বিদ্যুতের শক্তি	৭৭
বিদ্যুতের তাপ	৮২
বৈদ্যুতিক দীপ	৮৯
বৈদ্যুতিক চুল্লী	৯৯

বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ ১০৩

সঞ্চয়ক কোষ ১১১

বিদ্যুৎ-প্রবাহ ও চুম্বকত্ব ১১৭

বিদ্যুৎ-প্রবাহের বলক্ষেত্র ১২৩

গ্যাল্‌ভ্যানোমিটার, আম্পিয়ারমিটার এবং ভোল্‌ট্‌মিটার ১৩৫

বৈদ্যুত-চুম্বক ও টেলিগ্রাফ্‌ ১৪৯

বৈদ্যুতিক প্রবাহের আবেশ ১৬৩

রুম্‌কর্ফের বেষ্টনী ১৭৭

আত্ম-আবেশ ১৮৪

ডাইনামো অর্থাৎ বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র ১৮৭

বৈদ্যুত মোটর ১৯৯

ট্রান্স্‌ফর্‌মার্‌ ২০৫

টেলিফোন্‌ ২১১

মাইক্রোফোন্‌ ২১৭

বাষ্পের ভিতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ২২০

বৈদ্যুত-তরঙ্গ ২৩২

বেতার টেলিগ্রাফ্‌ ২৩৯

বেতার টেলিফোন্‌ ২৪৯

চল-বিদ্যুৎ

প্রথম কথা

তোমরা আগে অনেক পরীক্ষায় দেখিয়াছ, ধনবিদ্যুৎ-যুক্ত কোনো জিনিষকে ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ আর একটা জিনিষের কাছে আনিলে প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়ে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ যায়। যে-বিদ্যুৎ এই রকমে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যায়, তাহাকেই চল-বিদ্যুৎ বা বিদ্যুতের প্রবাহ বলে। এক জায়গার জল ধারাকারে আর এক জায়গায় যাইতে থাকিলে, আমরা যেমন তাহাকে জলের প্রবাহ বলি, ইহাও সেই রকমের বিদ্যুৎ-প্রবাহ।

একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে কর, একটা লীডেন্ জারকে * বিদ্যুৎ-যুক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ উহার বাহিরের পর্দ্দায় ধন-বিদ্যুৎ এবং ভিতরের

---

* লীডেন্ জারের বিবরণ গ্রন্থকারের 'স্থির-বিদ্যুৎ' নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

পর্দ্দায় ঋণ-বিদ্যুৎ জমা আছে। এখন যদি ধাতুর তার বা অন্য কোনো পরিচালক দ্রব্য দিয়া দুই পিঠকে যোগ করা যায়, তাহা হইলে কি হয়, বলা যায় না কি? সেই পরিচালক দ্রব্য বহিয়া বাহিরের বিদ্যুৎ নিমেষে ভিতরের বিদ্যুতে গিয়া মিশে। বাহির পর্দ্দা হইতে ভিতর পর্দ্দায় বিদ্যুতের এই যে সঞ্চলন, তাহাকেই আমরা বিদ্যুতের প্রবাহ বলিতেছি। লীডেন্ জারে এই প্রবাহ ক্ষণিক—এক সেকেণ্ডকে হাজার হাজার ভাগ করিলে যে-একটু সময় পাওয়া যায়, সেই সময়ের মধ্যেই প্রবাহ শেষ হয়। বিদ্যুৎ-কোষ দিয়া বা ডাইনামো দিয়া যে-প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়, তাহা ক্ষণিক নয়। এগুলি দিয়া যতক্ষণ-ইচ্ছা প্রবাহ চালানো যায় এবং চালাইয়া তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করা চলে। কেবল ইহাই নয়, এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিয়াই পাখা ঘুরানো যায়, ট্রাম্‌গাড়ি চালানো যায়, টেলিগ্রাফে ও টেলিফোনে খবর পাঠানো যায় এবং আরো-কত-কি কাজ করা যায়। সুতরাং আজকালকার দিনে বিদ্যুতের প্রবাহ সামান্য ব্যাপার নয়।

কিন্তু মনে রাখিয়ো, বৈদ্যুত-যন্ত্রের কাছে আঙুল রাখিলে যন্ত্র হইতে আঙুলের ডগায় বিদ্যুতের

যে-সঞ্চলন হয়, এক মেঘের বিদ্যুৎ অন্য মেঘে লাফাইয়া যে ক্ষণিক সঞ্চলন দেখায়, বিদ্যুতের প্রবাহের সহিত গোড়ায় তাহাদের কোনো তফাৎ নাই। তফাৎ আছে কেবল বিদ্যুতের পরিমাণে ও শক্তিতে। বৈদ্যুত-যন্ত্রে যে-বিদ্যুৎ জন্মে, তাহা পরিমাণে অল্প, কিন্তু তাহার চাপ অর্থাৎ শক্তি অত্যন্ত বেশি। তাই তাহার প্রবাহ ক্ষণস্থায়ী। হাউই-বাজির মতো হুস্ করিয়া চলিলেই তাহার সব শেষ হয়। বিদ্যুৎ-কোষে বা ডাইনামোতে যে-বিদ্যুৎ জন্মে, তাহা পরিমাণে খুব বেশি, কিন্তু শক্তিতে অল্প। তাই উহার প্রবাহ আমাদের বাংলা দেশের মরা নদীর জলের প্রবাহের মতো চলে।

একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি বিষয়টা ভালো বুঝা যাইবে। মনে কর, ছাদের উপরে একটা ছোটো পাত্রকে জলে ভর্ত্তি করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহার তলায় যেন একটা সরু রবারের নল লাগানো আছে। আর একটা খুব বড় পাত্রকে অনেক জলে ভর্ত্তি করিয়া মাটি হইতে দুই হাত উঁচুতে রাখা হইয়াছে। ইহারো তলায় একটা রবারের নল লাগানো আছে, কিন্তু তাহার ফাঁদ প্রথম নলের ফাঁদের চেয়ে অনেক বেশি।

নলের মুখ খুলিয়া দিলেই, দুই পাত্রেরই জল নল দিয়া বাহির হইবে। কিন্তু দশ হাত উঁচু ছাদের ছোট পাত্রের সরু নল দিয়া যে-জল বাহির হইবে, তাহা পরিমাণে ও জোরে দুই হাত উঁচু মোটা নলের জলের কখনই সমান হইবে না। উঁচু পাত্রের জল সরু নল দিয়া সরু ধারায় বাহির হইবে এবং নীচু পাত্রের জল মোটা ধারায় বাহির হইবে। উঁচু পাত্রের সরু নল হইতে যে জলধারা পাওয়া যাওয়া যায়, তাহা যেমন পরিমাণে অল্প এবং জোরে বেশি, লীডেন জারের বিদ্যুৎ-প্রবাহের অবস্থাও তাই,—ইহা পরিমাণে অল্প কিন্তু জোরে বেশি। আবার নীচু পাত্রের মোটা জলধারা যেমন পরিমাণে বেশি এবং জোরে অল্প, বিদ্যুৎ-কোষ বা ডাইনামোর বিদ্যুৎ-প্রবাহে অবিকল তাহাই দেখা যায়। ইহার প্রবাহে জোর কম থাকিলেও বিদ্যুৎ থাকে বেশি।

এই ত গেল বিদ্যুৎ-প্রবাহের মোটামুটি কথা। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহটা যে কি, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। ধন-বিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুৎ জিনিষটা কি, তাহা ইলেকট্রন্ দ্বারা তোমাদিগকে আগে বুঝাইয়াছি। *

* গ্রন্থকারের "স্থির-বিদ্যুৎ" নামক পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আজ-কালকার বৈজ্ঞানিকেরা সেই ইলেক্‌ট্রনেরই সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের স্বরূপ বুঝাইতেছেন। তাঁহারা বলেন, বিদ্যুতের প্রবাহ-ব্যাপারটা ইলেক্‌ট্রনের প্রবাহ ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ যখন কোটি কোটি ইলেক্‌ট্রন্‌ কোনো পরিচালক জিনিষকে আশ্রয় করিয়া অবিরাম ছুটিয়া চলে, তখন আমরা এই ইলেক্‌ট্রনের স্রোতকেই বিদ্যুতের প্রবাহ বলি।

প্রবাহ-আবিষ্কারের ইতিহাস

কাচে রেশম ঘষিলে যে-স্থির বিদ্যুৎ জন্মে এবং তাহা যে হাল্কা জিনিষকে আকর্ষণ করে, ইহা অনেক আগে লোকে জানিত। কিন্তু জলের প্রবাহের মতো যে বিদ্যুতেরও প্রবাহ আছে, তাহা এক শত ত্রিশ বৎসর আগেকার বৈজ্ঞানিকদেরও জানা ছিল না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এক দিন গ্যালভনি-(Galvani) নামক ইটালির এক জন বড় বৈজ্ঞানিক একটা ব্যাঙ্ মারিয়া তাহার পেশী, স্নায়ু প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। মরা ব্যাঙ্টা তামার আংটায় ঝুলানো ছিল এবং কাছেই লোহার গরাদে ছিল। হঠাৎ এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা গেল। মরা ব্যাঙের দেহ যেমনি গরাদের গায়ে ঠেকিতে লাগিল অমনি

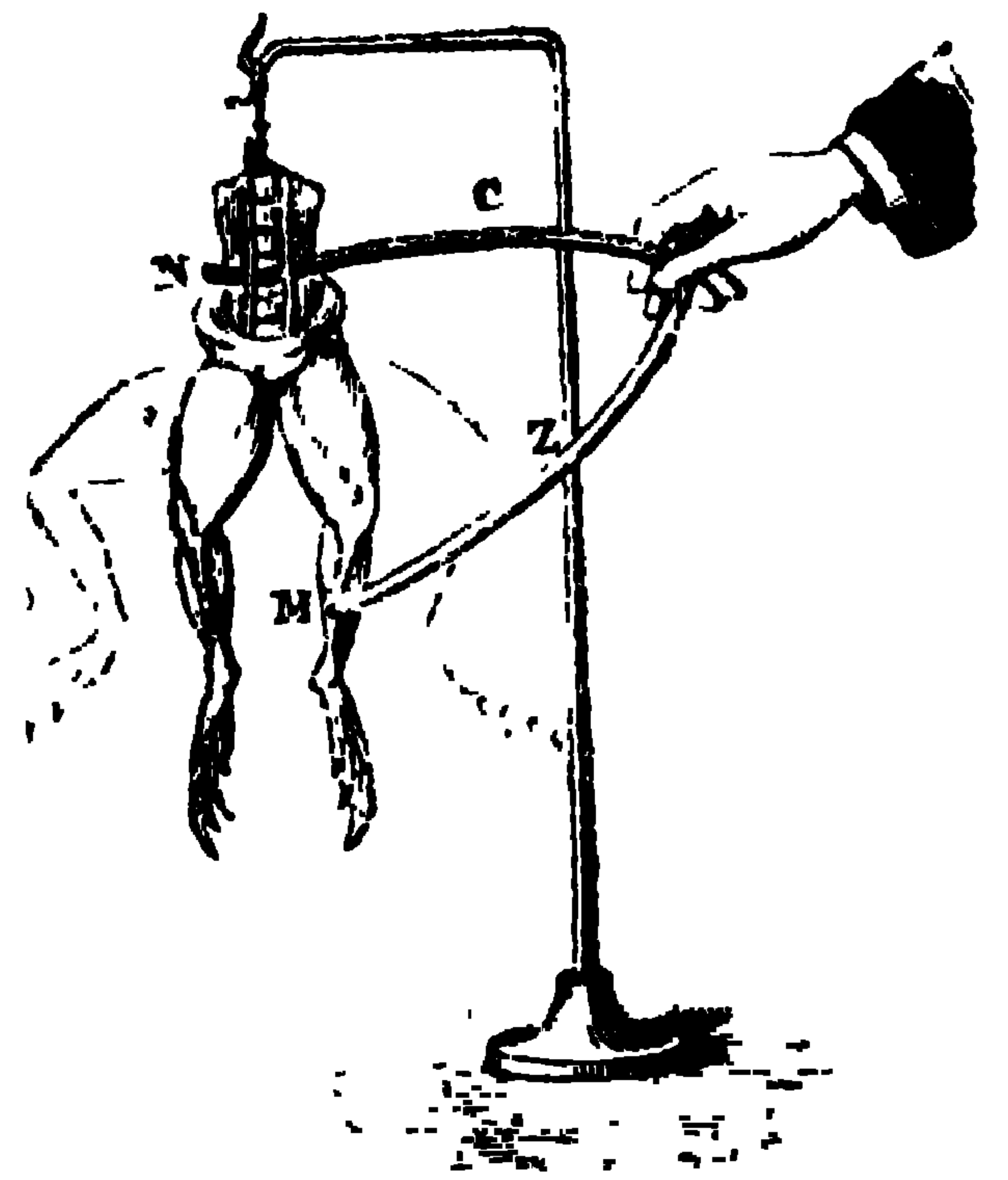

ভলটার পরীক্ষা

সেটা জ্যান্ত ব্যাঙের মতো পা ছুড়িতে আরম্ভ করিল। সকলেই অবাক্! গ্যালভনি আগে বিদ্যুৎ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন,—স্থির হইল, মরা ব্যাঙের পা-ছোড়া বৈদ্যুতিক ব্যাপার। কিন্তু বিদ্যুৎ আসিল কোথা হইতে? গ্যালভনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, প্রাণিমাত্রেরই শরীরে এক-রকম বিদ্যুৎ আছে। ধাতু দিয়া যখন ব্যাঙের দেহের দুই অংশ সংযুক্ত করা হইল, তখন সেই বিদ্যুৎই তাহার পা সঙ্কুচিত করিয়াছিল। এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ হইলে দেশ-বিদেশে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

এই সময়ে ইটালিতে ভল্‌টা (Alexander Volta) নামে এক মহাজ্ঞানী লোক ছিলেন। ঠিক একশত বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গ্যাল্‌ভনির সিদ্ধান্ত তাঁহার ভালো লাগিল না। তিনি নানা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, শরীরের বিদ্যুৎ মরা ব্যাঙের পা সঙ্কুচিত করে নাই,—উহার গায়ে যে-তামা ও লোহা ছোঁয়ানো ছিল, তাহাই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়াছিল এবং সেই বিদ্যুতেই তাহার পা টানিয়া ধরিয়াছিল। দুই রকম ধাতুকে একত্র করিলে যে, মরা ব্যাঙ পা ছোড়ে, তাহা ভল্‌টা সকলকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে লাগিলেন।

লোকে বুঝিল, ব্যাঙের দেহে বিদ্যুৎ জন্মে না। দুইটি ধাতুর মিলনে যে-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহাই মৃত দেহের ভিতর দিয়া সঞ্চলন করে,—কারণ, প্রাণিদেহমাত্রেই বিদ্যুতের পরিচালক।

গ্যালভনিও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ভল্‌টার কথা মানেন নাই। এই রকমে ইটালির দুইটি বড় বৈজ্ঞানিকের মধ্যে কিছুকাল ধরিয়া কথা-কাটাকাটি চলিয়াছিল। কিন্তু যাহা ধ্রুব, যাহা সত্য, কথার মারপেঁচে তাহা বেশি দিন চাপা থাকে না। এখানেও তাহা ঘটিয়াছিল। ভল্‌টা ব্যাঙকে বাদ দিয়া দুইটা পৃথক্ ধাতুকে গায়ে গায়ে লাগাইলেন এবং তাঁহার মধ্যে একটা ধাতু যে, ধনবিদ্যাতে এবং অন্যটা ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ হয়, তাহা সকলে প্রত্যক্ষ দেখিল। ভল্‌টার জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। সকলেই বুঝিল, প্রাণি-শরীরে বিদ্যুৎ নাই,—দুইটা বিভিন্ন ধাতুর যোগেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

ভল্টার পাইল্ ও বিদ্যুৎ-কোষ

পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারে ভল্টা ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তামা ও দস্তা এই দুইটি পৃথক্ ধাতুর চাক্তি তৈয়ারি করিয়া তামার উপরে দস্তা এবং তার উপরে তামা পরে-পরে সাজাইয়া একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রত্যেক তামা ও দস্তার চাক্তির মাঝে সল্‌ফিউরিক্-এসিডে-ভিজানো ন্যাকড়া রাখিয়া দিলেন। দেখা গেল, উপরকার দস্তায় ঋণ-বিদ্যুৎ এবং সকলের নীচেকার তামায় ধন-বিদ্যুৎ জমিয়াছে। তারপরে সব-তলাকার তামার সঙ্গে সব-উপরকার দস্তাকে ধাতুর তার দিয়া সংযুক্ত করায় তার দিয়া কিছুক্ষণ অবিরাম বিদ্যুতের প্রবাহ চলিতে লাগিল।

আমরা পরপৃষ্ঠায় ভল্টার সেই যন্ত্রটির একটি ছবি দিলাম। ইহার নাম ভল্টার পাইল (Voltaic pile)। ছবির Z দস্তার চাক্তি, C তামার চাকতি এবং মাঝের D-চিহ্নিত অংশটি এসিড-ভিজানো ন্যাকড়া। এই রকমে কেন বিদ্যুতের প্রবাহ চলে জিজ্ঞাসা করায়, ভল্টা বলিতে লাগিলেন, তামায় ধন-বিদ্যুৎ এবং দস্তায়

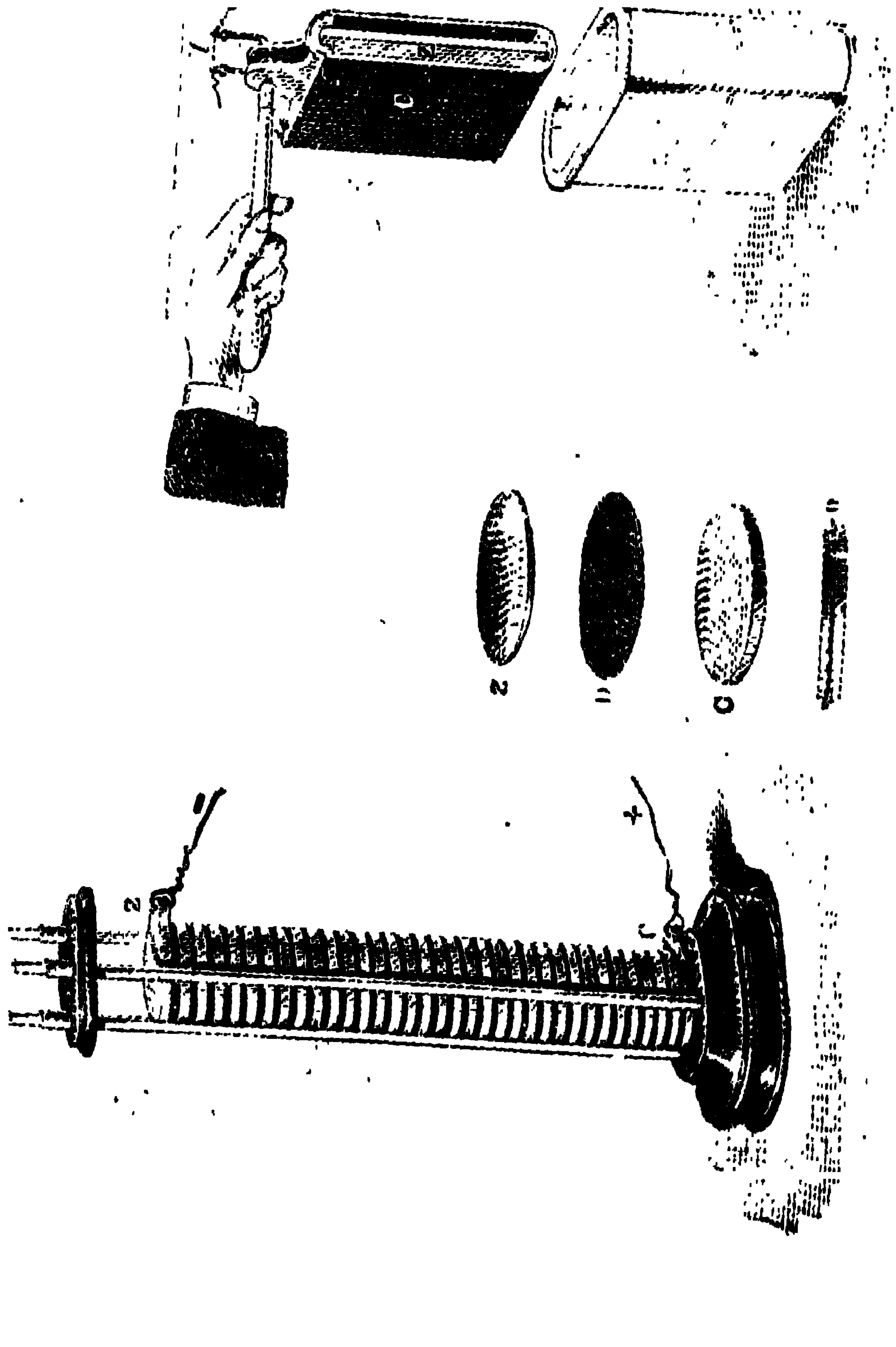

ভল্টার পাইল

ঋণ-বিদ্যুৎ একটু একটু করিয়া অবিরাম জমা হইতেছে। কাজেই, দুই চাক্‌তিকে যখন পরিচালক ধাতুর তার দিয়া যুক্ত করা যায়, তখন একের ধন-বিদ্যুৎ অপরের ঋণ-বিদ্যুতের সহিত মিলিবার জন্য তারের ভিতর দিয়া অবিরাম ছুটিয়া চলে।

একশত বৎসরের কিছু আগে গাল্‌ভনির সূচনায় ভল্‌টা এই যে আবিষ্কারটি করিয়াছিলেন, তাহা বিজ্ঞানের এবং সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি তামার উপরে দস্তাকে সাজাইয়া যে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিচয় পাইয়াছিলেন, আজ-কালকার সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রই তাহারি উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই এক শতাব্দীর মধ্যে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক নানা চেষ্টায় ক্ষীণ প্রবাহকে প্রবল করিয়া আজ পৃথিবীতে ভেল্‌কি-বাজি দেখাইতেছেন। আজ যদি সেই একশত বৎসরের আগেকার বুড়া ভল্‌টাকে আনিয়া বিজলী বাতিতে আলোকিত তোমাদের ঘরে বসানো যায় এবং তার পরে বেতার টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনে খবর শুনানো যায়, তবে তাঁহার অবস্থা কি হয়, ভাবিয়া দেখ! তিনি বোধ করেন, এ যেন একটা স্বপ্নলোক। তাঁহারি আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা এই সব ব্যাপার

যে সম্ভবপর, বোধ করি তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই।

তোমরা স্মরণ রাখিয়ো, আজকাল বিজ্ঞানের সাহায্যে যা-কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহার গোড়ায় আছেন গ্যাল্‌ভনি ও ভল্‌টা। তার-পরে আছেন ইংলণ্ডের বড় বৈজ্ঞানিক মাইকেল্‌ ফ্যারাডে। ফ্যারাডের আবিষ্কারের কথা তোমরা একটু-আধটু জানিয়াছ, পরে আরো জানিবে। ইঁহার জীবনের ইতিহাস বড় আশ্চর্য্যজনক। বাল্যে ও যৌবনে ছিলেন তিনি দপ্তরী। লোকের খাতাপত্র ও বই বাঁধিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তার পরে কেবল অধ্যবসায়ের গুণে সেই দপ্তরীই হইয়াছিলেন নিউটনের তুল্যমূল্য মহা-বৈজ্ঞানিক।

পাইল্‌ তৈয়ারি করিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেখানোর পরে ভল্‌টা আর যে একটি যন্ত্র তৈয়ারি করিয়াছিলেন, ১০ পৃষ্ঠার চিত্রে তাহারি মতো একটি ছবি দিয়াছি। দেখ, একটি কাচের পাত্রে "Z"-চিহ্নিত দস্তা এবং "C"-চিহ্নিত তামার ফলক রহিয়াছে এবং পাত্রে জলে-মিশানো সল্‌ফিউরিক্‌ এসিড বা লবণের জল দেওয়া আছে। যন্ত্রটিকে এই রকমে সাজাইয়া দুই ফলককে

T-চিহ্নিত তার দিয়া যুক্ত করা মাত্র তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করে।

বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য আজকাল যে-সব বিদ্যুৎ-কোষ (Cells) ব্যবহার করা হয়, তাহাদের প্রায় সকলেরই গঠন ঐপ্রকার। পাত্রে থাকে পৃথক্ দুইটি জিনিষের ফলক এবং একটা সংযোজক বস্তু, আর বাহিরে থাকে ঐ ফলক দুটিকে সংযুক্ত করিয়া তামা প্রভৃতি ধাতুর তার। কোষে কোথা হইতে কোন্ দিকে বিদ্যুৎ চলিতেছে, তাহা শরচিহ্ন দিয়া আঁকা আছে। দেখ, কোষের ভিতরে দস্তা হইতে তামায় এবং বাহিরের তারে তামা হইতে দস্তায় বিদ্যুৎ চলিতেছে। বিদ্যুৎ-কোষ মাত্রেই এই রকম চক্রাকারে বিদ্যুৎ চলে। ঠিক্ যেন নাগরদোলার পাক। ইহার কোথায় আরম্ভ এবং কোথায় শেষ তাহার ঠিকানা হয় না।

এই রকম বিদ্যুৎ-কোষ তৈয়ারি করা কঠিন নয়। তামা ও দস্তার ফলক সংগ্রহ করা সহজ। এই দুই ফলককে কাচের গ্লাসের মধ্যে পরস্পর না ঠেকাইয়া রাখিয়ো। তার পরে খানিকটা জলে খাঁটি সলফিউরিক এসিড মিশাইয়া গ্লাসে ঢালিয়া দিয়ো। এখন ফলক দুইটির বাহির অংশকে তার দিয়া যোগ করিলে ঐ-রকম

চক্রাকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিদ্যুৎ চলিতে থাকিবে। আট ভাগ জলে এক ভাগ সল্‌ফিউরিক এসিড মিশাইলেই কাজ চলিবে। কিন্তু কখনই এসিডে জল ঢালিয়ো না। ইহাতে বিপদ আছে। আগে এক মেজার গ্লাসের আট গ্লাস জল মাপিয়া কোনো কাচের-পাত্রে রাখিয়ো। তার পরে সেই মেজার গ্লাসের এক গ্লাস খাঁটি এসিড ধীরে ধীরে সেই জলে মিশাইয়ো। এই জলমিশ্রিত এসিডে দস্তা ও তামার ফলক ডুবাইলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেখা দিবে।

কোষে রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রবাহক বল

কোষে কেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়, তাহার আভাস তোমাদিগকে আগেই দিয়াছি। আবার বলিতেছি, ফলক দুটিকে এসিডে ডুবাইলে দস্তা ও তামা ক্রমাগত ধন ও ঋণ-বিদ্যুৎ সঞ্চয় করিতে থাকে। তার পরে পরিচালক দ্রব্য দিয়া পরস্পরকে সংযুক্ত করিলে এই দুই বিদ্যুৎ পরস্পর মিলিবার জন্য ছুটিয়া চলে। উঁচু জায়গা হইতে নীচে নামিতে থাকিলে যেমন জলের প্রবাহ হয়, দুই বিপরীত বিদ্যুৎ পরস্পর মিলিবার জন্য ছুটিতে থাকিলে সেই রকম বিদ্যুৎ-প্রবাহ জন্মে। কোষের ভিতরে দস্তা হইতে তামায় এবং বাহিরে তামা হইতে দস্তায় বিদ্যুৎ চলিয়া প্রবাহ সম্পূর্ণ করে। ফলক দুইটি যেন বিদ্যুতের ফোয়ারা। উহাদের সংযোজক তার কাটিয়া রাখো, চক্র সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া বিদ্যুৎ চলিবে না। এখন খুব সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে তামায়-লাগানো তারের প্রান্তে অতি-অল্প ধন-বিদ্যুৎ এবং দস্তার তারে ঋণ-বিদ্যুৎ দেখা যাইবে।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের ব্যাপারটাকে জলের চাপের উদাহরণ দিয়াও বুঝানো যায়। মনে কর, দুইটি জলের

পাত্র রহিয়াছে। প্রথম পাত্রের জলের উচ্চতা দ্বিতীয় পাত্রের জলের উচ্চতার চেয়ে বেশি। এখন দুইয়ের তলাকে একটা নল দিয়া যোগ করিলে কি হয় বলা যায় না কি? তখন প্রথম পাত্রের জল জোরে দ্বিতীয় পাত্রে প্রবেশ করিয়া দুই পাত্রের জলের-উচ্চতাকে সমান করে। কাজেই, ইহাতে প্রথমের তলা হইতে দ্বিতীয়ের তলার দিকে একটা জলের প্রবাহ হয়। কোষে বিদ্যুতের প্রবাহও কতকটা সেই রকমেরই বটে। তামার সংলগ্ন তারে ধন-বিদ্যুৎ এবং দস্তার তারে ঋণ-বিদ্যুৎ থাকে। কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তি (Potential) ধন-বিদ্যুতেই বেশি। কাজেই, তার দিয়া তামার সহিত দস্তাকে যোগ করিলে তামার বিদ্যুৎ দস্তার দিকে ছুটিয়া চলে।

দস্তা ও তামাকে এসিডে ডুবাইয়া যোগ করিলে বিদ্যুৎ জন্মে কেন,—সহজে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। এক কথায় বলা যাইতে পারে, এসিডে বা অন্য কোনো উত্তেজক জিনিষে ধাতুর যে-ফলক দুইটি ডুবানো থাকে, তাহাতে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং ইহাতেই বিদ্যুৎ জন্মে। কয়লা পুড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, ইহা আমরা সকলেই জানি। তাপ একটা শক্তি ছাড়া

আর কিছুই নয়। কয়লার মধ্যে তাহা লুকানো ছিল। পরে পুড়িবার সময়ে যেই কয়লা বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিতে লাগিল, অমনি সেই আবদ্ধ শক্তি মুক্ত হইয়া তাপের কাজ দেখাইতে লাগিল। বিদ্যুৎ-কোষে এই রকমেরই ব্যাপার ঘটে। ইহাতে দস্তা এবং তামা বা অন্য কোনো বস্তুর যে ফলক থাকে, তাহাতে এসিড রাসায়নিক কার্য্য করে। ইহার পরে তাহাদের আবদ্ধ শক্তি বিদ্যুতের আকারে প্রকাশ পায়। কিন্তু মনে রাখিয়ো, যখন এসিড দুই ফলকে সমানভাবে রাসায়নিক কার্য্য করে, তখন বিদ্যুতের প্রবাহ দেখা যায় না। যখন দুই ফলকের মধ্যে একটির রাসায়নিক কার্য্য অন্যটির কার্য্যের চেয়ে বেশি থাকে, তখনি প্রবাহ হয়। দস্তা ও তামার ফলক লইয়া তোমরা যে-বিদ্যুৎ-কোষ তৈয়ারি করিয়াছ, তাহাতে তামার চেয়ে দস্তার উপরেই এসিড বেশি রাসায়নিক কার্য্য করে। তাই কোষের ভিতরে দস্তা হইতে তামার দিকে বিদ্যুতের প্রবাহ চলে। আবার, দুই ফলকেব উপরকার রাসায়নিক কার্য্যের তফাৎটা যত বেশি হয়, বিদ্যুতের জোরও তত বেশি হইয়া পড়ে। তাই দুই ফলকের রাসায়নিক কার্য্যের অন্তরকে বলা হয় বিদ্যুৎ-প্রবাহক বল

(Electro-motive force)। দস্তা ও তামার কোষে এই বল যতটা, সীসা ও লোহার কোষে ততটা দেখা যায় না। রাসায়নিক কার্য্যের তফাতেই বিভিন্ন কোষের প্রবাহক বল পৃথক্ হইতে দেখা যায়। কোনো কোষের দুই ফলকের মধ্যে যেটিতে রাসায়নিক কার্য্য বেশি চলে, তাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা ধন-ফলক (Anode) এবং অপরটিকে ঋণ-ফলক (Cathode) বলেন। দস্তা ও তামা লইয়া যে-কোষ তৈয়ারি করা হয়, তাহাতে দস্তা ধন-ফলক এবং তামা ঋণ-ফলক থাকে। আবার লোহা ও সীসা লইয়া যে-কোষ তৈয়ারি করা যায়, তাহাতে সীসা ধন-ফলক এবং লোহা ঋণ-ফলক হইয়া দাঁড়ায়।

এখন হয় ত তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে, বিদ্যুৎ-কোষের ফলকে যে রাসায়নিক কার্য্য চলে, তাহার প্রমাণ কোথায়? আবার এক ফলকের রাসায়নিক কার্য্য অন্য ফলকের কার্য্যের চেয়ে যে বেশি, তাহাই বা কি-রকমে জানা যায়? যে-কোনো বৈদ্যুতিক কোষ লইয়া পরীক্ষা করিলে তোমরা তাহার প্রমাণ চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে। মনে করা যাউক, আমরা যেন খাটি দস্তা ও তামার ফলক সল্‌ফিউরিক এসিডে

ডুবাইয়া পরীক্ষা করিতেছি। ফলক দুটির বাহিরে তার জোড়া আছে। দেখিবে, দস্তা ও তামা যদি খাঁটি থাকে, তবে কোনো ফলকেই কোনো কাজ নজরে পড়িবে না। কিন্তু যেই ফলকের বাহিরের তার দুটিকে সংযুক্ত করা যাইবে, অমনি দস্তায় রাসায়নিক ক্রিয়া সুরু হইবে। তখন এসিডে যে হাইড্রোজেন আছে, তাহা বুদ্বুদের আকারে উঠিতে থাকিবে এবং এসিডে মিশিয়া দস্তা ক্ষয় পাইতে থাকিবে। কিন্তু ঐ বুদ্বুদ দস্তা হইতে না উঠিয়া তামার গা হইতে বাহির হইবে। আশ্চর্য্য ব্যাপার,—এসিডের সহিত মিশিয়া দস্তায় রাসায়নিক কাজ সুরু হইল, কিন্তু তাহার ফল দেখা গেল দূরে তামার ফলকের গায়ে। তাই এখানে বিদ্যুৎ রসায়ন কাজ সুরু করে, অথবা রাসায়নিক কাজের দরুণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, এ-বিষয়ে মনে সন্দেহ হয়। সে সন্দেহের মীমাংসা এখন থাক্। তোমরা মনে রাখিয়ো, এই পরীক্ষায় তামার চেয়ে দস্তায় যে বেশি রাসায়নিক কাজ হইল, তাহাই বিদ্যুৎ-প্রবাহক বল উৎপন্ন করিয়া এসিডের ভিতরে দস্তা হইতে তামায় বিদ্যুৎ চালাইল এবং বাহিরের তারে সেই বিদ্যুৎ তামা হইতে দস্তার দিকে ছুটিল।

এই রাসায়নিক কাজে সল্‌ফিউরিক এসিড বিশ্লিষ্ট হইয়া যে হাইড্রোজেন্ এবং গন্ধক ও অক্সিজেন্ ঘটিত পদার্থ (So_4) উৎপন্ন করে, তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন আয়োন্ (Ion)। হাইড্রোজেনে থাকে ধন-বিদ্যুৎ এবং So_4তে থাকে ঋণ-বিদ্যুৎ। তোমরা মনে রাখিয়ো, ধন-বিদ্যুৎপূর্ণ আয়োনই প্রবাহের দিক্ ধরিয়া ছুটিয়া চলে।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, কোষে যতক্ষণ রাসায়নিক কাজ চলে ঠিক ততক্ষণই বিদ্যুৎ-প্রবাহ থাকে। তার পরে সব বন্ধ। উনুনে কিছু কয়লা পোড়াইয়া তাপ উৎপন্ন করিতে থাকিলে, কয়লা চিরকাল পোড়ে না এবং তাপও চিরকাল ধরিয়া পাওয়া যায় না। এখানকার ব্যাপারটা ঠিক্ সেই রকমেই চলে। ধাতু ও এসিডই বিদ্যুতের ইন্ধন। কাজেই, রাসায়নিক কাজের ফলে যেই ধাতু ক্ষয় পাইয়া যায় এবং এসিডের তেজ কমিয়া আসে, অমনি বিদ্যুতের প্রবাহও কমিয়া আসিয়া শেষে বন্ধ হইয়া যায়। কয়লা নিঃশেষে পুড়িয়া গেলে পাকা রাঁধুনিকেও যেমন রান্না বন্ধ করিতে হয়, এখানেও তাহাই ঘটে। নূতন দস্তা লাগাইয়া কোষে টাট্‌কা

এসিড না ঢালিলে আর বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। তোমরা দস্তা ও তামা দিয়া যে-কোষ তৈয়ারি করিয়াছ, তাহা লইয়া পরীক্ষা করিলে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। যত রকম বিদ্যুৎ-কোষ আছে, তাহার অধিকাংশেই দস্তাকে ধন-ফলক করিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কেন করা হয়, বোধ করি তোমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। এসিড বা অন্য উত্তেজক জিনিষের রাসায়নিক কাজ দস্তার উপরেই বেশি চলে। তাই কোষের বিদ্যুৎ-প্রবাহক বলকে বাড়াইবার জন্য অনেক স্থলেই দস্তার ফলক ব্যবহার করা হয়।

মনে রাখিয়ো, দস্তা-তামা, দস্তা-প্লাটিনম্ বা দস্তা-অঙ্গার, ব্যবহার করিয়া যে-রকমেই কোষ তৈয়ারি করা যাউক না কেন, তাহাদের প্রত্যেকের বিদ্যুৎ-প্রবাহক বল কখনই এক-একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার বেশি বা কম হয় না। কথাটা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিলে না। মনে কর, আমরা যেন দস্তা ও তামা দিয়া একটি বিদ্যুৎ-কোষ তৈয়ারি করিয়াছি। যন্ত্র দিয়া মাপিয়া জানা গেল, ইহার বিদ্যুৎ-প্রবাহক বল যেন ১ হইয়াছে। ছোটো-বড় মাঝারি যে-রকম ইচ্ছা ফলক দিয়া কোষ তৈয়ারি কর, দস্তা ও তামার কোষে সকল

সময়েই ঐ ১-এর বেশি বল কখনই পাওয়া যাইবে না। তার পরে মনে করা যাউক, যেন, দস্তা ও অঙ্গার-ফলকে কোষ তৈয়ারি করিয়া তাহার বিদ্যুৎ-প্রবাহক বল মাপা গেল। বলের পরিমাণ যেন ২ হইল। এখানেও ঠিক আগেরই ব্যাপার দেখা যাইবে। অর্থাৎ ফলকদুটিকে যতই বড় বা ছোটো কর না কেন, প্রবাহক বল সেই ২-এর একটুও বেশি বা কম হইবে না।

কোষ-নির্ম্মাণে সতর্কতা

কোষে দস্তা ব্যবহারে যেমন সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধাও আছে যথেষ্ট। আমরা বাজারে যে দস্তার ফলক কিনিতে পাই, তাহা খাঁটি নয়। উহার সঙ্গে প্রায়ই আর্সেনিক, সীসা, লোহা বা অপর কোনো ধাতু মিশানো থাকে। কোষের সল্‌ফিউরিক এসিডে ডুবাইলে খাঁটি দস্তার উপরে এসিডের কাজ নজরে পড়ে না। কিন্তু তার পরে যেই কোষের দুই তারকে সংযুক্ত করা যায়, অমনি তাহাতে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু অবিশুদ্ধ অর্থাৎ ভেজাল-দেওয়া দস্তাকে এসিডে ডুবাইবামাত্র তাহার গা হইতে হাইড্রোজেনের বুদ্‌বুদ বাহির হইয়া জিনিষটাকে ক্ষয় করে। কেন ইহা ঘটে, বলা কঠিন নয়। ফলকের দস্তার সঙ্গে সীসা বা লোহা মিশানো আছে। কাজেই, এসিডের উত্তেজনায় ইহাতে ফলকের ভিতরেই ছোটো-খাটো বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে এবং তাহাতে ফলক তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এই ব্যাপারটাকে বিদ্যুতের স্থানিক

ক্রিয়া (Local Action) বলেন। স্থানিক ক্রিয়া বন্ধ করিতে না পারিলে, কেবল যে দস্তা তাড়াতাড়ি ক্ষয় পায়, তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এসিডের জোরও কমিয়া আসে। কাজেই, দশ-বারো মিনিট অন্তর দস্তা ও এসিড না বদ্‌লাইলে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না।

বৈজ্ঞানিকেরা কোষের ফলকের স্থানিক ক্রিয়া বন্ধ করিবার জন্য একটি সুন্দর উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার কথাটা এখানে বলিয়া রাখি। তোমরা বোধ হয় জানো, তামা বা সোনার জিনিষের উপরে পারা ঘষিলে পারা ঐ-সব ধাতুর সহিত মিশিয়া রূপার মতো সাদা ও চক্‌চকে প্রলেপ উৎপন্ন করে। একটা পয়সাকে তেঁতুল বা লেবুর রসে ঘষিয়া-মাজিয়া পরিষ্কার কর এবং আয়নার তলায় যে পারা থাকে, তাহার একটু তাহাতে লাগাও। দেখিবে, পারা পয়সার উপরে লাগিয়া চক্‌চক্ করিতেছে। পারা তামার সঙ্গে যেমন মিশ্ খায়, দস্তার সঙ্গেও ঠিক্ সেই রকমেই মিশিয়া যায়। দস্তার ফলকের আগাগোড়া ঐ-রকমে পারা মাখাইয়া পরে বিদ্যুৎ-কোষের এসিডে ডুবানো হয়। ইহাতে যে কি সুবিধা হয়, বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। পারার উপরে সল্‌ফিউরিক

এসিডের কোনো ক্রিয়া নাই। তাই রবারের জুতা পায়ে দিয়া বেড়াইলে যেমন পা ভিজে না, সেই রকম দস্তার ফলকের উপরে পারার প্রলেপ থাকে বলিয়া এসিড তাহার ভিতরটা স্পর্শ করিতে পারে না। কাজেই, বিদ্যুতের স্থানিক ক্রিয়া হইতে রক্ষা পায় বলিয়া দস্তা তাড়াতাড়ি ক্ষয় পায় না। কিন্তু একেবারে ক্ষয় নিবারণের সাধ্য কাহারো নাই। দস্তার উপরকার প্রলেপ খাঁটি পারার নয়; পারার সঙ্গে একটু দস্তা মিশিয়া প্রলেপ উৎপন্ন করে। সুতরাং, যখন কোষে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে, তখন প্রলেপ-মিশানো দস্তাটুকুই প্রথমে ক্ষয় পাইয়া যায়। তার পরে যেমন আরো বিদ্যুৎ চলে, তেমনি আরো দস্তা পারার সঙ্গে মিশিয়া আপনা হইতেই নূতন প্রলেপ উৎপন্ন করে। কাজেই, পারার আড়ালে লুকাইয়া দস্তা অযথা ক্ষয় হইতে রক্ষা পায়। তোমরা যখন নিজের হাতে বিদ্যুৎ-কোষ সাজাইবে, তখন স্থানিক বিদ্যুতের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দস্তার গায়ে পারা মাখাইয়া লইয়ো।

কোষের বিদ্যুৎ-প্রবাহক বল আরো এক রকমে কমে। ইহার কথাটাও এখানে বলিয়া রাখি। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, যখন কোষের ভিতর দিয়া

বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে, তখন ঋণ-ফলকে হাইড্রোজেন বাষ্প জমিতে আরম্ভ করে। এই হাইড্রোজেন সহজ জিনিষ নয়,—যেখানে জমে, সেখান হইতে সে বিদ্যুতের এক নূতন প্রবাহ বিপরীত দিকে চালাইতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ কোষের বিদ্যুৎ চলে দস্তা হইতে তামার দিকে, হাইড্রোজেনের বিদ্যুৎ চলে তামা হইতে দস্তার দিকে। কাজেই, দুইয়ের কাটাকুটি হওয়ায় দস্তা হইতে তামার দিকের প্রবাহ কমিয়া আসে। এই ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিকেরা পোলারাইজেসন্ (Polarisation) বলেন। ইহাকে রোধ করিবারও উপায় জানা গিয়াছে। জন্মিবামাত্র যদি হাইড্রোজেন্‌কে নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে এই হাঙ্গামাটা থাকে না। রসায়ন-শাস্ত্র ঘাঁটিলে হাইড্রোজেন্‌কে নষ্ট করার অনেক উপায় পাওয়া যায়। যে-জিনিষের অক্সিজেন্ সহজে অন্য জিনিষের সঙ্গে মিশে, সেইরকম কোনো জিনিষ কোষের এসিডে মিশাইয়া রাখো, দেখিবে, কোষে আর হাইড্রোজেন্ জমিতেছে না। পটাসিয়ম্ বাইক্রোমেট্, নাইট্রিক এসিড এবং আরো কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য এই কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। অনেক সময়ে বাইক্রোমেট্-মিশানো এসিডে দস্তা-

তামা বা দস্তা-অঙ্গারের ফলক রাখা হয়। তাই দস্তার হাইড্রোজেন্ তামার বা অঙ্গারের গায়ে জমিবার আগেই বাইক্রোমেটের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়া জল হইয়া যায়। সুতরাং, কোষের বিদ্যুৎ-প্রবাহক বলকে হাইড্রোজেন্ আর কমাইতে পারে না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো উপায়ে হাইড্রোজেন্‌কে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহা হইলেও কোষের প্রবাহক-বল কমে না। এই রকমে হাইড্রোজেন্ তাড়াইবার ব্যবস্থাও কয়েক রকম কোষে আছে। কোষের বিচিত্র আকৃতি এবং বিচিত্র গঠন বিদ্যুৎ-প্রবাহক বলকে ঠিক্ রাখার জন্যই করা হয়। বিদ্যুৎ-কোষের গঠনের বিষয় তোমাদিগকে যখন বলিব, তখন ইহার পরিচয় পাইবে।

বিদ্যুৎ-পথে বাধা ও বিদ্যুতের পরিমাণ

যে-কোষে বিদ্যুৎ-প্রবাহক বল বেশি, তাহাতে বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, ইহাই বোধ করি তোমরা মনে কর। কথাটা ঠিক্—কিন্তু অনেক সময়ে প্রবাহক বল বেশি থাকিলেও বিদ্যুতের পরিমাণ বেশি হয় না। কেন এ-রকম হয়, উদাহরণ দিলে হয় ত তোমরা সহজে বুঝিতে পারিবে। মনে কর, তোমরা ক্রিকেট্ খেলা করিতেছ এবং যে বল্ ছুড়িয়াছ, তাহা যেন মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া চলিতেছে। যত জোরে বল্ ছোড়া যায়, ঠিক্ তত জোরেই কি তাহা ব্যাটের কাছে পৌঁছায়? কখনই পৌঁছায় না। উপ্‌ড়ো-খাপ্‌ড়া মাটিতে ও বাতাসে বাধা পাইয়া তাহার জোর অনেক কমিয়া যায়। কোষের ভিতরকার বিদ্যুতে কতকটা এই রকমেরই ব্যাপার ঘটে। যখন ধন-ফলক হইতে ঋণ-ফলকের দিকে বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করে, তখন পথের মাঝে যে বাধা থাকে তাহাতে বিদ্যুতের জোর কমে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাতে বিদ্যুতের

পরিমাণও কমিয়া আসে। আর একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে কর, দুইটি পাত্র জলে ভরা আছে। একটা যেন আছে খুব উঁচুতে, অন্যটি আছে তাহার নীচে। আবার তাহাদের তলা যেন নল দিয়া যোগ করা আছে। উঁচু পাত্রের তলাকার জলের চাপ, অন্য পাত্রের তলাকার জলের চাপের চেয়ে বেশি। সুতরাং উঁচু পাত্রের জল নল দিয়া জোরে নীচের পাত্রে প্রবেশ করিবে। কিন্তু কোন্ অবস্থায় বেশি জল নল দিয়া চলিবে, বলা যায় না কি? নল যদি মোটা থাকে তবেই বেশি জল নীচের পাত্রে যায়। নল সরু থাকিলেই হাঙ্গামা বাধে। তখন সরু নলে বাধা পাইয়া জল বেশি পরিমাণে যাইতে চায় না। মনে কর, নলের ভিতরে এক গাদা কাদা জমিয়া আছে। এই অবস্থায় কি হয়, বলা যায় না কি? যথেষ্ট চাপ থাকা সত্ত্বেও কাদা ঠেলিয়া জল বেশি পরিমাণে যাইতে চাহে না। তাহা হইলে দেখ, চাপ বেশি থাকিলেই যে বেশি জল চলে, তাহা নয়। চাপ বেশি এবং সঙ্গে সঙ্গে বাধা কম থাকিলেই জল বেশি চলিতে পারে। বিদ্যুৎ-সম্বন্ধেও ঠিক্ সেই কথাই খাটে। প্রবাহক বল বেশি থাকিলেই কোষে বেশি

পরিমাণে বিদ্যুৎ চলে না। সঙ্গে সঙ্গে বাধা যদি কম করা যায়, তবেই পরিমাণে বিদ্যুৎ বেশি হয়।

বিদ্যুতের পথে কোন্ কোন্ জিনিষ কম বাধা দেয়, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। ধাতু এসিড্ প্রভৃতি পরিচালক জিনিষ বিদ্যুতের পথে অতি অল্পই-বাধা দেয়। কিন্তু অপরিচালক জিনিষ মাত্রই মাঝে দাঁড়াইলে বিদ্যুৎ বাধা পায়। আবার ধাতুর মধ্যে লোহা সীসা প্রভৃতি যতটা বাধা দেয়, প্লাটিনম্ রূপা ও তামা তার চেয়ে অনেক কম বাধা দেয়। সরু নলের ভিতর দিয়া চলিবার সময়ে জল যে-রকমে বাধা পায়, সরু তারের ভিতর দিয়া চলিতে গেলে বিদ্যুৎও সেই রকমে বাধা পায়। তাহা হইলে দেখ, বিদ্যুতের পরিমাণ বেশি পাইতে গেলে কোষের দুই ফলকে যে-তার জোড়া থাকে, তাহা মোটা হওয়া চাই, নচেৎ সরু তারের বাধা ঠেলিয়া আসিতে বিদ্যুতের পরিমাণ কমিয়া আসে। কেবল ইহাই নয়, তারকে যত লম্বা করা যায়, বাধার পরিমাণও ততই বাড়ে। সুতরাং, কোষে বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়াইতে গেলে, ভালো পরিচালক ধাতুর তারকে কেবল মোটা করিলেই চলিবে না, তাহাকে খাটো রাখাও দরকার

এবং কোষের দুই ফলকের মাঝের দূরত্বকে অল্প করাও প্রয়োজন। মোটা নলে বাধা কম দেয়, তাই ইহার ভিতর দিয়া বেশি পরিমাণে জল চলে। এই কথাটা কোষের ফলক সম্বন্ধেও খাটে। কোষের ফলক দুখানির প্রসার যত বেশি হয়, বিদ্যুতের পথে তাহা ততই অল্প বাধা দেয়। তাই, কোষের ফলক দুখানিকে বড় করিলে বিদ্যুতের পরিমাণ বেশি হইয়া পড়ে। তাপ দিয়া আমরা কল চালাই, আলো উৎপন্ন করি, আরো কত-কি কাজ করি। কিন্তু এই তাপ জিনিষটাই বিদ্যুতের পথে বড় বেশি বাধা দেয়। তাই বিদ্যুৎ-কোষ বা তার গরম হইয়া পড়িলে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া আসে।

তাহা হইলে দেখ, বিদ্যুৎ বেশি পাইতে গেলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

(১) বিদ্যুৎ-প্রবাহক বল বাড়ানো।

(২) কোষের ভিতরকার ও বাহিরের বাধা কমানো।

বিদ্যুৎ-পথের বাধাকে কমাইতে গেলে, আবার নীচের কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হয় ;—

(১) মোটা ও খাটো তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ বেশি চলে।

(২) লোহার তারে বিদ্যুৎ বেশি বাধা পায়—অল্প দামের ধাতুর মধ্যে তামার তার ব্যবহার করা ভালো।

(৩) তারের দৈর্ঘ্য যেমন বাড়ানো বা কমানো যায়, বিদ্যুৎ-পথের বাধা ঠিক্ সেই অনুপাতে বাড়ে বা কমে।

(৪) তারকে দ্বিগুণ মোটা করিলে বাধা অর্দ্ধেক হয় এবং অর্দ্ধেক মোটা করিলে বাধা দ্বিগুণ হয়। অর্থাৎ স্থূলতার বিলোম অনুপাতে বাধা কমে বা বাড়ে।

(৫) বিদ্যুৎ-কোষের ফলক যত প্রসর হয় ও কাছাকাছি থাকে, ততই কোষের ভিতরকার বাধা অল্প হয়। অপ্রসর ও দূরবর্ত্তী ফলকে বিদ্যুৎ বেশি বাধা পায়।

(৬) বাহিরের তার এবং কোষের ভিতরকার দ্রব্য যত গরম হয়, বিদ্যুৎ ততই বাধা পায়।

ওম্‌সের নিয়ম

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বোধ করি তোমরা বুঝিয়াছ, কোনো কোষে বা কোনো তার দিয়া কি পরিমাণে বিদ্যুৎ যাইতেছে ঠিক্ করিতে গেলে, বিদ্যুৎ-প্রবাহক বল এবং প্রবাহ-পথের বাধা এই দুইটিকে লইয়া হিসাব করিতে হয়। হিসাব শক্ত নয়। কেবল মনে রাখিতে হয়, বিদ্যুৎ-প্রবাহক বলকে দ্বিগুণ, তিনগুণ ইত্যাদি করিলে বিদ্যুতের পরিমাণ দ্বিগুণ, তিনগুণ ইত্যাদি হয় এবং আরো মনে রাখিতে হয় যে, বাধা যদি দ্বিগুণ, তিনগুণ ইত্যাদি হইয়া দাঁড়ায়, তবে বিদ্যুতের পরিমাণ $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$ ইত্যাদি হইয়া পড়ে। অর্থাৎ প্রবাহক বলের অনুলোম (Directly) অনুপাতে এবং বাধার বিলোম (Inversely) অনুপাতে বিদ্যুতের পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং, বিদ্যুতের পরিমাণ $=\frac{\text{প্রবাহক বল}}{\text{বাধা}}$ এই রকম যদি লেখা হয়, তাহা হইলে সব কথাই বলা হইয়া যায়। ইহাকে আরো সংক্ষেপে লেখা চলে।

মনে কর, আমরা প্রবাহক বলের পরিমাণকে "ব" বাধাকে "বা" এবং বিদ্যুতের পরিমাণকে "প" অক্ষর দিয়া সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। সুতরাং লেখা যাইতে পারে, প $= \frac{\text{ব}}{\text{বা}}$ বিদ্যুতের পরিমাণ হিসাব করার এই নিয়মটিকে ইংরাজিতে ওম্‌সের নিয়ম (Ohm's Law) বলা হয়। ওম্‌স (Dr. G. S. Ohms) নামে একজন জর্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক এই নিয়মটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। তোমরা যখন বড় বড় বই পড়িয়া বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে হিসাব-পত্র করিবে, তখন ইহার প্রয়োজন হইবে।

বৈদ্যুতিক পরিমাপ

মাপদণ্ড ঠিক্ না রাখিলে কোনো জিনিষকে মাপা চলে না। ইংরেজেরা লণ্ডন সহরের ব্রিটিশ মিউজিয়মে একটা রূপার মাপকাঠি রাখিয়াছেন, তাহাকে তাঁহারা বলেন ফুট্। ইহার তিন গুণকে বলা হয় গজ এবং ১৭৬০ গজে হয় এক মাইল। আবার ফুটের বারো ভাগের এক ভাগকে বলা হয় ইঞ্চি। ইহা লইয়া ইংরেজের রাজ্যে মাপ-জোঁক ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। আমেরিকা ফ্রান্স এবং আরো অনেক দেশে মিটার (Metre) অর্থাৎ প্রায় ৪০ ইঞ্চিকে মাপদণ্ড করা হয়। কেবল দৈর্ঘ্যের নয়, ওজন ক্ষেত্রফল ঘনফল প্রত্যেকেরই মাপদণ্ড আছে। ইহা না থাকিলে হিসাবপত্রে রাখা যায় না এবং কেনা-বেচা করিতে গেলে ঠকিতে হয়। আজকাল বিদ্যুতেরও কেনাবেচা চলিতেছে। তোমাদের বাড়িতে মাসে বা দিনে কতটা বিদ্যুৎ তারের ভিতরে চলিয়া বাতি জ্বালাইল বা পাখা ঘুরাইল, তাহার হিসাব ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানিকে রাখিতে হয়, নচেৎ তাহাদের

ব্যবসা চলে না। হিসাব অনুসারে কোম্পানি গৃহস্থদের কাছ হইতে বিদ্যুতের দাম আদায় করিয়া লয়। তা'ছাড়া তোমাদের ঘরগুলিতে যে-সব বিদ্যুতের বাতি জ্বলে, সেগুলিতে কম বা বেশি বিদ্যুৎ যাহাতে না যায়, তাহা হিসাব করিয়া ঠিক করিতে হয়। কম বিদ্যুতে আলো কম হয়, বেশি বিদ্যুতে বাতি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাহা হইলে দেখ, বিদ্যুতের পরিমাণ মাপিবার মাপদণ্ড দরকার। কিন্তু তোমরা আগেই দেখিয়াছ, বিদ্যুতের পরিমাণ প্রবাহক বল ও বাধার উপরে নির্ভর করে। কাজেই, বিদ্যুতের পরিমাণ মাপিতে গেলে, প্রবাহক বল ও বাধারও মাপদণ্ডের প্রয়োজন। আমরা যেমন ফুট্ দিয়া দৈর্ঘ্য মাপি, সের দিয়া ওজন মাপি এবং বর্গ-ফুট বা বর্গ-গজ ইত্যাদি দিয়া বিস্তার মাপি, সেইরকম আম্পিয়ার (Ampere) ভোলট্ (Volt) এবং ওম্‌স্ (Ohms) দিয়া আজকাল বিদ্যুতের পরিমাণ মাপা হইতেছে। কতটুকু বিদ্যুৎকে এক আম্পিয়ার বলে এবং কতটুকু প্রবাহক বল ও বাধাকে ভোল্‌ট্ ও ওম্‌স্ বলা হয় জানিয়া রাখা দরকার।

পম্পের নলের ভিতর দিয়া জলের যে প্রবাহ চলে, তাহাকে আমরা সের পাউণ্ড বা গ্যালন দিয়া মাপি।

কোনো পম্পের ঘণ্টায় ৫০০ গ্যালন্, কোনো পম্পে তাহারো বেশি বা কম জল উঠে। ডাইনামো বা কোষের বিদ্যুৎ-প্রবাহকে মাপিতে গেলে সেকেণ্ডে কত আম্পিয়ার বিদ্যুৎ চলিল, তাহা হিসাব করিতে হয়। তোমাদের কাহারো কাহারো বাড়িতে হয় ত পঁচিশ বাতির জোর-ওয়ালা ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌ব্ আছে। ইহার ভিতর দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে $\frac{১}{১০}$ আম্পিয়ার বিদ্যুৎ চলে। কলিকাতা সহরের ট্রাম্‌গাড়ি যে-বিদ্যুতের জোরে চলে, তাহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ হইতে ৫০ আম্পিয়ার বিদ্যুৎ লাগে। এক আম্পিয়ার যে কতটা বিদ্যুৎ ইহা হইতে বোধ করি তোমরা আন্দাজ করিতে পারিবে। এক আম্পিয়ারের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র বিদ্যুৎ যদি তোমার বা আমার শরীরের ভিতর দিয়া যায়, তবে ভয়ানক ঝাঁকুনি লাগে। তার পরে উহার পরিমাণ বাড়িয়া যখন দেড় আম্পিয়ার হয়, তখন আর রক্ষা থাকে না। ইহাতে মানুষ মারা যায়। যখন নলের ভিতর দিয়া জল চলে, তখন সেই জল-স্রোতের পরিচয় দিতে গেলে কত সের জল এক সেকেণ্ডে চলে, তাহা লইয়া হিসাব করি। এই রকমে বলি, নলের ভিতর দিয়া সেকেণ্ডে পাঁচ সের জল

চলিতেছে। সের দিয়া যেমন জল মাপা হয়, তেমনি কুলম্ব (Coulomb) দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ মাপা হয়। অর্থাৎ সের যেমন জলের পরিমাণের মাত্রা (Unit), সেই রকম কুলম্ব বিদ্যুতের পরিমাণের মাত্রা। এক কুলম্ব বিদ্যুৎ, এক সেকেণ্ড ধরিয়া চলিলে যতটা বিদ্যুৎ হয়, তাহাকেই বলা হয় আম্পিয়ার।

তোমাদের আগেই বলিয়াছি, বিদ্যুৎ-প্রবাহক বলকে ভোল্‌ট দিয়া মাপিতে হয়। ইটালির বৈজ্ঞানিক ভল্‌টার কথা তোমাদিগকে আগেই বলা হইয়াছে। তাঁহারি নাম অনুসারে প্রবাহক-বলের মাপকে বলা হয় ভোল্‌ট। একক পরিমাণ বাধার ভিতর দিয়া এক আম্পিয়ার বিদ্যুৎ চালাইতে গেলে যে-প্রবাহক বলের দরকার, তাহাই এক ভোল্‌ট। উইম্‌স্‌হার্ষ্ট বৈদ্যুৎ-যন্ত্রে যে-বিদ্যুৎ জমে, তাহার প্রবাহক-বল ২৫ হাজার হইতে ৩০ হাজার ভোল্‌ট পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়। তোমাদের বাড়িতে পাখা চালাইবার বা আলো জ্বালাইবার জন্য যে-বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে, তাহার প্রবাহক-বল প্রায়ই ২৫০ ভোল্‌টের বেশি হয় না। কিন্তু ট্রামের কলে বিদ্যুতের প্রবাহক-বল চারি-পাঁচ শত ভোলট না হইলে ট্রাম চলে না।

তোমরা আম্পিয়ার ও ভোল্‌টের তফাৎটা ভালো করিয়া বুঝিয়া রাখিয়ো। জলের পরিমাণ যেমন আমরা সের বা মণ দিয়া মাপি, বিদ্যুতের পরিমাণ সেই রকমে কুলম্ব দিয়া মাপা হয়। জল-স্রোতের প্রাখর্য্য (Intensity) কেবল সের বা মণ দিয়া মাপা যায় না,—ইহার সঙ্গে সময়টাও ধরিতে হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রাখর্য্য সে-রকম কেবল কুলম্ব দিয়া মাপিলে চলে না। এক সেকেণ্ডে কত কুলম্ব বিদ্যুৎ চলিল, ইহা দেখিয়া প্রাখর্য্য ঠিক্ করিতে হয়। ইহার মাত্রাকেই বলা হয় আম্পিয়ার। যে-জোরে বিদ্যুৎ চলে, তাহাকে বলা হয় ভোল্‌ট।

ত্রিশ হাজার ভোল্‌টের বিদ্যুৎ যখন স্ফুলিঙ্গাকারে আসিয়া শরীরে ঠেকে, তখন একটু ঝাঁকুনি ছাড়া আমরা আর কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু ট্রামের কলের যে-চারি পাঁচ শত ভোল্‌টের বিদ্যুৎ চলে, তাহা গায়ে ঠেকিলে মানুষের বাঁচা দায় হয়। কেন ইহা ঘটে, বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। বৈদ্যুত যন্ত্রের বিদ্যুতের প্রবাহক-বল বেশি থাকিলেও তাহাকে অনেক বাধা ঠেলিয়া আসিতে হয়। কাজেই, স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে অতি অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ আমাদের শরীরে

লাগে। কিন্তু ট্রামের লাইন হইতে যে-বিদ্যুৎ আসে, তাহার প্রবাহক-বল যেমন কম, তেমনি বাধাও অল্প। কাজেই, এই অবস্থায় বিদ্যুতের পরিমাণ বেশি হয় বলিয়া, উহা মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

তোমাদের আগেই বলিয়াছি, বিদ্যুতের পথের বাধাকে মাপা হয় ওম্‌স্ দিয়া। অর্থাৎ ওম্‌স্‌ই বাধার মাপক। কতটুকু জলকে এক সের এবং কতটুকু দৈর্ঘ্যকে এক ফুট্ বলা হয়, আমরা তাহার আন্দাজ করিতে পারি। সেই রকম এক ওম্‌সের বাধা যে কতটুকু তাহার একটা ধারণা থাকা দরকার। যে-বাধাকে কাটাইয়া এক ভোল্‌টের বিদ্যুৎ এক আম্পিয়ার পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে পারে, তাহাই এক ওম্‌স্। কিন্তু ইহাতেও বোধ করি ওম্‌সের ধারণাটা স্পষ্ট হয় না। তাই এসম্বন্ধে আরো কিছু বলা দরকার। আঠারো নম্বরের তামার তার তোমরা দেখিয়াছ কি? ইহা খুব মোটা নয়। যে-কোনো ইলেক্‌ট্রিক্ মিস্ত্রির কাছে, তোমরা ইহার নমুনা দেখিতে পাইবে। এই রকম ২২৫ ফুট তারের ভিতর দিয়া যাইবার সময়ে বিদ্যুৎ যে-বাধা পায়, তাহাকেই এক ওম্‌স বলা হয়। প্রাণীর দেহ বিদ্যুতের পরিচালক হইলেও, ইহা

বিদ্যুতের পথে একটু-আধটু বাধা দেয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বয়স্ক মানুষের দেহে প্রায় আড়াই হাজার ওম্‌সের বাধা আছে। তাই আমেরিকার খুনী আসামীকে যখন বিদ্যুৎ দিয়া মারা হয়, তখন চারি হাজার ভোল্‌টের বিদ্যুৎ শরীর দিয়া চালাইতে হয়। ইহাতে ওম্‌সের নিয়ম অনুসারে $\frac{৪০০০}{২৫০০}$ অর্থাৎ $১\frac{৩}{৫}$ আম্পিয়ার বিদ্যুৎ শরীরের ভিতরে যায়। এই বিদ্যুতেই মানুষ মরে। তোমাদের বাড়িতে যে ইলেক্‌ট্রিক্‌ ল্যাম্প জ্বলে, তাহার ভিতরে কত বাধা থাকে, বোধ করি তোমরা জানো না। সাধারণ পঁচিশ বাতির ল্যাম্পে ইহার পরিমাণ প্রায় দুই হাজার ওমস্‌ হইতে দেখা যায়।

বাধার পরিমাণ নির্দ্ধারণ

বিদ্যুতের প্রবাহক-বল ঠিক্ করার জন্য ভোল্ট্-মিটার যন্ত্র এবং বিদ্যুতের পরিমাণ স্থির করার জন্য আমিটার যন্ত্র আছে। কিন্তু বাধা স্থির করার জন্য আজো সে-রকম যন্ত্র নির্ম্মিত হয় নাই। অথচ বিদ্যুতের কল-কারখানায় বিদ্যুৎ-পথের বাধার পরিমাণ ঠিক্ না করিলে এক দণ্ডও চলে না।

মনে কর, একটা তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে। এই ক্ষেত্রে যদি তারের দৈর্ঘ্য তাহার স্থূলতা, কোন্ ধাতু দিয়া সেই তার তৈয়ারি এবং তাহার উষ্ণতা কত, জানা থাকে, তাহা হইলে সহজে তারের বাধা ঠিক করা যায়। যে-সব তার দিয়া বিদ্যুৎ চলে, তাহা কত সরু তাহা তোমরা দেখিয়াছ। বড় জায়গায় ক্ষেত্রফল আমরা বর্গ-ইঞ্চি, বর্গ-ফুট, বা বর্গ-গজ দিয়া প্রকাশ করি। তারকে কাটিলে তাহার স্থূলতাকে সে-রকমে প্রকাশ করিতে গেলে মুস্কিলে পড়িতে হয়। কারণ, তখন স্থূলতার ক্ষেত্রফল অতি অল্প হইয়া দাঁড়ায়। তাই এক ইঞ্চির হাজার ভাগকে মাত্রা (Unit) ধরিয়া

তারের বৃত্তাকার স্থূলতার ক্ষেত্র-ফল ঠিক্ করা হয়। এক ইঞ্চির হাজার ভাগকে ইলেক্‌ট্রিক্ এঞ্জিনিয়াররা বলেন মিল্ (Mil)। কেবল ইহাই নয়, যে-তারের ব্যাস $\frac{১}{১০০০}$ ইঞ্চি অর্থাৎ ১ মিল্, তাহার স্থূলতার ক্ষেত্র-ফলকে বলা হয় ১ বৃত্ত-মিল্ (Circular mil)। কিন্তু বৃত্তের ক্ষেত্রফল ব্যাসের বর্গ অনুসারে কমে-বাড়ে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, তার যত মিল্ স্থূল, তাহারি বর্গ-অনুসারে উহার স্থূলতা বাড়ে-কমে।

এই ত গেল, তারের স্থূলতা মাপার কথা। এখন তাহার বাধা মাপার কথা বলা যাউক। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, তার যত লম্বা হয়, তাহার বাধা ততই বেশি হয়। আবার তাহা যত স্থূল হয়, তাহার বাধা ততই কমে। অর্থাৎ তারের বাধা তাহার দৈর্ঘ্যের অনুলোম এবং স্থূলতার বিলোম অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়। তারের বাধা মাপিবার সময়ে এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে। তা-ছাড়া আরো মনে রাখিতে হইবে যে, যে-তারের বাধা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তাহার এক বৃত্ত-মিল্ স্থূল এবং এক ফুট লম্বার বাধা কতটা। ইহাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, আপেক্ষিক বাধা (Specific resistance)। প্রায় সকল ধাতুরই

আপেক্ষিক বাধা বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যথা, লোহার আপেক্ষিক বাধা ৬৪ ওম্‌স্, তামার ১০$\frac{১}{২}$ ওম্‌স্, আলুমিনিয়মের ১৭$\frac{১}{২}$ ওম্‌স্ ইত্যাদি। সুতরাং, কোনো তারের "আ"কে আপেক্ষিক বাধা, "দ"কে দৈর্ঘ্য, এবং "ব্যা"কে স্থূলতার ব্যাস ধরা যায়, তাহা হইলে, বাধা=$\frac{\text{আ} \times \text{দ}}{(\text{ব্যা})^{২}}$ ওম্‌স্ হইয়া দাঁড়ায়। এই সূত্র দিয়াই এনজিনিয়াররা এক মাইল বা দশ মাইল লম্বা তারের বাধা মাপিয়া থাকেন। মনে রাখিয়ো, এই সূত্রে ব্যাসের পরিমাণ মিল্‌তে প্রকাশ করাই নিয়ম।

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, তার বা বৈদ্যুত যন্ত্র যত গরম হয়, তাহার বাধার পরিমাণ ততই বাড়িয়া চলে। তাই ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রিরা যন্ত্র ও তার গরম হইতেছে কিনা, সর্ব্বদা দেখে। সুতরাং কোনো তারের বাধা ঠিক করিতে গেলে, তাহার উষ্ণতাকে হিসাব হইতে বাদ দিলে ভুল হয়। সুতরাং, উষ্ণতাকেও হিসাবের ভিতরে আনা দরকার। অন্য ধাতুর কথা ছাড়িয়া তামার তারের কথা আলোচনা করা যাউক; বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, ° ডিগ্রি

সেন্টিগ্রেডে যে তামার তারের বাধার পরিমাণ ১ ওম্‌স্ থাকে, উষ্ণতা বাড়াইতে থাকিলে প্রতি ডিগ্রিতে তাহার বাধার পরিমাণ মোটামুটি ·০০৪১ ওম্‌স্ বাড়িয়া চলে। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে কর, খানিকটা তামার তার ০ ডিগ্রিতে ১৫ ওম্‌স্ বাধা দেয়। উষ্ণতার পরিমাণ ৬০ ডিগ্রি হইলে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে ১৫ × (·০০৪১ × ৬০ × ১৫) = ১৮·৬৯। সুতরাং যে বাধা আগে ছিল ১৫ ওম্‌স্, ৬০ ডিগ্রি উষ্ণতা বাড়ায় তাহাই হইয়া দাঁড়াইল ১৮·৬৯। নিতান্ত কম তফাৎ নয়।

মনে রাখিয়ো, খাঁটি ধাতুমাত্রেরই বাধা উষ্ণতা অনুসারে নিয়মিত বাড়ে। কাজেই হিসাবের সুবিধা হয়। দুই বা তিনটি ধাতু মিলিয়া যে মিশ্র ধাতু তৈয়ারি করা হয়, তাহার বাধা ঐ-সকল ধাতুর বাধার চেয়ে প্রায়ই বেশি হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহা উষ্ণতার অনুপাতে নিয়মিত বাড়ে-কমে না।

যাহা বলা হইল, তাহা কেবল ধাতু সম্বন্ধেই খাটে। কাচ, চীনামাটি এবং কয়লা প্রভৃতি কতকগুলা জিনিষ ঐ নিয়ম মানিয়া চলে না। এগুলিকে যত গরম করা যায়, ততই তাহাদের বাধা কমিয়া আসে।

এই ত গেল বাধা-পরিমাপের এক উপায়। ইহা ছাড়া হুইট্‌ষ্টোন্ ব্রিজের (Wheatstone bridge) দ্বারা বাধার পরিমাণ স্থির করা হয়। এখানে হুউট্‌ষ্টোন ব্রিজের একটা ছবি দিলাম। দেখ, ছবিতে

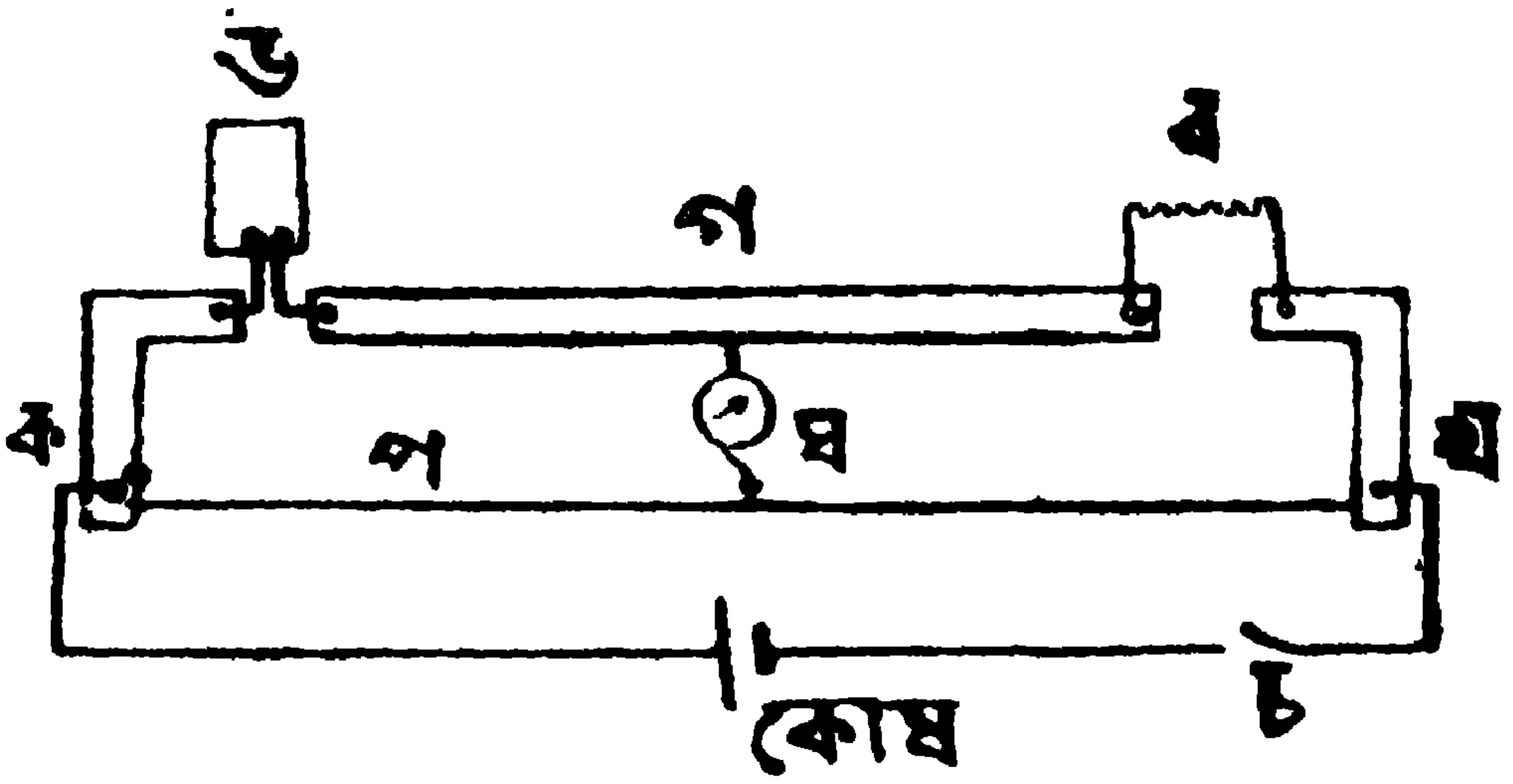

হুইট্‌ষ্টোন্ ব্রিজ্

বিদ্যুৎ-কোষ সাজানো আছে। 'চ'-চিহ্নিত চাবি টিপিলে কোষের বিদ্যুৎ "ক" জায়গায় গিয়া "কগ" এবং "কঘ" পথে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মনে কর, "কগ" দিয়া যেন "ম" পরিমাণ এবং "কঘ" দিয়া যেন "ন" পরিমাণ বিদ্যুৎ চলিল। গ এবং ঘ-কে সংযুক্ত করিয়া একটি ভালো বিদ্যুৎমাপক যন্ত্র জোড়া আছে। ড, ব, প এবং ক এগুলি বাধা। মনে কর "ব" বাধার পরিমাণ যেন অজ্ঞাত, তাহার পরিমাণ আমরা স্থির করিতে যাইতেছি।

যাহা হউক যখন "কগ" এবং "কঘ" দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে, তখন প, ক এবং ড-এর বাধাকে প্রয়োজন মতো পরিবর্ত্তন করিয়া এমন কর, যেন বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্র দিয়া একটুও বিদ্যুৎ না যায়, অর্থাৎ যন্ত্রের কাঁটার যেন একটুও বিচলন না হয়। এই স্থলে $\frac{\text{ড}}{\text{ব}} = \frac{\text{ম}}{\text{ন}}$ এই সূত্রটি পাওয়া যায়। সুতরাং "ভ," "ব" এবং "ন"-এর পরিমাণ যদি জানা থাকে, তবে "ব"-এর পরিমাণ অনায়াসে বাহির করা যায়।

রিওষ্টাট্

বাষ্প-যন্ত্রের ভিতরে বাষ্প যাওয়া বন্ধ করিলেই যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়, এবং পথ খুলিয়া দিলেই কাজ চলে। তাই বয়লার হইতে যে জলের বাষ্প এঞ্জিনে যায়, তাহার পথ দরকার মতো খুলিয়া বা বন্ধ করিয়া এঞ্জিন চালানো হয়। তা' ছাড়া আবার ব্রেক আছে। ব্রেক্ চাকাকে এমন জোরে চাপিয়া ধরে যে, তাহা আর ঘুরিতে পায় না। এই দুই ব্যবস্থায় বাষ্প-চালিত এঞ্জিন্‌কে থামানো এবং চালানো হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে যে-সব যন্ত্র চলে, দরকার মতো তাহাদেরও বিদ্যুতের জোর কম বা বেশি করার প্রয়োজন হয়। নচেৎ যন্ত্রের গতি ইচ্ছামতো কমানো বা বাড়ানো যায় না। মোটরে ষ্টার্ট দিবার সময়ে যন্ত্রে পূরা দমে বিদ্যুৎ চালানো দরকার হয় না,—বিদ্যুতের জোর বাড়াইতে হয়, ষ্টার্ট দিবার পরে ধীরে ধীরে। কি-রকমে বিদ্যুতের জোর কমানো-বাড়ানো হয় তোমাদিগকে এখন তাহাই বলিব।

আমরা ওম্‌সের সূত্র হইতে দেখিয়াছি, প্রবাহক-বলকে কমাইলে বাড়াইলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ কমে-বাড়ে। কিন্তু প্রবাহক-বল কমাইয়া বাড়াইয়া বিদ্যুৎকে নিয়মিত করা চলে না। মূল ষ্টেশন হইতে যে-বিদ্যুৎ আসিয়া মোটরে পড়ে, তাহার প্রবাহক-বল ২০০, ৩০০, ৮০০ বা এই রকম একটা ভোল্‌ট নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাহার পরিমাণকে কম-বেশি করার ক্ষমতা মোটর-চালকের হাতে থাকে না। কাজেই, যে মূল তার দিয়া মোটরে বিদ্যুৎ প্রবেশ করিতেছে, তাহার মাঝে ইচ্ছামতো বাধা প্রয়োগ না করিলে প্রবাহকে নিয়মিত করা যায় না। বাধা বেশি দাও,—প্রবাহের জোর কমিবে। বাধাকে কম কর,—প্রবাহ বাড়িবে। মোটরের যে-অংশ দিয়া এই রকমে বিদ্যুৎকে নিয়মিত করা যায়, তাহাকে বলা হয় রিওষ্টাট্ (Rheostat)। তা'ছাড়া রেজিষ্টাণ্ট্ বাক্স দিয়াও এই কাজটি করা যায়। কিন্তু এই যন্ত্র মোটরে প্রায়ই ব্যবহার করা হয় না।

পর পৃষ্ঠায় রিওষ্টাটের একটা ছবি দিলাম। যন্ত্রে যে-হাতলটা আঁকা আছে, তাহাকে ডাইনের ও বাঁয়ের বোতাম-গুলির উপরে লাগাইলে প্রবাহ কমে ও বাড়ে।

তোমাদের বাড়িতে যদি বিদ্যুতের পাখা থাকে, তবে দেখিবে, সেখানেও রিওষ্টাট্ লাগানো আছে। উহার হাতল ঘুরাইয়া পাখাকে দরকার-মতো জোরে বা আস্তে ঘোরানো যায়। যন্ত্রের ভিতরে কি আছে, এখানে তাহা আঁকিয়া দিয়াছি। দেখ, প্রত্যেক বোতামের নীচে তার গুটানো রহিয়াছে। ইহা সাধারণ তামার তার নয়। জর্ম্মান্ সিল্ভার প্রভৃতি যে-সব মিশ্রধাতুর বাধার পরিমাণ বেশি, তাহা দিয়া এই তারগুলি তৈয়ারি। হাতল ঘুরাইলে প্রয়োজন-মতো কখনো বেশি এবং কখনো কম তার বিদ্যুতের পথে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহাতেই বিদ্যুতের প্রবাহ কমে এবং বাড়ে।

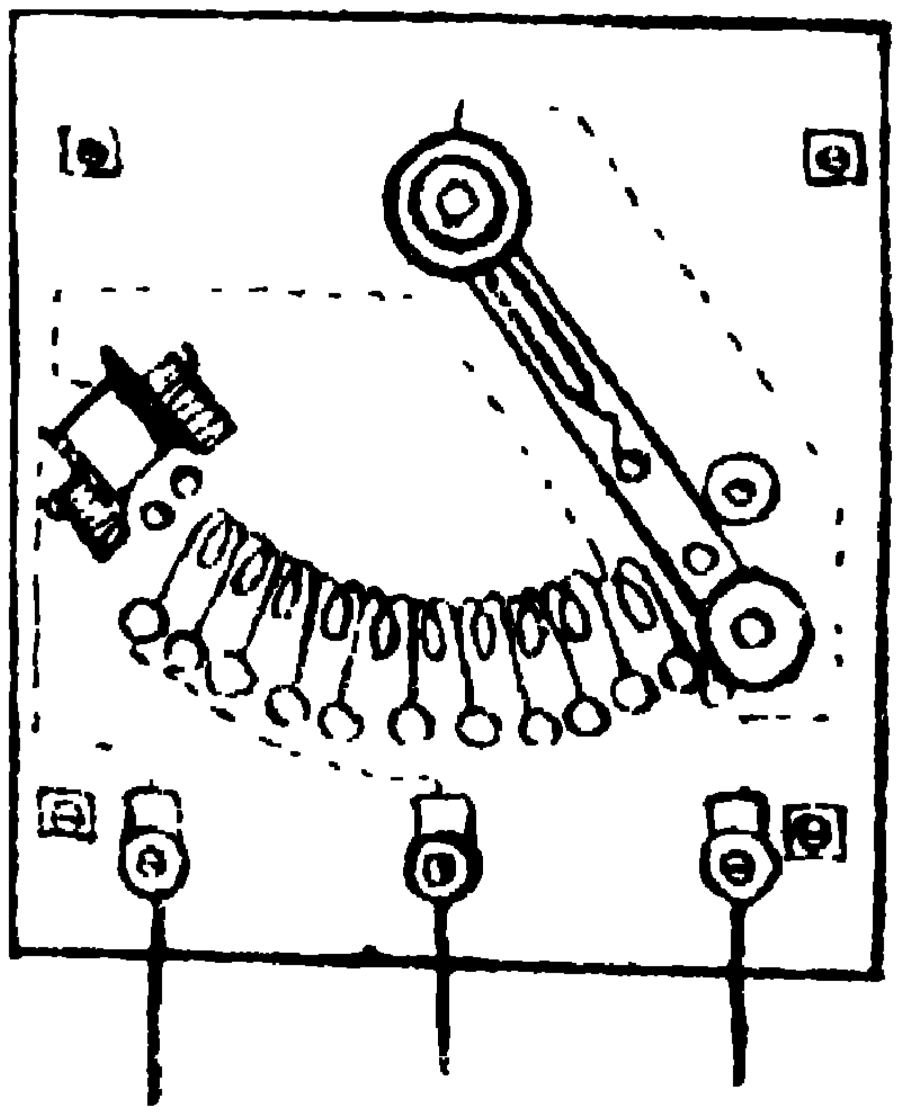

রিওষ্টাট্—ভিতরের দৃশ্য

যে-রেজিষ্টান্ট্ বাক্সের (Resistance box) কথা আগে বলিয়াছি, পরপৃষ্ঠায় তাহারো একটা ছবি দিলাম। যেমন নিক্তি বা দাঁড়ি-পাল্লা দিয়া আমরা নানা

জিনিষের ওজন ঠিক করি, এই যন্ত্রটি দিয়া সেই রকমে বাধা মাপার কাজ চালানো যায়। যন্ত্রটির গঠন কতকটা রিওষ্টাটেরই মতো।

ছবির ডাইনের অংশে দেখ, রিওষ্টাটের মতোই তার গুটানো রহিয়াছে এবং প্রত্যেক তারের বাধা জানা আছে। অর্থাৎ কোনোটার বাধা ১ ওম্‌স্, কোনোটার ২ ওম্‌স্ ইত্যাদি।

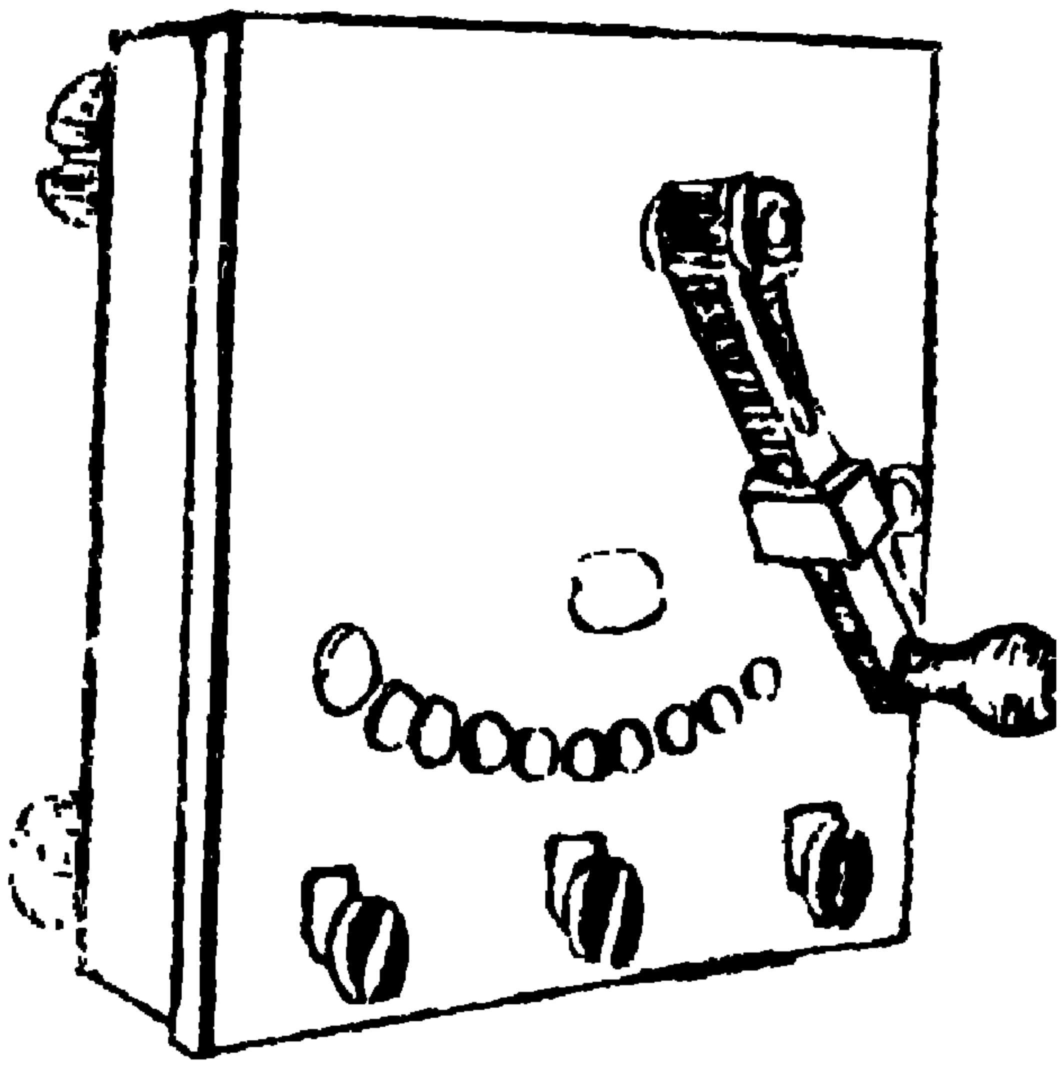

রিওষ্টাট্ -বাহিরের দৃশ্য

বাক্সের যে ঢাকনী দেখিতেছ, উহা মোটা রবার

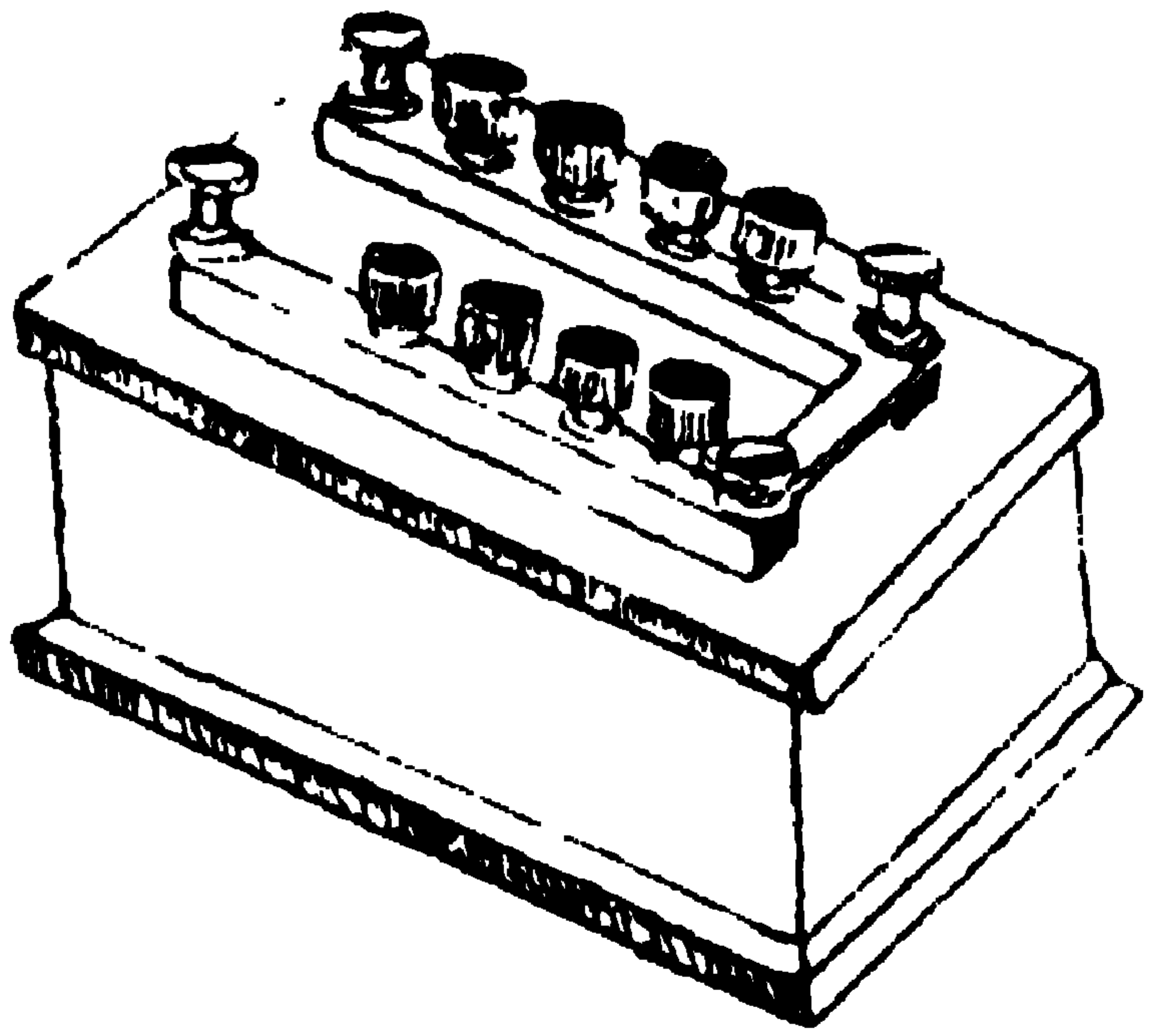

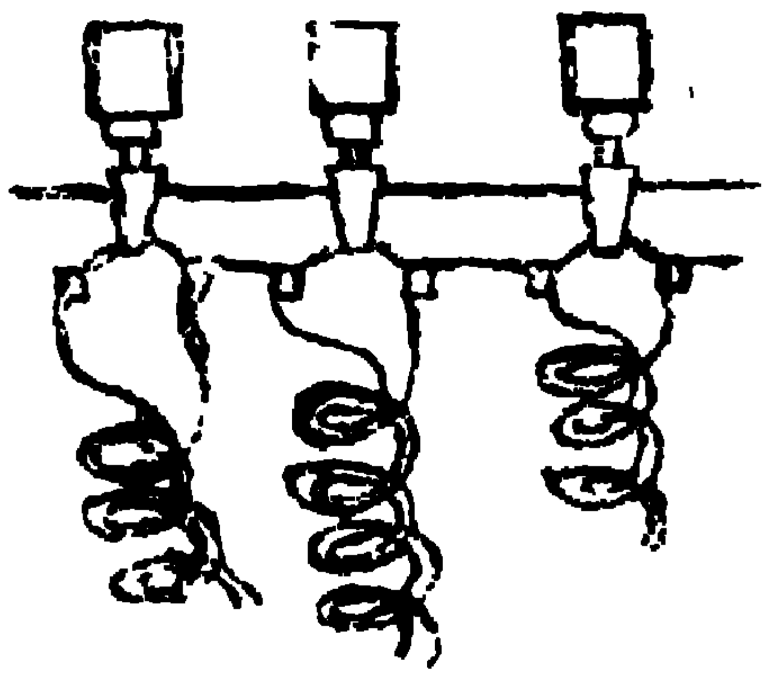

রেজিষ্টান্ট্ বাক্স

বা অন্য কোনো অপরিচালক জিনিষ দিয়া প্রস্তুত

তাহার উপরে যে বোতামের মতো অংশ সাজানো আছে, তাহা বোতাম নয়। সেগুলিকে ছিপি বলা যাইতে পারে। এগুলি সাজানো আছে পিতল বা অন্য পরিচালক ধাতুর পাতের উপরে। ছিপি আটকাইয়া দিলে বিদ্যুৎ পিতলের পাত অবলম্বন করিয়া ধাতু-নির্ম্মিত ছিপির ভিতর দিয়া অবাধে চলে। ছিপি খুলিয়া রাখিলে সেই বিদ্যুৎকে ছিপির তলাকার তারের বাধা কাটাইয়া আসিতে হয়। কাজেই, বিদ্যুতের জোর কমে। যখন সব ছিপিই লাগানো থাকে, তখন বিদ্যুৎ মোটা পিতলের পাতের ভিতর দিয়া চলে বলিয়া একটুও বাধা পায় না। সুতরাং প্রয়োজন মতো একটা, দুইটা ইত্যাদি ছিপি খুলিয়া বিদ্যুৎ-পথে এক, দুই ইত্যাদি ওমসের বাধা দেওয়া যায়।

কয়েকটি বিদ্যুৎ-কোষের বিবরণ

দস্তা ও তামার ফলককে জলে-মিশানো সল্‌ফিউরিক্ এসিডে ডুবাইলে যে বিদ্যুৎ-কোষ তৈয়ারি হয়, তাহার কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। ইহাতে তামার গায়ে যে হাইড্রোজেন্ জমা হয়, তাহা বিদ্যুতের পথে বাধা দেয় এবং তা-ছাড়া এসিড্ ক্রমে নষ্ট হইয়া গেলেও বিদ্যুৎ বাধা পায়। কাজেই, এই রকম কোষে বেশিক্ষণ ধরিয়া একভাবে বিদ্যুৎ চলিতে পারে না। সাধারণ কোষের এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য আজকাল অনেক রকম বিদ্যুৎ-কোষ ব্যবহার করা হইতেছে। এখানে তাহাদেরি কয়েকটির পরিচয় দিব।

পরপৃষ্ঠায় যে-কোষের ছবি দিলাম, তাহা প্রায় নব্বুই বৎসর আগে ডানিয়েল্ (Daniel) নামে এক

বৈজ্ঞানিক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাই ইহাকে ডানিয়েলের কোষ বলা হয়। ছবির V-চিহ্নিত অংশটি

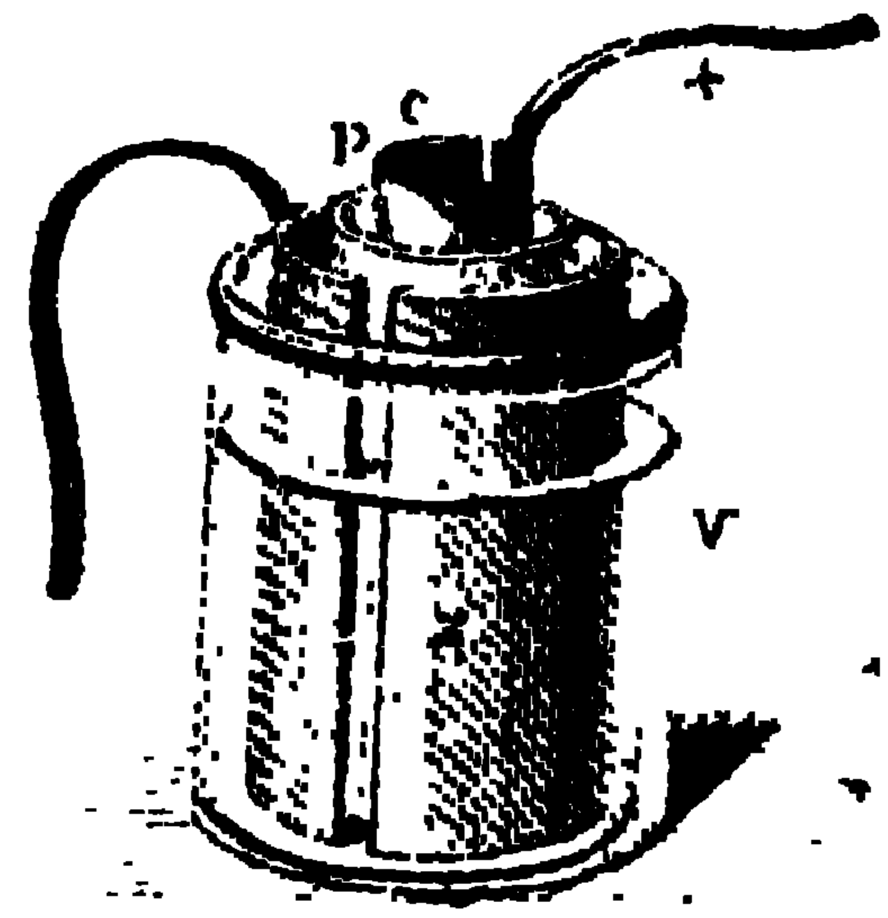

ডানিয়েলের কোষ

একটি কাচের পাত্র। ইহাতে তুঁতে-গোলা জল আছে। আবার পাত্রের কাণার চারিদিকে যে সেল্‌ফের মতো অংশ আছে তাহাতে গোটা গোটা তুঁতের দানা সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। জলটুকু যতটা তুঁতে গুলিয়া রাখিতে পারে, ঠিক্ সেই পরিমাণ তুঁতে মিশানো আছে। তাই সেল্‌ফের তুঁতের দানা আর জলে মিশিতেছে না। Z-চিহ্নিত অংশটি একটি তামার চোঙ্, ইহা তুঁতের জলের মধ্যে ডুবানো আছে। তার ভিতরে আছে P-চিহ্নিত গ্লাসের মতো মাটির পাত্র। গায়ে পালিস বা অন্য প্রলেপ লাগানো নাই বলিয়া ইহা আমাদের জল রাখিবার কুঁজোর মতো সচ্ছিদ্র। এই মাটির পাত্রটি সল্‌ফিউরিক্ এসিড্-মিশানো জল বা নুণের জলে ভর্ত্তি আছে। ইহারি ভিতরে যে C-চিহ্নিত অংশটি দেখা যাইতেছে, তাহা

একটি দস্তার চোঙ। এখানে ইহা ধন-ফলকের কাজ করে এবং ঋণ-ফলকের কাজ হয় তামার চোঙ দিয়া। তাহা হইলে দেখ, এই কোষে সল্‌ফিউরিক এসিড্‌ ও তুঁতের জল,—এই দুই রকম তরল পদার্থ আছে। এই দুইয়ে মিলিয়া কোষে যে হাইড্রোজেন্‌ জন্মে, তাহা নষ্ট হয়। তাই এই কোষের কাজ শীঘ্র বন্ধ হয় না। দস্তা ও তামার চোঙ দুটিকে তার দিয়া যুক্ত রাখো, দেখিবে এই কোষে অনেক দিন ধরিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতেছে। বহুকাল ধরিয়া বিদ্যুৎ পাওয়া যায় বলিয়া এই কোষকে স্থায়ী কোষ বলা হয়।

কোষের ভিতরে কি-রকমে কাজ চলে, তাহা অল্প কথায় বলা যায়। তার যোগ করিয়া দিলে সল্‌ফিউরিক এসিড্‌ ও দস্তায় মিলিয়া যে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে, তাহা তামার চোঙে যাইবার জন্য ছুটিয়া চলে। কিন্তু মাঝে তুঁতের জল আছে বলিয়া যাইতে পারে না। কারণ, তামায় পৌঁছিবার আগেই তাহা তুঁতের সঙ্গে মিশিয়া তুঁতেকে সল্‌ফিউরিক্‌ এসিড্‌ ও খাঁটি তামায় পরিণত করে। ইহাতে কি হয়, বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। তামার

সহিত মিশিয়া সল্‌ফিউরিক এসিডের যেমনি তেজ কমে, অমনি নূতন এসিড্ ভিতরে গিয়া তাহাকে তাজা রাখে। তাহা হইলে দেখ, বিদ্যুৎ চলার সময়ে এই কোষে কেবল জলে-মিশানো তুঁতেরই ক্ষয় হয়। কিন্তু এই ক্ষয় পূরণ করিবার উপায় সেখানেই থাকে। যেমনি জলের তুঁতে ক্ষয় পায়, অমনি কোষের মাথার উপরে যে তুঁতের দানা সাজানো থাকে, তাহা আপনিই জলের সঙ্গে মিশিয়া ক্ষয়ের পূরণ করে। সুতরাং দেখ, এই কোষকে একবার সাজাইলে, অনেক দিন ধরিয়া তাহাতে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। তুঁতের দানাগুলি যাহাতে ফুরাইয়া না যায় বা জল শুকাইয়া না যায়, কেবল সেইদিকেই দৃষ্টি রাখা দরকার। দস্তার চোঙে ভালো করিয়া পারা মাখাইয়া রাখিলে, তাহা অল্পদিনে ক্ষয় পায় না

ডানিয়েল্-কোষের প্রবাহক-বল প্রায়ই ১$\frac{১}{১০}$-এর বেশি হয় না। এই বল অনেক দিন ধরিয়া থাকে বলিয়া টেলিগ্রাফের কাজে ইহা ব্যবহার করা হয়। রেলষ্টেশনে যে-ঘরে টেলিগ্রাফ্-মাষ্টার কাজ করেন, সেখানে এই কোষ সাজানো আছে দেখিতে পাইবে।

এখানে যে-ছবিটি দেওয়া গেল, তাহা বুন্‌সেনের (Bunsen) কোষের চিত্র। ইহাতেও দস্তার চোঙ্ থাকে, কিন্তু তামা ব্যবহার করা হয় না। তামার বদলে কয়লার দাণ্ডা লাগানো থাকে। কয়লা বিদ্যুতের

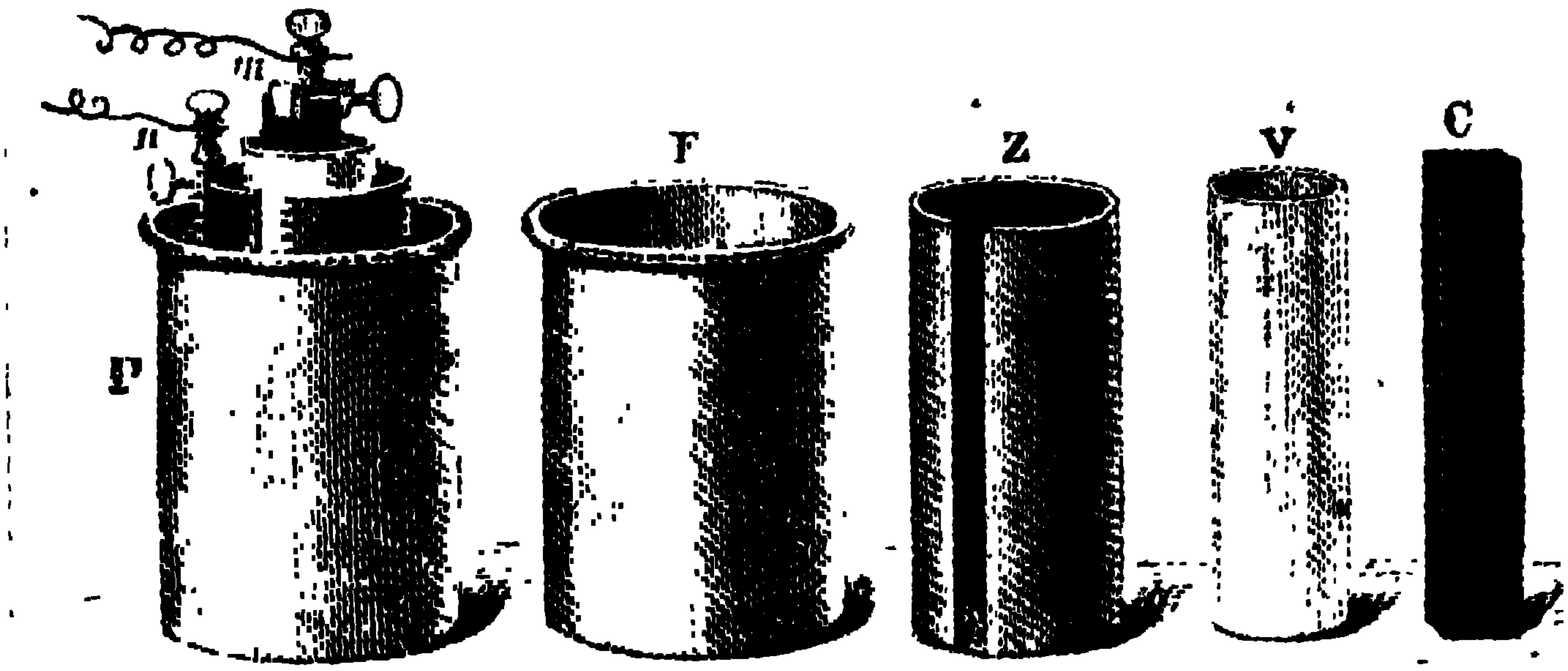

বুন্‌সেনের কোষ

পরিচালক। কিন্তু ইহা কাঠের কয়লার মতো জিনিষ নয়। গুঁড়া কোক্ এবং পাথুরিয়া কয়লাকে ছাঁচে জমাট করিয়া এই কয়লার দাণ্ডা তৈয়ারি করা হয়। ছবির “C”-অংশটি ঐরকম কয়লা ; V সচ্ছিদ্র মাটির পাত্র ; Z দস্তার চোঙ্ এবং F একটি চীনা মাটির পাত্র। এই পাত্রের ভিতরে অন্য অংশগুলি কি-রকমে রাখা হইয়াছে ; “P” ছবিতে তাহা আঁকা আছে।

পাত্রে জল-মিশানো সল্‌ফিউরিক এসিড্ রহিয়াছে। তার পরে ইহারি ভিতরে দস্তার চোঙ্ এবং সচ্ছিদ্র মাটির পাত্র ডুবানো আছে। মাটির পাত্রটি খালি নয়। ইহাতে খানিকটা খাঁটি নাইট্রিক্ এসিডে ভর্ত্তি করিয়া, তাহারি ভিতরে কয়লার দাণ্ডাকে ডুবানো হইয়াছে: এখানেও দস্তা ধন-ফলক এবং কয়লা ঋণ-ফলকের কাজ করে। অর্থাৎ তার দিয়া দস্তা ও কয়লাকে যোগ করিলে বাহিরে কয়লা হইতে দস্তার দিকে এবং কোষের ভিতরে দস্তা হইতে কয়লার দিকে বিদ্যুৎ চলিতে থাকে।

কোষের ভিতরে কি কাজ চলে বলা কঠিন নয়। সল্‌ফিউরিক্ এসিডে মিশিয়া দস্তা যে-হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে, তাহা কয়লার উপরে জমিবার জন্য মাটির পাত্র ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলে। কিন্তু যেই তাহা মাটির পাত্রের ভিতরকার নাইট্রিক্ এসিডে ঠেকে, অমনি তাহা এসিডের সঙ্গে মিশিয়া একটু জল এবং নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড্ (Nitrogen Tetroxide) নামক বাষ্পে পরিণত হয়। কাজেই, কয়লার গায়ে জমিয়া হাইড্রোজেন প্রবাহক-বলকে আর কমাইতে পারে না। কিন্তু এই কোষ ব্যবহার করার

সময়ে যে টেট্রোক্সাইড্ বাষ্প বাহির হয়, তাহার দুর্গন্ধ প্রায়ই অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়। পটাসিয়ম্ বাইক্রোমেট্ (Potassium Bichromate) এসিডের উপরে ছড়াইয়া দিলে ঐ বাষ্প নষ্ট হইয়া যায়।

বুন্সেনের কোষের প্রবাহক-বল প্রায় দুই ভোল্টের সমান। তাই ডানিয়েল কোষের বদলে এই কোষ ব্যবহার করিলে লাভ আছে। যেখানে ষ্টোরেজ ব্যাটারি নাই, সেখানে বিদ্যুতের পরীক্ষা দেখাইবার সময়ে আমরা এই কোষ ব্যবহার করিয়াছি।

পরপৃষ্ঠায় যাহার ছবি দিলাম তাহাকে বাই-ক্রোমেট্ (Bichromate) কোষ বলা হয়। এখানেও তামার বদলে কয়লা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে দুই রকমের তরল পদার্থ ব্যবহার করার দরকার হয় না। ছবির বোতলে জলে মিশানো সল্‌ফিউরিক্ এসিডের সঙ্গে পটাসিয়ম্ বাইক্রোমেট্ গুলিয়া রাখা হইয়াছে। CC চিহ্নিত অংশ দুটি কয়লার ফলক এবং মাঝের Z-চিহ্নিত ফলক দস্তায় নির্ম্মিত। এই ফলকের সঙ্গে যে পিতলের দাণ্ডা লাগানো আছে, তাহাকে টানিলে দস্তা এসিড্ ছাড়িয়া উপরে আসে। এই ব্যবস্থা আছে বলিয়া দস্তা অনাবশ্যক ক্ষয় পায় না।

যখন বিদ্যুতের দরকার হয়, তখন পিতলের দাণ্ডাকে নামাইয়া দিলেই দস্তা এসিডে ডুবিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে থাকে। এখানেও দস্তা ধন-ফলক এবং কয়লা ঋণ-ফলকের কাজ করে। কাজেই, তার দিয়া বাহির হইতে দস্তার সহিত কয়লাকে জুড়িলে, কয়লা হইতে দস্তার দিকে বিদ্যুৎ চলিতে থাকে।

বাইক্রোমেট্ কোষ

বুন্‌সেন্ ও ডানিয়েল্ কোষকে সাজানোর হাঙ্গামা অনেক। দুই চারিটা বাইক্রোমেট্ কোষ তৈয়ারি থাকিলে যখন-তখন বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতে পারে। ইহা কম সুবিধার কথা নয়। তা'ছাড়া ইহার প্রবাহক-বল দুই ভোল্টেরও বেশি, এজন্য বিদ্যুতের পরিমাণও ইহাতে বেশি হয়।

বাইক্রোমেট্-কোষের ভিতরে কি কাজ হয়, বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। দস্তার ফলকে

সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ ঠেকিলে যে হাইড্রোজেন্ জন্মে তাহা এসিডে-মিশানো পটাসিয়ম্ বাইক্রোমেটে নষ্ট করিয়া দেয়। কাজেই, হাইড্রোজেন্ কয়লায় গায়ে ঠেকিয়া বিপরীত প্রবাহক-বল উৎপন্ন করিতে পারে না।

এখানে আর যে একটি ছবি দেওয়া হইল, তাহা ল্যাক্‌ল্যাঞ্চ (George Laclanche) নামক এক বৈজ্ঞানিক নির্ম্মিত কোষের চিত্র। তাই ইহার নাম হইয়াছে ল্যাক্‌ল্যাঞ্চের কোষ। ইহাতেও দস্তা ও কয়লার ফলক থাকে, কিন্তু হাইড্রোজেন নষ্ট করার জন্য দুই রকম তরল পদার্থের দরকার হয় না। ছবির V চিহ্নিত অংশটি কাচের পাত্র। ইহাতে নিশা-দল মিশানো জল আছে। Z দস্তার দাণ্ডা এবং C কয়লার

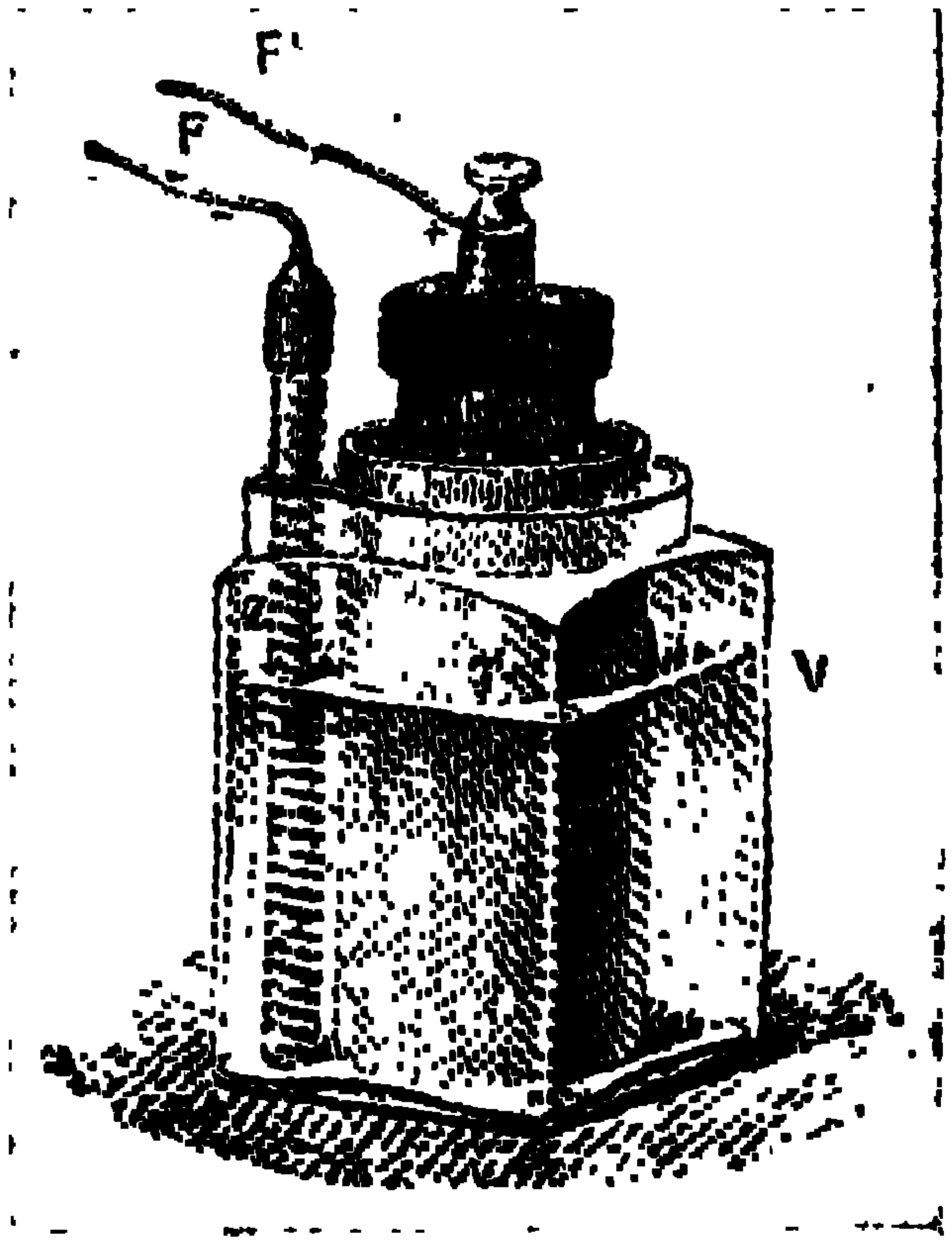

ল্যাক্‌ল্যাঞ্চের কোষ

ফলক। দেখ, এই ফলক T-চিহ্নিত সচ্ছিদ্র মাটির পাত্রের ভিতরে রহিয়াছে,—কিন্তু এই পাত্রে এসিড্

বা অন্য তরল বস্তু নাই। কয়লার ফলকের চারিদিকে কোক্ কয়লার গুঁড়া ও ম্যাঙ্গানিজ পারঅক্সাইড্ (Manganese per-oxide) ঠেসে পূরিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করা আছে। এখানেও দস্তার দাণ্ডা ধন-ফলক এবং কয়লা ঋণ-ফলকের কাজ করে।

কোষের ভিতরে যে রাসায়নিক কাজ চলে তাহা জটিল নয়। নিশাদলের সংস্পর্শে দস্তায় যে হাইড্রোজন উৎপন্ন হয়, তাঁহা মাটির সচ্ছিদ্র পাত্র ভেদ করিয়া কয়লার ফলকে যাইতে চায়। কিন্তু পাত্রের ভিতরে যে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড্ আছে, তাহা সেই হাইড্রোজেনকে জলে পরিণত করে। এই রকমে হাইড্রোজেন্ নষ্ট হওয়ায় বিদ্যুৎ জোরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই কোষের প্রবাহক-বল দেড় ভোল্টের বেশি হয় না।

ল্যাক্ল্যাঞ্চের কোষের ব্যবহারে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। সুবিধা এই যে, খানিকটা জলে নিশাদল গুলিয়া তাহাতে দস্তা ও সেই মাটির পাত্র ডুবাইলেই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এসিড্ প্রভৃতি নাড়াচাড়া করার হাঙ্গামা ইহাতে নাই। তা' ছাড়া দুই এক বৎসর চালাইলেও এই কোষ সহজে নষ্ট হয়

না। অসুবিধা এই যে, বেশিক্ষণের জন্য ইহাতে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ অবিরাম চালাইতে থাকিলে কোষে এত হাইড্রোজেন্ জন্মে যে, তাহা ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড্ ফস্ করিয়া নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই, বিরুদ্ধ প্রবাহক-বলে বিদ্যুতের প্রবাহ কমিতে আরম্ভ হয়। তাই এক-আধ মিনিটের জন্য বিদ্যুতের দরকার হইলে ল্যাক্ল্যাঙ্কের কোষে বেশ কাজ চলে। ইলেক্ট্রিক্ বেল্ অর্থাৎ বৈদ্যুত ঘণ্টা প্রভৃতির জন্য আজকাল এই কোষ হাজারে হাজারে ব্যবহার করা হইতেছে।

ইলেক্ট্রিক্ টর্চের জন্য যে কোষ ব্যবহার করা হয়. তাহা বোধ করি তোমরা দেখিয়াছ। ইহাতে এসিড্ বা অন্য কোনো তরল পদার্থের নাম-গন্ধ থাকে না। তাই ইহাতে ইংরেজিতে (Dry Cell) অর্থাৎ শুক্না কোষ বলা হয়। ইহার গঠন এবং কাজ ঠিক্ ল্যাক্ল্যাঙ্কের কোষেরই মতো। যে-কোষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে. তাহা ভাঙিয়া পরীক্ষা করিয়ো ; ভিতরে দস্তার দাণ্ডা, কয়লার ফলক, ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড্ ও নিশাদল দেখিতে পাইবে। তফাৎ এই যে, ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড্, নিশাদল এবং জিঙ্ক অক্সাইড্ নামে দস্তা-ঘটিত আর একটা

জিনিষকে মিশাইয়া কাদার মতো করা হয় এবং কয়লার ফলকটিকে ইহারি মধ্যে বসানো থাকে। তা'ছাড়া ইহার বাহিরে থাকে প্লাষ্টার অব্ পারিস এবং জিঙ্ক ক্লোরাইডের আর একটা প্রলেপ। তার পরে সমস্ত জিনিষটাকে দস্তার পাতে মুড়িয়া বাহিরের মুখে খানিকটা গালানো পিচ্ ঢালিয়া দিলেই শুকনা কোষ তৈয়ারি হইয়া যায়। লক্ষ্য করিলে তোমরা এই কোষের উপরে একটা সরু কাচের নল লাগানো দেখিতে পাইবে। এটি কেন থাকে, বোধ করি তোমরা জান না। বিদ্যুৎ চলিবার সময়ে ভিতরে যে বাষ্প জমে, তাহা যাহাতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহারি জন্য এই নল থাকে। এই কোষেও দস্তা ধন-ফলক, এবং কয়লা ঋণ-ফলকের কাজ করে। তাই এই দুই ফলকে, যে দুটি তার লাগানো থাকে, তাহা যোগ করিলেই কয়লা হইতে দস্তার দিকে বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করে। নামে শুক্না কোষ হইলেও, ইহার ভিতরটা খুব শুক্না থাকিলে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। তাই খুব শুকাইয়া গেলে এই কোষের বাহিরের আবরণে দুই চারিটা ছিদ্র করিয়া অল্পক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখিলে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। ডুবানো হইয়া গেলে ছিদ্রগুলিকে পিচ্ বা গালা দিয়া বন্ধ করা উচিত।

আমরা এখানে মোটামুটি কতকগুলির পরিচয় দিলাম। ইহা ছাড়া আরো অনেক কোষ আছে। আজকাল একুমিলেটার (Accumilator) দিয়া ইচ্ছামতো যখন-তখন বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। তা'-ছাড়া যে-সব বিদ্যুৎ-কোম্পানি পাখা ও আলোর জন্য সহরে বিদ্যুৎ জোগায়, সেখানে ডাইনামো দিয়া দিনে-রাতে যত-খুসী বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই-সব কারণে আজকাল বিদ্যুৎ-কোষের ব্যবহার অনেক কমিয়া আসিয়াছে। তাই সব কোষের বিবরণ দিলাম না।

বিদ্যুৎ-কোষের ব্যাটারি

তোমাদিগকে যে-সব কোষের কথা বলিলাম, তাহাদের কাহারো বিদ্যুৎ-প্রবাহক বল দুই ভোল্‌টের বেশি নয়। কাজেই, এই বলে ভিতরের ও বাহিরের বাধা কাটাইয়া যে-বিদ্যুৎ চলে, তাহা পরিমাণে বেশি

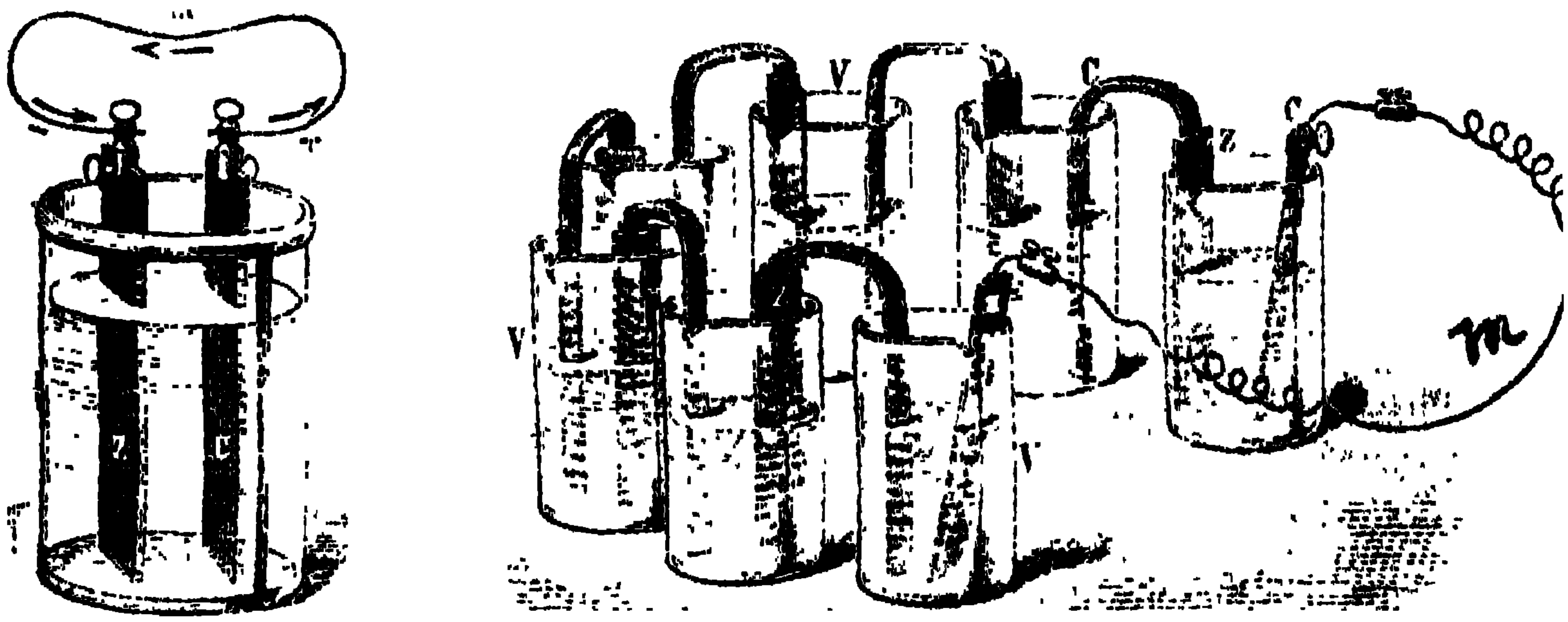

কোষ-সজ্জা

হয় না। তাই বেশী বিদ্যুৎ পাইতে গেলে আট দশ বা তাহারো বেশি কোষকে জুড়িয়া প্রবাহক-বল বাড়ানো হয়। দেখ, এখানকার ছবিখানিতে সাতটি কোষকে জুড়িয়া রাখা হইয়াছে। লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, কোষগুলিকে এলোমেলোভাবে জোড়া হয়

নাই। নীচেকার প্রথম কোষের তামা তাহার পরের কোষের দস্তাফলকের সঙ্গে জোড়া আছে। এই রকমে জোড় শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কাজেই, প্রথম কোষের দস্তা এবং শেষ কোষের তামা মুক্ত আছে। এখন এই দুই ফলককে তার দিয়া যোগ করিলেই খুব জোরালো বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সাধারণ কোষ হইতে বেশি বিদ্যুৎ পাইতে হইলে এই-রকম মালার মতো করিয়া কোষগুলিকে সাজাইতে হয়। এই মালাকারে (In series)-সাজানো কোষগুলিকে ব্যাটারি (Battery) বলা হয়।

ব্যাটারিতে কেন বিদ্যুতের জোর বাড়ে, হিসাব করিয়া বলা কঠিন নয়। মনে কর, পূর্ব্বের কোষগুলির প্রত্যেকটির প্রবাহক-বল যেন ২ ভোল্‌ট্‌। সাতটি কোষ আছে। কাজেই, প্রথম কোষের তামার ফলক এবং শেষ কোষের দস্তার ফলকের প্রবাহক-বল ৭ × ২ অর্থাৎ ১৪ ভোল্‌ট্‌ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতেই বাহিরের M-চিহ্নিত তার দিয়া বেশি বিদ্যুৎ চলে। তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, সাতটা কোষে প্রবাহক-বল যেমন সাত গুণ হয়, তেমনি কোষের ভিতরকার বাধাও সাত গুণ হয় না কি? বাধা সাত গুণ হয় বটে, কিন্তু

বাধা বাড়িলেও মোট বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়ে। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে কর, যেন ঐ সাতটি কোষের প্রত্যেকের প্রবাহক-বল দুই ভোল্ট এবং তাহার ভিতরকার বাধা ১ ওম্‌স্। তা' ছাড়া বাহিরে যে M-চিহ্নিত তার লাগানো আছে, তাহার বাধা যেন ১০ ওম্‌স্। সুতরাং, এই রকম এক-একটি কোষের বিদ্যুতের জোর হইবে, $\frac{২}{১+১০}=\frac{২}{১১}$ আম্পিয়ার। তার পরে মনে কর, সাতটি কোষকে পূর্ব্বের ছবির মতো মালাকারে সাজানো হইয়াছে। কাজেই, এখানে প্রবাহক-বল ১৪ ভোল্ট এবং ভিতরকার মোট বাধা ৭ ওম্‌স্ হইবে। কিন্তু বাহিরের বাধা সেই ১০ ওম্‌স্‌ই থাকিবে। সুতরাং, ওম্‌সের নিয়ম-অনুসারে বিদ্যুতের জোর হইবে $\frac{১৪}{৭+১০}=\frac{১৪}{১৭}$ আম্পিয়ার। এখন $\frac{২}{১১}$ এবং $\frac{১৪}{১৭}$ আম্পিয়ারের মধ্যে কোন্‌টি বড় বলা যায় না কি? $\frac{১৪}{১৭}$ বড়। তাহা হইলে দেখ, সাতটি মালাকারে যোগ করায় যে-বিদ্যুৎ পাওয়া গেল, তাহা একটা কোষের বিদ্যুতের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো।

মালাকারে না সাজাইয়া সাতটি কোষের দস্তার ফলককে পরস্পর যোগ কর এবং তার পরে তামার

ফলকগুলিকে পরস্পর যোগ করিয়া রাখো। এই রকমে সাতটি দস্তার ফলক এবং সাতটি তামার ফলক লইয়া যে-দুইটি প্রকাণ্ড ফলক হইল, তাহাদিগকে তার দিয়া যোগ করিলেও বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই প্রকারে কোষ সাজানোকে বলা হয় সমান্তর (In parallels) সজ্জা। কেন বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তাহা সহজে হিসাব করিয়া বলা যায়। তোমাদের আগেই বলিয়াছি, কোনো কোষের ফলক দুটিকে যত ছোটো বা যত বড় করা যাউক না কেন, ইহাতে তাহার প্রবাহক-বল একটুও কমে-বাড়ে না। ফলকের প্রসার অনুসারে কেবল ভিতরকার বাধার পরিমাণ কমে বা বাড়ে। সুতরাং, সাতখানা দস্তার ফলক ও সাতখানা তামার ফলক যোগ করিয়া যে-দুইটি প্রকাণ্ড ফলক পাওয়া গেল, তাহাতে প্রবাহক-বল বাড়িল না। ফলকের প্রসার বাড়িয়া যাওয়ায় কেবল কোষের ভিতরকার বাধা কমিয়া আসিল। কি-হারে কমে, তাহাও তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। প্রসার দ্বিগুণ হইলে বাধা অর্দ্ধেক হয়, তিন গুণ হইলে এক-তৃতীয় হয়, ইত্যাদি। সুতরাং সাতটি ফলককে এক করিয়া যে-কোষ

পাওয়া গেল, তাহার ভিতরকার বাধা আগেকার $\frac{১}{৭}$ হইয়া দাঁড়াইবে।

এখন সাতটি কোষের সমান্তর সজ্জায় বিদ্যুতের জোর কি হইবে, হিসাব করা যাউক। প্রত্যেক কোষের প্রবাহক-বল ২ ভোল্‌ট, ভিতরকার বাধা ১ ওম্‌স্‌ এবং বাহিরের তারের বাধা ১০ ওম্‌স্‌ আছে। এই সজ্জায় একটি কোষের প্রবাহক-বল যাহা, সাতটি কোষের প্রবাহক-বলও তাহা। কাজেই, ওম্‌সের নিয়ম অনুসারে সমান্তর সজ্জায় বিদ্যুতের জোর $\frac{২}{\frac{১}{৭}+১০}=\frac{১৪}{৭১}$ আম্পিয়ার হইয়া দাঁড়াইবে। সেই সাতটি কোষকে মালাকারে সাজাইয়া বিদ্যুৎ হইয়াছিল $\frac{১৪}{১৭}$ এখন হইল $\frac{১৪}{৭১}$। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি বেশি সহজেই বলা যায়, $\frac{১৪}{৭১}$ ই বেশি। সুতরাং বলিতে হয়, সমান্তর সজ্জায় যে-বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তাহার চেয়ে মালাকার সজ্জায় বিদ্যুৎই বেশি হয়। যখন বাহিরের বাধা বেশি থাকে, তখন এই জন্যই বেশি বিদ্যুৎ পাইতে হইলে কোষগুলিকে মালাকারে সাজানো হইয়া থাকে। তোমাদের কাছে যদি তিন-চারিটি একই রকমের

শুক্না কোষ থাকে, তবে বাহিরের বাধা একই রাখিয়া সেগুলিকে একবার মালাকারে এবং আর একবার সমান্তরাল ভাবে সাজাইয়া পরীক্ষা করিয়ো।

কিন্তু সকল সময়েই কোষগুলিকে মালাকারে সাজাইলে বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। বাহিরের সংযোজক তারের বাধা যখন খুব বেশি থাকে, তখনি মালাকার সজ্জায় লাভ হয়। বাহিরের বাধা কম থাকিলে সে-লাভ হয় না। তখন সমান্তরাল সজ্জায় বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। তাই এক শত, দেড় শত মাইল লম্বা টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে গেলে মালাকারে-সজ্জিত কোষ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু খুব মোটা ও খাটো তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইবার সময়ে মালাকার-সজ্জায় সুবিধা হয় না। তখন কোষগুলিকে সমান্তরালভাবে না সাজাইলে বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি, তাহা ওম্‌সের $প = \frac{ব}{বা + ভ}$ এই সূত্র হইতেই বুঝা যায়। এখানে প = বিদ্যুতের পরিমাণ, ব = প্রবাহক-বল, বা = বাহিরের বাধা, ভ = কোষের ভিতরকার বাধা। যখন "বা"-এর পরিমাণ খুব বেশি হয়, তখন "ভ" কতটা ছোটো, সেদিকে লক্ষ্য না রাখিলে ক্ষতি হয়

না। এই অবস্থায় "ব"কে বেশি করিতে পারিলেই বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। অর্থাৎ মালাকারে সাজাইয়া "ব"-এর পরিমাণ বাড়াইতে হয়। কিন্তু যখন "বা"-এর পরিমাণ নিতান্ত অল্প, তখন "ভ"কে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। এই অবস্থায় "ভ"কে যত কমানো যায়, বিদ্যুতের পরিমাণ ততই বাড়িয়া চলে। সমান্তরাল-সজ্জায় "ভ"এর পরিমাণ কমে বলিয়াই বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়ে। তোমরা আর একটা কথা মনে রাখিয়ো,—কোষগুলিকে যে-ভাবে সাজাইলে তাহাদের মোট ভিতরকার বাধা বাহিরের বাধার সঙ্গে সমান বা প্রায় সমান হয়, সেই সজ্জাই মোটের উপরে লাভজনক।

সণ্ট্স্

এখানে একটা ছবি দিলাম। দেখ, একটা তার মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, শেষে আবার একত্র মিলিয়াছে। সমস্ত তার একই ধাতু দিয়া তৈয়ারি এবং তাহার শেষের এবং গোড়ার অংশ একই রকম মোটা। কিন্তু মাঝের শাখা দুটির স্থূলতা এক নয়। AI_1B মোটা ও খাটো এবং AI_2B সরু ও লম্বা।

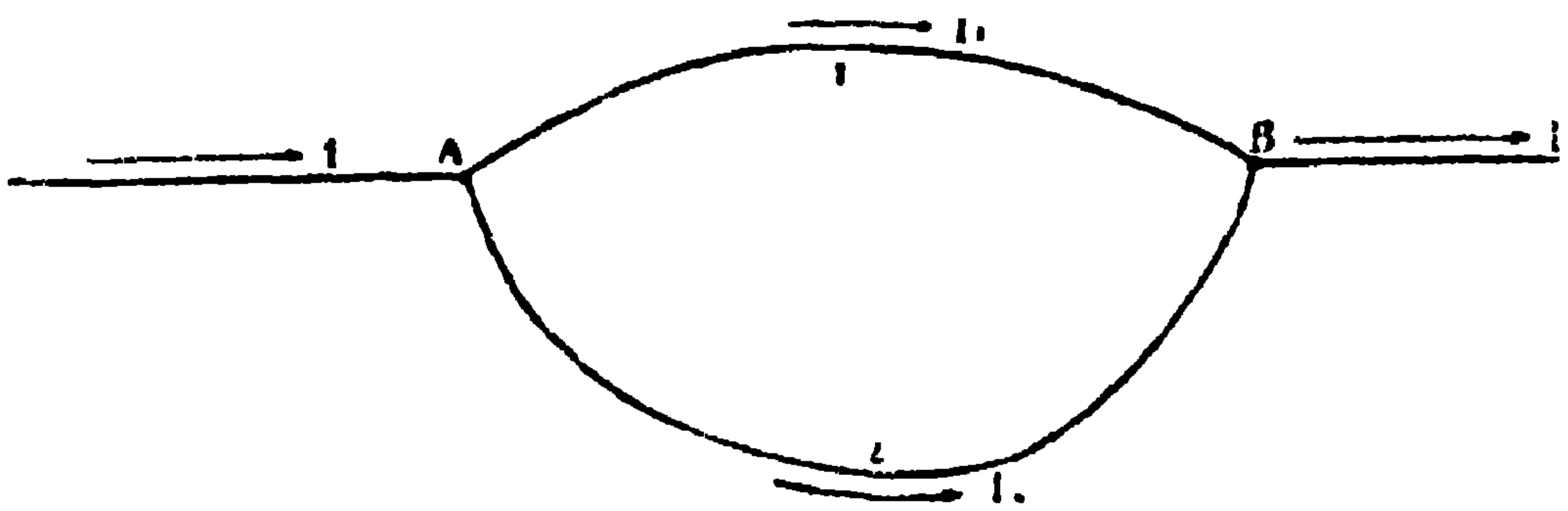

শাখা-তার বা সণ্ট্স্

তার যত সরু ও লম্বা হয়, বিদ্যুৎ-পথে তাহা ততই বাধা দেয়। ইহা তোমরা জানো। এখন তারের বাঁ হইতে ডাইন দিকে যদি বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করে, তবে সেই বিদ্যুৎ শাখায় ঠেকিয়া কোন্ শাখায় কতটা করিয়া চলিবে, তোমাদিগকে সেই কথাটা এখানে বলিব।

এই-রকম বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে নলের ভিতরকার জলের প্রবাহের তুলনা করা যাইতে পারে। মনে কর, ছবির PAB যেন একটা জলের নল। নলটা A জায়গায় আসিয়া দুইটি সরু শাখা-নলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। মনে করা যাউক, শাখা দুটির মধ্যে AI_1B-এর ফাঁদ যেন AI_2B-এর ফাঁদের দ্বিগুণ। নল যত সরু হয়, জল চলিবার সময়ে তাহার ভিতরে তত বেশি বাধা পায়। তাই কোনো বড় পাত্রের তলায় একটা মোটা এবং আর একটা সরু নল লাগাইলে সরুর চেয়ে মোটা নল দিয়াই বেশি জল চলে। কাজেই, এখানেও সরু AI_2B নলের চেয়ে মোটা AI_1B দিয়া বেশি জল চলিবে। মনে কর, উপরকার মোটা নলে জল যে-বাধা পাইতেছে, নীচের সরু নলে তাহারি দ্বিগুণ বাধা আছে। এই অবস্থায় A জায়গায় আসিয়া জলটা কি-রকমে ভাগ হইয়া দুই শাখা-নলে চলিবে, বলা যায় না কি? সরু শাখা-নলের বাধা মোটা শাখা-নলের বাধার দ্বিগুণ। কাজেই, সরু নল দিয়া সেকেণ্ডে যতটা জল চলিবে, মোটা নল দিয়া তাহারি দ্বিগুণ জল চলিতে থাকিবে। অর্থাৎ বাধার বিলোম অনুপাতে (Inversely) জল চলিবে।

যে-নিয়মে শাখা-নলের ভিতর দিয়া জল চলে, বিদ্যুতের পথে দুই তিন বা তাহারো বেশি শাখা-পথ থাকিলে ঠিক্ সেই-নিয়মেই বিদ্যুৎ চলে। একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি তোমরা বিষয়টা ভালো বুঝিতে পারিবে। মনে কর, AI_1B শাখার বাধা ২০ ওম্স্ এবং AI_2B-এর বাধা ৪০ ওম্স্। অর্থাৎ দ্বিতীয়ের বাধা প্রথমের দ্বিগুণ। কাজেই, দ্বিতীয় দিয়া যে-বিদ্যুৎ চলিবে, তাহার দ্বিগুণ বিদ্যুৎ প্রথম দিয়া চলিতে থাকিবে। অর্থাৎ PA তারের ভিতর দিয়া যে-বিদ্যুৎ আসিতেছে, তাহা A জায়গায় আসিয়া ২০+৪০ অর্থাৎ ৬০ ভাগ হইয়া গেল এবং তাহার মধ্যে ৪০ ভাগ চলিল AI_1B দিয়া এবং বাকি ২০ ভাগ গেল AI_2B দিয়া। আবার মনে কর, AI_1B-এর বাধা যেন ১ ওম্স্ এবং AI_2B-এর বাধা ৯৯৯ ওম্স্। সুতরাং, আগের নিয়ম অনুসারে সমস্ত বিদ্যুৎ ১+৯৯৯ অর্থাৎ ১০০০ ভাগ হইয়া যাইবে এবং তাহার ৯৯৯ ভাগ চলিবে মোটা AI_1B তার দিয়া এবং বাকি ১ ভাগ চলিবে সরু AI_2B নল দিয়া। তাহা হইলে জানা গেল, যেমন বাধার বিলোম অনুপাতে নলের ভিতর দিয়া জল চলে, বিদ্যুৎও অবিকল সেই নিয়মেই

তারের ভিতর দিয়া বহিয়া যায়। দুইয়ের বদলে তিন চার বা তাহারো বেশি শাখা থাকিলেও ঠিক এই নিয়মেই বিদ্যুৎ ভাগ হইয়া চলে। তাহা হইলে দেখ, মোট বিদ্যুতের পরিমাণ এবং তারগুলির বাধার পরিমাণ জানা থাকিলে কোন্ তার দিয়া কতটা বিদ্যুৎ চলিবে, তাহা অনায়াসে হিসাব করিয়া বলা চলে।

বিদ্যুতের প্রবাহ যখন খুব জোরালো থাকে, তখন তাহাকে সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়া মাপিতে গেলে যন্ত্র খারাপ হইয়া যায়। তাই, যে-তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে, তাহাতে সরু শাখা-তার লাগানো হয়। এই সরু তারের বাধার পরিমাণ জানা থাকে। কাজেই, ইহার ভিতর দিয়া সমস্ত বিদ্যুতের কত অংশ চলে তাহাও জানা যায়। তার পরে এই শাখা-তারের মৃদু বিদ্যুৎকে যন্ত্র দ্বারা মাপিয়া, সমস্ত বিদ্যুতের পরিমাণ ঠিক্ করা হয়। অনেক যন্ত্রের বিবরণে তোমরা এই-রকম শাখা-তারের ব্যবহার দেখিতে পাইবে।

বিদ্যুতের শক্তি

খুব জোরে হাত ঘষিলে হাত গরম হয়। কামার লোহার উপরে জোরে হাতুড়ি ঠুকিল, লোহা গরম হইল। এই তাপ আসে কোথা হইতে? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, তোমার আমার এবং কামারের গায়ের যে শক্তিটুকু দিয়া হাত ঘষা হইল বা হাতুড়িকে উপরে উঠানো হইল, সেই শক্তিই তাপে রূপ পাইয়াছিল। শক্তির এই যে রূপান্তর, বিজ্ঞানের একটা বড় কথা। শক্তির লয় নাই এবং সৃষ্টিও নাই। আছে কেবল স্থিতি। কিন্তু স্থিতিতে শক্তির রূপ এক রকম থাকে না। শক্তির রূপান্তর লইয়াই সৃষ্টির লীলা। এন্‌জিনে কয়লা পোড়াইয়া যখন আমরা রেলগাড়ি চালাই, তখন কি হয় ভাবিয়া দেখ। কয়লার ভিতরে যে-শক্তি লুকাইয়া ছিল, তাহা তাপ-শক্তিতে পরিণত হয়। তার পরে সেই তাপ-শক্তিই চলৎ-শক্তি (Kinetic Energy)-রূপে প্রকাশ পায়। গাড়িকে হঠাৎ থামাইয়া দাও, দেখিবে, যে-পরিমাণ তাপ-শক্তি তাহাতে চলৎ-শক্তির রূপ পাইয়াছিল, গাড়ি

হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় অবিকল সেই পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা মুখের কথা নয়, প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় চলৎ-শক্তি ও তাপ-শক্তির এই সম্বন্ধ দেখানো যায়। এই রকম পরীক্ষা করিয়াই প্রায় আশী বৎসর আগে ইংরেজ-বৈজ্ঞানিক জুল (Joule) দেখাইয়াছিলেন, এক পাউণ্ড ওজনের জিনিষকে ৭৭২ ফুট উপরে উঠাইতে যে-শক্তির দরকার হয়, তাহা তাপে রূপান্তরিত হইলে এক পাউণ্ড জলকে ফার্ণহিটের এক ডিগ্রি পর্য্যন্ত গরম করিতে পারে। সুতরাং দেখ, কোনো তাপ-শক্তি কি-পরিমাণ কাজ করিতে পারে, তাহা দেখিয়া উহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু এই জগতে তাপই একমাত্র শক্তি নয়। আলোক-শক্তি, চুম্বক-শক্তি, বিদ্যুৎ-শক্তি, ইহারাও শক্তির বিভিন্ন রূপ। ইহাদের পরিমাণ স্থির করার উপায় কি? তাপ-শক্তিকে যেমন তাহার কাজের পরিমাণ দিয়া মাপা হয়, বৈজ্ঞানিকেরা অন্যান্য শক্তিকেও ঠিক্ সেই-রকমেই তাহাদের কাজ করিবার সামর্থ্য দিয়া মাপিয়া থাকেন। তাপ যেমন কাজ দেখায়, চুম্বক ও বিদ্যুতের শক্তিও ঠিক্ সেই-রকমেই কাজ দেখায়। সুতরাং, তাপের শক্তিকে যেমন ফুট-পাউণ্ড দিয়া মাপা

যায়, এই সকল শক্তিকে সেই রকমে মাপার কোনো অসুবিধা নাই। বিদ্যুতের শক্তিকে কি-রকমে মাপা হয়, এখানে তোমাদিগকে তাহারি কথা বলিব। কোষ বা ডাইনামো হইতে বাহির হইয়া বিদ্যুৎ মোটর চালায়, রাসায়নিক কাজ করে। সুতরাং, বিদ্যুতের শক্তিকে মাপার যথেষ্ট সুবিধাই আছে বলিতে হয়।

শক্তি (Energy) এবং সামর্থ্য (Power) এই দুইটি কথা বাংলা ভাষায় প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাদের অর্থে একটু তফাৎ আছে। শক্তি যে-হারে কাজ করে, তাহাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় সামর্থ্য বলা হয়। তোমার বা আমার গায়ের সামর্থ্য মাপিতে গেলে এক পাউণ্ড ভারকে আমরা এক মিনিটে কত উঁচুতে উঠাইতে পারি, তাহা লইয়া হিসাব করি। যে এন্‌জিন্ গাড়ি টানে, বড় বড় চাকাকে ঘোরায়, তাহার সামর্থ্য মাপিতে গেলেও ঐ ফুট-পাউণ্ড লইয়া হিসাব করিতে হয়। যে এন্‌জিন ৩৩০০০ পাউণ্ড ওজনকে এক মিনিটে মাটি হইতে এক ফুট্ উপরে উঠাইতে পারে, তাহার সামর্থ্যকে বলা হয় এক হর্স-পাউয়ার (Horse-power)। বড় বড় এন্‌জিনের জোর ত্রিশ, চল্লিশ, এক শত, দেড়

শত হর্স-পাওয়ার হইতে দেখা যায়। এন্‌জিনের সামর্থ্যের মতো বিদ্যুতের সামর্থ্যকেও ফুট-পাউণ্ড দিয়া মাপা হয়। মনে কর, কোনো তারের ভিতর দিয়া যেন প্রতি সেকেণ্ডে "ক" আম্পিয়ার পরিমাণে বিদ্যুৎ চলিতেছে এবং সেই বিদ্যুতের প্রবাহক-বল যেন "খ" ভোল্‌ট্। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রতি সেকেণ্ডে ইহার কাজের পরিমাণ হইয়া দাঁড়ায় ক × খ। গণিতের ভাষায় লেখা যায়, সামর্থ্য (কাজের হার) = আম্পিয়ার × প্রবাহক-বল = ক × খ

আমরা যখন ১৫ পাউণ্ড ওজনের জিনিষকে এক মিনিটে ১০ ফুট উপরে উঠাই, তখন এই কাজটাকে যেমন বলা হয় ১৫ × ১০ অর্থাৎ ১৫০ ফুট্-পাউণ্ড, বিদ্যুতের কাজের হিসাবটা কতকটা সেই-রকমেরই। কিন্তু হিসাব করিতে গেলেই একটা Unit অর্থাৎ মাত্রার দরকার হয়। এক পাউণ্ড জিনিষকে মিনিটে এক ফুট্ উপরে উঠাইলে যে-কাজ হয়, তাহাই গায়ের জোর বা এঁন্‌জিন্ প্রভৃতির সামর্থ্যের মাত্রা। ইহাকেই বলা হয় ফুট-পাউণ্ড। বিদ্যুতের সামর্থ্যের হিসাব করিবার সময়ে সেই-রকম একটা মাত্রার দরকার হয়। এই মাত্রাকে বলা হয় ওয়াট্ (Watt)। এক

আম্পিয়ার পরিমাণ বিদ্যুৎ এক ভোল্‌ট প্রবাহক-বলে চলিয়া এক সেকেণ্ডে যে-কাজটুকু করে, তাহাকেই বলা হয় এক ওয়াট্‌। সুতরাং আগে সামর্থ্যের যে-হিসাব লেখা গিয়াছে, তাহাকে সামর্থ্য=ক×খ ওয়াট্‌, এই রকম লেখাই সঙ্গত।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ওয়াট্‌ একটা কাল্পনিক জিনিষ। কিন্তু তাহা নয়। হিসাব করিলে দেখা যায়, বিদ্যুতের এক ওয়াট্‌ কাজ প্রায় ৪৪ ফুট্‌-পাউণ্ড কাজের সমান। অর্থাৎ এক আম্পিয়ার বিদ্যুৎ, এক ভোল্‌ট প্রবাহক-বলে চলিয়া এক সেকেণ্ডে যে-কাজ করিতে পারে, তাহা ৪৪ পাউণ্ড ওজনের জিনিষকে এক মিনিটে মাটি হইতে এক ফুট্‌ উঁচুতে উঠানো যায়। অর্থাৎ—
৩৩০০০ ফুট্‌-পাউণ্ড (এক হর্স-পাওয়ার)=৭৪৬ ওয়াট্‌।

তোমাদের আগেই বলিয়াছি, এক পাউণ্ড জিনিষকে ৭৭২ ফুট্‌ উপরে উঠাইতে যে-শক্তির দরকার হয় তাহা এক ডিগ্রি গরম এক পাউণ্ড জলের তাপের শক্তির সমান। এন্‌জিন্‌, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির কাজকে ফুট্‌-পাউণ্ড দিয়া মাপা চলে। কিন্তু সাধারণত ইহাকে হর্স-পাওয়ার অর্থাৎ ঘোড়ার জোর দিয়াই মাপা হয়। মনে রাখিয়ো, এক ঘোড়ার জোর ৩৩০০০ ফুট্‌-পাউণ্ডের সমান।

বিদ্যুতের তাপ

সরু তারের ভিতর দিয়া কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ চলিলে তার গরম হইয়া উঠে। বিদ্যুতের পরিমাণ যদি বেশি থাকে, তবে তাহা লাল হয় এবং শেষে জ্বলিয়া-পুড়িয়া যায়। বিদ্যুতের বাতির জন্য সহরের বাড়িতে-বাড়িতে সুইচ্-বোর্ডে যে-সুইচ্ থাকে, তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। সুইচের তারের ভিতর দিয়া বেশি বিদ্যুৎ গেলেই তাহা পুড়িয়া যায়। তোমাদের বাড়িতে যে-বিদ্যুতের বাতি আছে, তাহা বিদ্যুতের তাপেই জ্বলে। বাল্বের ভিতরকার তার দিয়া বিদ্যুৎ চলিলে, তাহা প্রথমে গরম হয়। তার পরে যেমন বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, তেমনি সেই তার আগে লাল হইয়া ক্রমে সাদা হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরেও যদি বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়ে, তবে তার গলিয়া যায়। তাহা হইলে দেখ, তাপ উৎপন্ন করা বিদ্যুতের একটা প্রধান গুণ।

কি-রকমে এই তাপ জন্মে বোধকরি তোমরা জানো না। কোনো জিনিষ খুব জোরে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ বাধা পায়, তবে তাহার চলৎ-শক্তি তাপ হইয়া দাঁড়ায়। এই কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। ইহার উদাহরণ আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। হাতে-হাতে ঘষিলে হাত গরম হয়। পৌষ মাসের ঠাণ্ডায় যখন আমাদের হাত অসাড় হইয়া যায়, তখন আমরা ঐরকম হাতে-হাতে ঘষিয়া হাত গরম করি। যে-শক্তি দিয়া আমরা হাত দু'খানিকে ঘষিতে থাকি, তাহা ঘর্ষণে বাধা পায়। তাই হাতের চলৎ-শক্তি তাপ হইয়া দাঁড়ায়। পঞ্চাশ-ষাটখানি মালগাড়ি টানিয়া এন্‌জিন্ রেলের উপর দিয়া চলিয়া গেলে, তোমরা যদি রেলে হাত দিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, লোহার রেল গরম হইয়া উঠিয়াছে। এখানে গাড়ির চাকা রেলে বাধা পায়, তাই তাহার চলৎ-শক্তি তাপ হইয়া দাঁড়ায়। কামানের গোলা ভীষণ বেগে চলিয়া যখন লোহার জাহাজের গায়ে ধাক্কা দেয়, তখন লোহা গরম হইয়া উঠে। কেন গরম হয়, বলা কঠিন নয়। যে-শক্তিতে গোলা মিনিটে ত্রিশ মাইল বেগে চলিতেছিল, তাহা লোহায় ঠেকিয়া বাধা পায়। কাজেই,

গোলার চলৎ-শক্তি তাপ হইয়া দাঁড়ায়। চলৎ-শক্তির তাপে রূপান্তরিত হওয়ার এই রকম আরো অনেক উদাহরণ হয় ত তোমরা এখন নিজেরাই দিতে পারিবে। বিদ্যুৎ চলিলে তারের গরম হওয়া ব্যাপারটা ঠিক্ এই রকমেই ঘটে। আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের মতে বিদ্যুতের প্রবাহটা যে কি, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। অসংখ্য ইলেক্‌ট্রন্ প্রচণ্ড বেগে তারের ভিতর চলিয়াই বিদ্যুতের প্রবাহ দেখায়। কিন্তু সেগুলি তারের ভিতর দিয়া অবাধে চলিতে পারে না, তারে যে কোটী-কোটী পরমাণু আছে, তাহাদের সহিত ইলেক্‌ট্রনের ক্রমাগত ধাক্কা-ধুক্কি চলে। ধাক্কা লাগিলেই চলৎ-শক্তি তাপ হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই, সেই তাপে তার গরম হয়।

তাহা হইলে দেখ, এক টুক্‌রা ধাতুর তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে থাকিলে, দুই কারণে তাহার তাপের মাত্রা বাড়ে-কমে। বিদ্যুৎ বেশি গেলে, অর্থাৎ বেশি ইলেক্‌ট্রন্ তারের ভিতর দিয়া চলিলে তারের পরমাণুর সঙ্গে বেশি সংঘর্ষণ হয়। কাজেই, তাপ বাড়ে। কম বিদ্যুৎ গেলে কম সংঘর্ষণ হয়। সুতরাং তাপ কমে। আবার তার যদি সরু হইয়া

ইলেক্ট্রনের পথে বাধা দেয়, তবে সংঘর্ষণ বেশি হয়। ইহাতেও তাপ বাড়ে। তার মোটা হইলে ইলেক্ট্রন্ অবাধে চলিবার পথ পায়। তখন সংঘর্ষণ কম হয় বলিয়া তাপ কমে। সুতরাং বলিতে হয়, বিদ্যুতের পরিমাণ ও তারের বাধা, এই দুইটির উপরে তাপের পরিমাণ নির্ভর করে।

প্রায় ৭৫ বৎসর আগে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জুল বিদ্যুতের তাপ-সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়া, একটি সুন্দর নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিয়মটি মনে রাখা দরকার। তিনি দেখিয়াছিলেন, বিদ্যুতের পরিমাণ যত গুণ করা যায়, তাহারি বর্গ (Square) অনুসারে তাপ বাড়ে। অর্থাৎ বিদ্যুৎকে যদি দ্বিগুণ কর, তবে তাপ হইবে চারিগুণ। সেই রকম তিন গুণ করিলে নয় গুণ, চারি গুণ করিলে ষোল গুণ, অর্দ্ধেক করিলে $\frac{১}{৪}$ ইত্যাদি। কিন্তু বাধার সঙ্গে তাপ এ-রকমে পরিবর্ত্তিত হয় না। বাধাকে দ্বিগুণ কর, তাপও দ্বিগুণ হইবে ; তিন গুণ করিলে তিন গুণ হইবে ; অর্দ্ধেক করিলে অর্দ্ধেক হইবে। কিন্তু তারের বাধা কিসে-কিসে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। তার যে-ধাতু দিয়া তৈয়ারি,

তাহার উপরে বাধা নির্ভর করে এবং স্থূলতার সঙ্গে বাধা কমে বা বাড়ে। সুতরাং এক মিনিটে বা এক সেকেণ্ডে কতটা তাপ উৎপন্ন হইল তাহার হিসাব করিতে গেলে, বিদ্যুতের পরিমাণ, তারের দৈর্ঘ্য, যে-ধাতু দিয়া তার প্রস্তুত এবং কতক্ষণ ধরিয়া বিদ্যুৎ চলিল, এই সবই জানা দরকার।

যাহা হউক, কোনো তারের ভিতর দিয়া কয়েক সেকেণ্ড বিদ্যুৎ চলিলে যে-নিয়মে তাপ জন্মে, তাহা মোটামুটি নিম্নলিখিত রকমে লেখা চলে—

$$\text{তাপ} = (\text{আম্পিয়ার})^২ \times \text{ওম্‌স} \times \text{সেকেণ্ড}$$

অর্থাৎ

$$\text{তাপের পরিমাণ} = (\text{বিদ্যুতের জোর})^২ \times \text{বাধা} \times \text{সময়}।$$

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বিদ্যুত চলিলে যে তার গরম হয়, তাহা অনেকেই জানে। তাহার জন্য আবার এত হিসাব-পত্র কেন? তোমাদের আগেই বলিয়াছি, আজকাল বাড়িতে-বাড়িতে, রাস্তায়-ঘাটে, যে বিদ্যুতের বাতি জ্বলে, তাহার আলো বিদ্যুতের তাপেই জন্মে। সুতরাং তাপ কম হইলে আলো জ্বলে না; বেশি হইলে, বাতি পুড়িয়া নষ্ট হয়। তা'ছাড়া আজকাল সহরের ঘরে-ঘরে, বড়-বড় কারখানায়, যে-বিদ্যুৎ দিয়া

তাপ উৎপন্ন করা যায়, তাহা আবশ্যক মতো না চালাইলে কাজে লাগে না। এই সব কারণে কত বিদ্যুৎ কত বাধার ভিতর দিয়া গেলে কি-পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করে, হিসাব করা দরকার হয়।

বৈদ্যুতিক দীপ

ইলেক্‌ট্রিক্‌ বাল্‌বের ভিতরে যে-সরু তার থাকে, তাহা যখন বিদ্যুতের তাপে সাদা হইয়া জ্বলে, তখনি আমরা আলো পাই, ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু কি-রকমে এই দীপ তৈয়ারি করা হয় এবং কি-রকমেই বা তাহার ভিতরকার তারে বিদ্যুৎ যায়, তাহা বলা হয় নাই। আমরা এখানে সেই সব কথা বলিব।

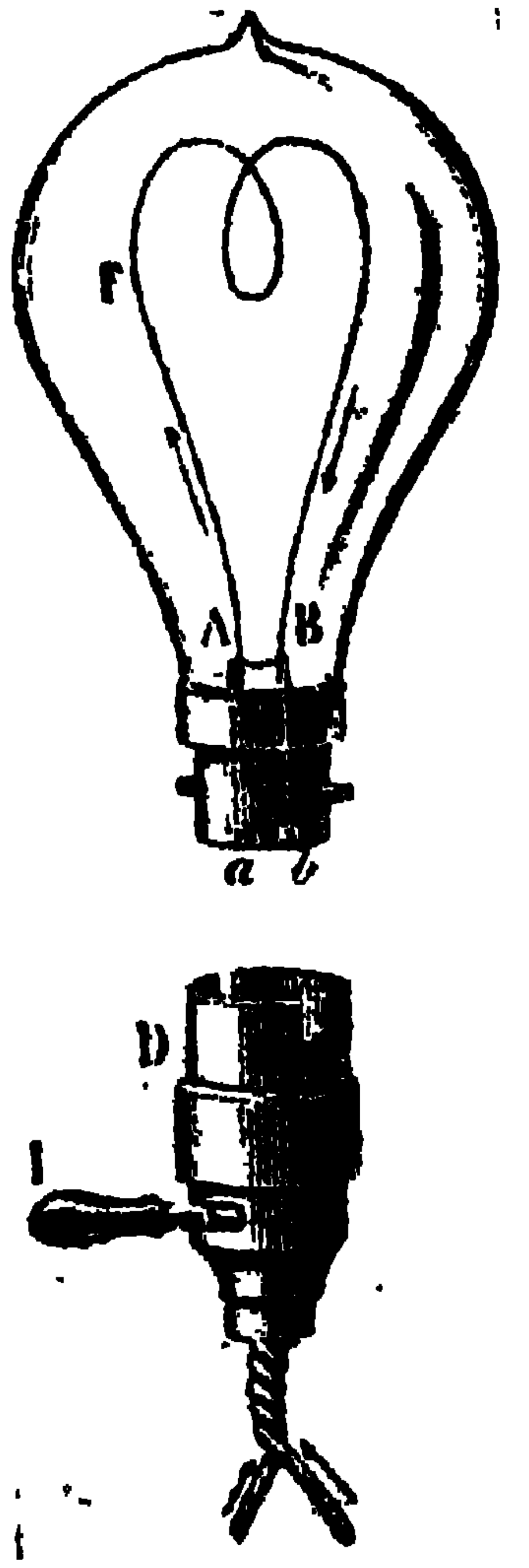

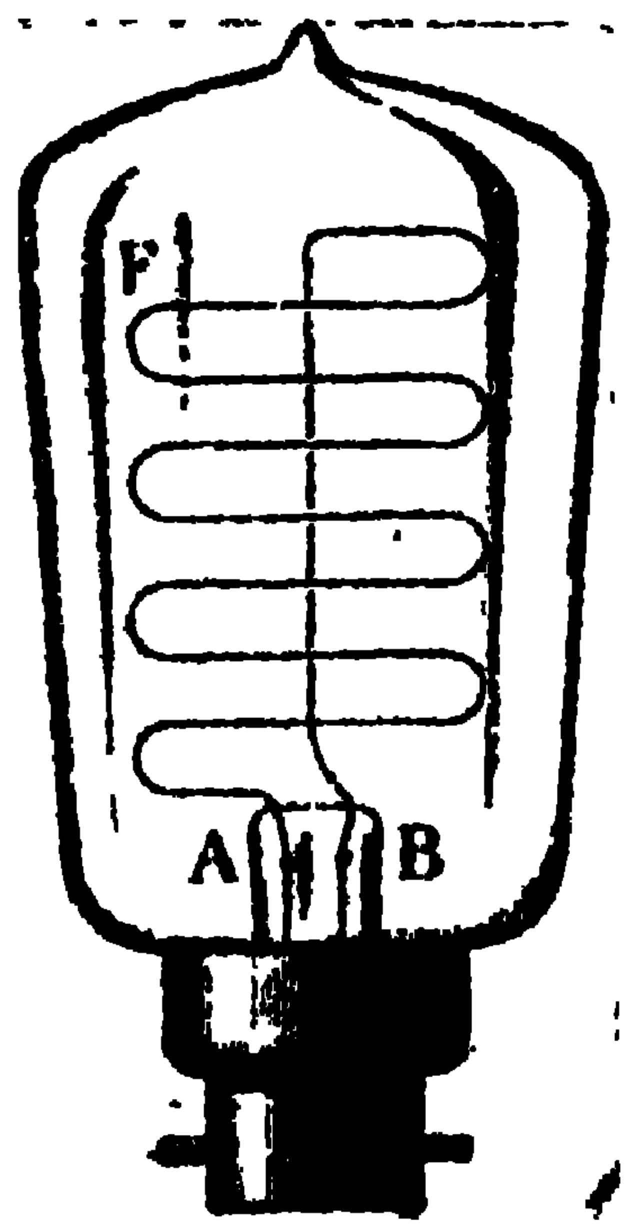

বৈদ্যুত দীপ

এখানে দুইটি বিদ্যুতের বাতির ছবি দিলাম। ছবির V-অংশ একটা কাচের গোলক অর্থাৎ বাল্‌ব্‌ (Bulb)। কোনো ধাতুর সরু তারকে পেঁচাইয়া ইহার F-অংশ তৈয়ারি করা হইয়াছে। আজকাল টংষ্টেন্‌

(Tungsten) নামে এক-রকম ধাতু দিয়া এই তার তৈয়ারি করা হয়। যে-ধাতুর বাধা অল্প এবং যাহা অল্প তাপে গলে, তাহা বাল্‌বের ভিতরে দেওয়া চলে না। লোহা ১৫৩০ ডিগ্রি এবং তামা ১০৮৩ ডিগ্রি তাপে গলে; বিদ্যুতের পথে ইহাদের বাধাও অল্প। কিন্তু টংষ্টেন্ গলে ৩৪০০ ডিগ্রিতে এবং তাহার বাধার পরিমাণও প্রচুর। তাই লোহা, তামা বা অন্য কোনো ধাতুর বদলে টংষ্টেন্ ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো বাল্‌বে ইহার পঞ্চাশ-ষাট ইঞ্চি লম্বা তারকে কুণ্ডলী পাকাইয়া রাখা হয়। টংষ্টেন্ ছাড়া কোনো কোনো বাল্‌বে ট্যাণ্টালম্ (Tantalum) নামের ধাতুর তারও ব্যবহার করা হয়। ইহাতেও টংষ্টেনের অনেক গুণ আছে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বাল্‌বের ভিতরে বাতাস আছে। কিন্তু তাহা নয়। তার জোড়া হইয়া গেলে উহার ভিতরকার সব বাতাসকে বাহির করা হয়। ইহাতে বাল্‌ব্ প্রায় সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য থাকে। ভিতরে বাতাস থাকিলে একদিনেই তার পুড়িয়া ছারখার হইত, বাতাস থাকে না বলিয়াই, এক-একটা বাল্‌ব্ ৮০০ ঘণ্টা এবং কোনো-কোনোটা ১০০০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বলে, তার পরে খারাপ হইয়া যায়।

কোনো-কোনো বাল্‌ব্‌ হইতে বাতাস বাহির করিয়া আজকাল ভিতরে খাঁটি নাইট্রোজেন্‌ পূরিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে খুব বেশি আলো পাওয়া যায়। সহরের রাস্তাঘাটে এখন এই-রকম বাল্‌ব্‌ই ব্যবহার করা হইতেছে।

ছবিতে দেখ, F-চিহ্নিত তারের দুই প্রান্ত বাল্‌বের a, b-চিহ্নিত জায়গায় শেষ হইয়াছে। D-চিহ্নিত অংশটি যে কি, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিয়াছ। বাল্‌ব্‌কে D-এর উপরে বসাইলেই, উহার নীচের যে-দুটি তার দিয়া বিদ্যুৎ চলে, তাহার সহিত a এবং b-এর যোগ হইয়া যায়। কাজেই, তখন বাল্‌বের তার দিয়া বিদ্যুৎ চলে এবং ইহাতে তার উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

D-এর I অংশটি সুইচ্‌। যখন আলোর দরকার থাকে না, তখন ইহার দ্বারা বাল্‌বের তারের a এবং b প্রান্ত সংযুক্ত থাকে। কাজেই, এই অবস্থায় বাল্‌বের তারে বিদ্যুৎ যায় না। তারপরে সুইচের হাতলটা ডাইনে ঘুরাইলে যোগ ছিন্ন হয়,—ইহাতে বাল্‌ব্‌ জ্বলিয়া উঠে। আজকাল বাল্‌বের গায়ে এরকম সুইচ্‌ রাখা হয় না; সুইচ্‌ থাকে দেওয়ালের গায়ে।

যে-দুটা মোটা তার দিয়া বিদ্যুৎ বাল্‌বে যায়, এই সুইচ্ দিয়া তাহাদিগকে ইচ্ছামত সংযুক্ত বা বিযুক্ত করা যায়।

আলো জ্বালাইবার জন্য কত ভোল্‌টের বিদ্যুৎ দরকার এবং বাল্‌বের ভিতরকার বাধা কত ওম্‌স্ রাখা প্রয়োজন, তাহা এক কথায় বলা কঠিন। যে-সব বাল্‌ব্ হইতে ষোল মোম-বাতির * আলো পাওয়া যায়, তাহাতে সাধারণতঃ এক শত ভোল্‌টের বিদ্যুৎ চালাইতে হয় এবং ভিতরকার তারের বাধা দেড় শত ওম্‌স রাখা দরকার হয়। অর্থাৎ $\frac{১০০}{১৫০}=\frac{২}{৩}$ আম্পিয়ারের বিদ্যুৎ ভিতরে না চলিলে এই বাতি ঠিক্ জ্বলে না। কিন্তু আজকাল টংষ্টেনের তার দিয়া যে-সব বাল্‌ব্ জ্বালানো হইতেছে, তাহাতে এই বিদ্যুতেই ৪৮ মোম-বাতির আলো পাওয়া যাইতেছে। বাল্‌বের ভিতরে নাইট্রোজেন্ পূরিয়া দিলে আলোর জোর আরো বেশি

---

* আমরা যে-"মোম-বাতির" কথা বলিতেছি, তাহা বাজারের সাধারণ মোম-বাতি নয়। পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ করিয়া কোনো নির্দ্দিষ্ট বাতির আলোকে, আলোর মাত্রা (Unit) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সেই বাতিকেই "মোম-বাতি" বলিতেছি। সাধারণ বাল্‌ব্ হইতে যে-আলো পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই ১৬ মোম-বাতির আলোর সমান।

হয়। ৫০০ ওয়াট্ বিদ্যুতের শক্তিতে এই রকম বাল্‌ব্ প্রায় এক হাজার মোম-বাতির আলো দেয়।

তোমাদের বাড়িতে যদি বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা থাকে, তবে একটা বাল্‌ব্ খুলিয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, তাহার গায়ে 100—60W, এই রকম অঙ্ক লেখা আছে। এই বাল্‌ব্ জ্বালাইবার জন্য কত ভোল্‌টের বিদ্যুতের দরকার হয়, তাহা প্রথম অঙ্ক হইতে জানা যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি দিয়া সেই বিদ্যুতের সামর্থ্য (power) কত ওয়াট্ তাহা লেখা থাকে। ১০০ ভোল্‌টে যে-বাল্‌ব্ জ্বলে, তাহাতে ৫০ ভোল্‌টের বিদ্যুৎ চালাইলে ভালো আলো পাওয়া যায় না। আবার তাহাতে ১৫০ বা ২০০ ভোল্‌টের বিদ্যুৎ চালাইলে তার জ্বলিয়া যায়। সুতরাং, বাল্‌বের গায়ে অঙ্ক অনর্থক লেখা থাকে না। কত প্রবাহক-বলের বিদ্যুৎ চালাইলে বাল্‌ব্ রীতিমত জ্বলিবে ঐ অঙ্ক দেখিয়া ঠিক করিতে হয়।

যাহা হউক, বিদ্যুতের মূল তারের সঙ্গে কি-রকমে শাখা তার জুড়িয়া বাল্‌ব্‌গুলিকে ঘরে-ঘরে রাখিতে হয়, এখন সেই সব কথা তোমাদিগকে বলিব। পরপৃষ্ঠায় যে-ছবি দিলাম, তাহা লক্ষ্য কর। দেখ, P চিহ্নিত

ডাইনামো বা কোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিদ্যুৎ P K B A D এই রাস্তায় ঘুরিয়া আসিতেছে। মনে করা যাউক, এই বিদ্যুতের প্রবাহক-বল যেন ১০০ ভোল্ট। এখন যদি B C এবং A D তার দিয়া মূল-তারের দুই অংশকে সমান্তরালভাবে যোগ করা যায়, তাহা হইলে এই সকল সমান্তরাল শাখা দিয়াও বিদ্যুৎ চলিবে। ছবিতে দেখ, ছয়টা শাখায় ছয়টি বাল্‌ব

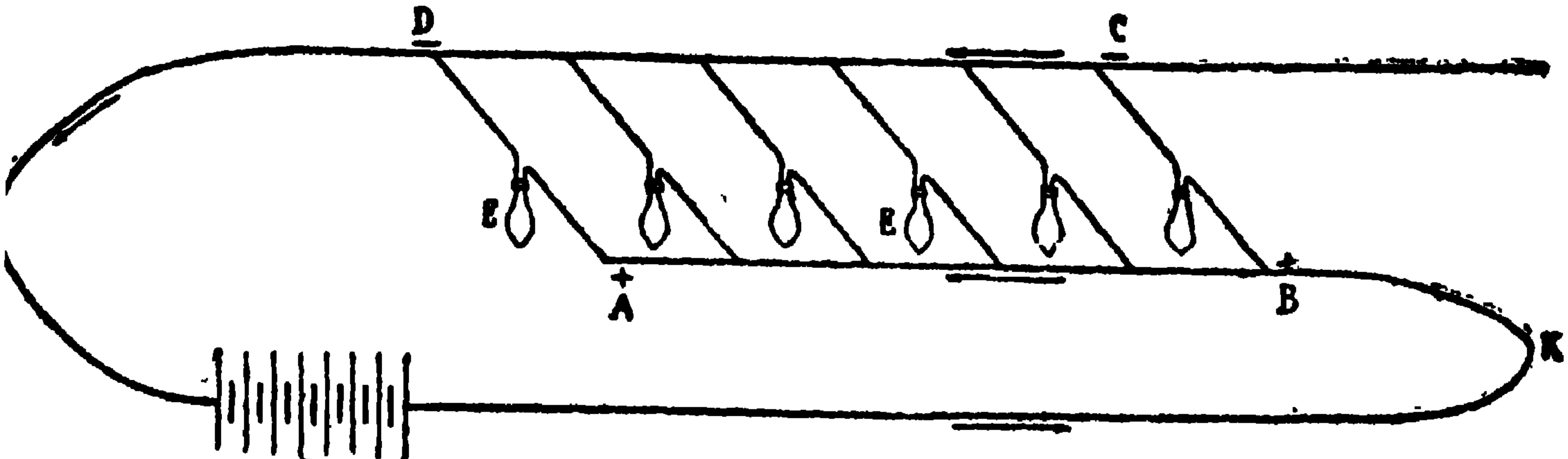

বৈদ্যুত দীপের তার লাগানো

লাগাইয়া আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই রকম সমান্তরাল-শাখায় বাল্‌ব্ লাগাইবার সুবিধা এই যে, সুইচ্ দিয়া যদি কোনো একটা বাল্‌ব্‌কে নিবাইয়া দেওয়া যায়, তাহাতে অন্য কোনো বাল্‌ব্ নিবিয়া যায় না। এই ছয়টি বাল্‌ব্‌কে মূল-তারে রাখিয়া মালাকারে সাজাইয়াও জ্বালা যায়, কিন্তু ইহাতে ইচ্ছামত কোনো বাল্‌ব্‌কে নিবাইয়া রাখা

যায় না,—নিবাইতে গেলে মূল বিদ্যুতের প্রবাহ ছিন্ন হওয়ায় সব বাল্‌ব্‌ই এক সঙ্গে নিবিয়া যায়। তাই প্রথমোক্ত প্রকারে শাখা-তারে বাল্‌ব্‌ লাগানো রীতি আছে। তোমাদের বাড়িতে যদি বিদ্যুতের আলো থাকে, তবে পরীক্ষা করিলে দেখিবে, প্রত্যেক ঘরের কার্ণিসের নীচে দুইটা করিয়া মূল-তার চলিয়া গিয়াছে। তার পরে সেই দুই তারকে যোগ করিয়া যে-শাখা-তার আছে, তাহাতেই ঘরের বাল্‌ব্‌টি লাগানো আছে। আমরা যখন সুইচ্‌ ঠেলিয়া বাতি নিবাই, তখন এই শাখা-তার দিয়া বিদ্যুৎ চলা বন্ধ হয়।

তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, এক জোড়া মূল-তারে যখন পঁচিশ-ত্রিশটা শাখা-তার লাগাইয়া ঘরে-ঘরে বাতি জ্বালানো যায়, তখন মূল বিদ্যুতের প্রবাহ কমিয়া যায় না কি? প্রবাহ নিশ্চই কমে। কিন্তু যেমনি কমে, তেমনি ডাইনামো হইতে বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া সেই ক্ষয়ের পূরণ করে। কাজেই, বিদ্যুতের পরিমাণ কমে না এবং কোনো বাতিই কম জ্বলে না। কিন্তু ডাইনামোর শক্তি যদি অল্প থাকে, তখন বেশি শাখা জুড়িলে শাখার বাতি ভালো জ্বলে না।

তোমরা আর্ক-লাইট্ (Arc-Light) দেখিয়াছ কি? যখন বেশি আলোর দরকার হয় তখন আর্ক ব্যবহার করা হয়। এখানে আর্ক-লাইটের একটা ছবি দিলাম। ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। পেন্‌সিলের মতো দুইটা গ্যাস্ কয়লার শলাকাতে, কোষ বা ডাইনামোর ধন-তার এবং ঋণ-তার লাগানো

আর্ক-লাইট্

হয়। শলাকা দুটিকে প্রথমে গায়ে-গায়ে লাগানো থাকে। কয়লা বিদ্যুতের পরিচালক, কাজেই ধন-তারের প্রান্ত হইতে বিদ্যুৎ কয়লার ভিতর দিয়া ঋণ-প্রান্তে চলিতে থাকে এবং দুই শলাকার জোড়ের মুখ সরু বলিয়া বিদ্যুৎ বাধা পাইয়া খুব তাপ উৎপন্ন করে। এই অবস্থায় শলাকা দুটিকে একটু ফাঁক করিলেই

সেই ফাঁকের ভিতরে উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলো দেখা যায়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বৈদ্যুত-যন্ত্রে যেমন স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায়, ইহাও সেই রকম স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু তাহা নয়। শলাকাব মুখে যে-তাপ জন্মে তাহা কয়লাকে বাষ্প করিয়া দেয়। তার পরে এই বাষ্পই ধন-প্রান্ত হইতে ঋণ-প্রান্তে বিদ্যুৎ বহিয়া লইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে গরম হইয়া আলো দিতে থাকে।

ছবিতে দেখ, ধন-প্রান্তের শলাকা হইতে কয়লা বাষ্প হইয়া ঋণ-শলাকার দিকে গিয়া ধন-শলাকাকে গর্ত্ত করিয়া দিয়াছে। এই-রকমে কয়লার ক্ষয় হইলে, দুই শলাকার ভিতরকার ফাঁক কয়েক মিনিটে বাড়িয়া যায়। কাজেই, তখন আর বড় ফাঁক দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে না। আর্ক-লাইটের এই দোষ দূর করার জন্য ধন-শলাকার সঙ্গে ঘড়ির কলের মতো কল লাগানো থাকে। শলাকা যেমন ক্ষয় পায়, তেমনি সেই কল ইহাকে ঋণ-শলাকার দিকে আগাইয়া দেয়। কাজেই, দুই শলাকার মাঝের ফাঁক আর বাড়িতে পারে না।

তোমরা আর্ক-লাইট্ দেখ নাই কি? বেশি আলো

পাওয়া যায় বলিয়া বড় বড় রেল-ষ্টেশনে ও কারখানায় আজকাল আর্ক-ল্যাম্প লাগানো হইতেছে। যাহাতে দুই-তিন হাজার মোম-বাতির সমান আলো পাওয়া যায়, এ-রকম আর্ক-ল্যাম্প অনেক কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শলাকার ফাঁকে বিদ্যুৎ চলিয়া যে-তাপ উৎপন্ন করে, তাহাতে ধাতু ও পাথর নিমেষে গলিয়া বাষ্প হইয়া যায়। উষ্ণতার পরিমাণ কখনো কখনো সেন্টিগ্রেডের তিন হাজার ডিগ্রিরও বেশী হয়। খাঁটি অঙ্গারের শলাকার বদলে ক্যাল্‌সিয়ম ক্লোরাইডের উপরে অঙ্গারের আবরণ দিয়া আজকাল যে আর্ক-লাইটের শলাকা তৈয়ারি করা হইতেছে, তাহাতে খুব উজ্জ্বল গোলাপী আলো পাওয়া যাইতেছে। তা' ছাড়া পারার বাষ্পকে বিদ্যুৎ সাহায্যে গরম করিয়া যে আর্ক-লাইট পাওয়া যায়, তাহা আরো উজ্জ্বল।

ইলেক্‌ট্রিক আলোতে যে Fuse ব্যবহার করা হয়, তাহা বোধ করি তোমরা দেখিয়াছ। তোমাদের বাড়িতে যদি বিদ্যুতের আলো থাকে, সুইচ্ বোর্ডে তোমরা ফিউজ দেখিতে পাইবে। সেখানে লম্বা বাক্সের মতো আবরণে ফিউজ ঢাকা থাকে। খুলিলে দেখা যায়, রাস্তার মূল তার হইতে যে-দুটা তার

বাড়িতে আসিয়াছে, তাহাদেরি মাঝে রাঙের মতো সাদা মোটা তার জোড়া রহিয়াছে। এই মোটা সাদা তারটিকেই বলা হয় ফিউজ বা বৈদ্যুতিক পলিতা। রাঙের মতো দেখাইলেও, ইহা রাঙ দিয়া তৈয়ারি নয়,—ইহা এক রকম মিশ্র ধাতু। ফিউজ কেন থাকে, বোধ করি তোমরা জানো না। মূল তার-দুটি দিয়া বেশি বিদ্যুৎ গিয়া যাহাতে বাড়ির বাল্‌ব্‌গুলিকে নষ্ট না করে, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা। তামার তারের চেয়ে ফিউজ বিদ্যুতের পথে বেশি বাধা দেয়। তাই মূল-তার দিয়া যেই বেশি বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করে, অমনি ফিউজ জ্বলিয়া নষ্ট হয়। কাজেই, তখন রাস্তার তারের সঙ্গে বাড়ির তারের সংযোগ থাকে না বলিয়া বাল্‌বে আর বিদ্যুৎ যায় না। ইহাতে সব বাল্‌ব্‌ নিবিয়া যায় বটে, কিন্তু রাস্তার তারের বেশি বিদ্যুৎ ঘরের বাল্‌বে গিয়া সেগুলিকে নষ্ট করিতে পারে না। ফিউজ পুড়িয়া গেলে বিশেষ ভাবনার কারণ থাকে না। বাক্সে নূতন ফিউজের তার লাগাইয়া দিলেই আবার সব বাল্‌ব্‌ জ্বলিয়া উঠে।

বৈদ্যুতিক চুল্লী

কাঠ বা কয়লা পোড়াইয়া যে-তাপ পাওয়া যায়, তাহার উষ্ণতা বেশি হয় না। স্পিরিট পোড়াইলে ১৭০০ ডিগ্রি, বুন্‌সেনের ল্যাম্পে ১৯০০ ডিগ্রি মাত্র উষ্ণতা পাওয়া যায়। এই উষ্ণতা পাইতে হইলে খরচ-পত্র অনেক লাগে এবং অসুবিধাও অনেক ভোগ করিতে হয়। তাই অল্প খরচে এবং বেশী হাঙ্গামা না করিয়া বেশি তাপ পাইতে গেলে, বিদ্যুতের চুল্লী ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে ৩০০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উষ্ণতা পাওয়া যায়।

পর-পৃষ্ঠায় বিদ্যুতের চুল্লীর একটা ছবি দিলাম। ছবির c, c, অংশ দুটি কয়লার শলাকা। ইহার দুই প্রান্তে কোষ বা ডাইনামোর দুই মেরু যোগ করা হয় এবং চুল্লীর ভিতরটা থাকে সিমেণ্ট বা অন্য অপরিচালক জিনিষে ভরা। তারের বিদ্যুৎ কয়লার ভিতর দিয়া চলিবার সময়ে যে-বাধা পায়, তাহাতে চুল্লী ভয়ানক গরম হইয়া উঠে। এই গরমে আজকাল নানা কাজ

করা হইতেছে। রাসায়নিক মিশ্রণে কোনো জিনিষ তৈয়ারি করিতে গেলে খুব বেশি তাপের দরকার হয়। আগে নানা হাঙ্গামায় তাপ উৎপন্ন করিয়া রাসায়নিক মিশ্রণ করা হইত। ইহাতে রাসায়নিক জিনিষের দাম বেশি ছিল। আজকাল বৈদ্যুতিক চুল্লীর তাপ দিয়া

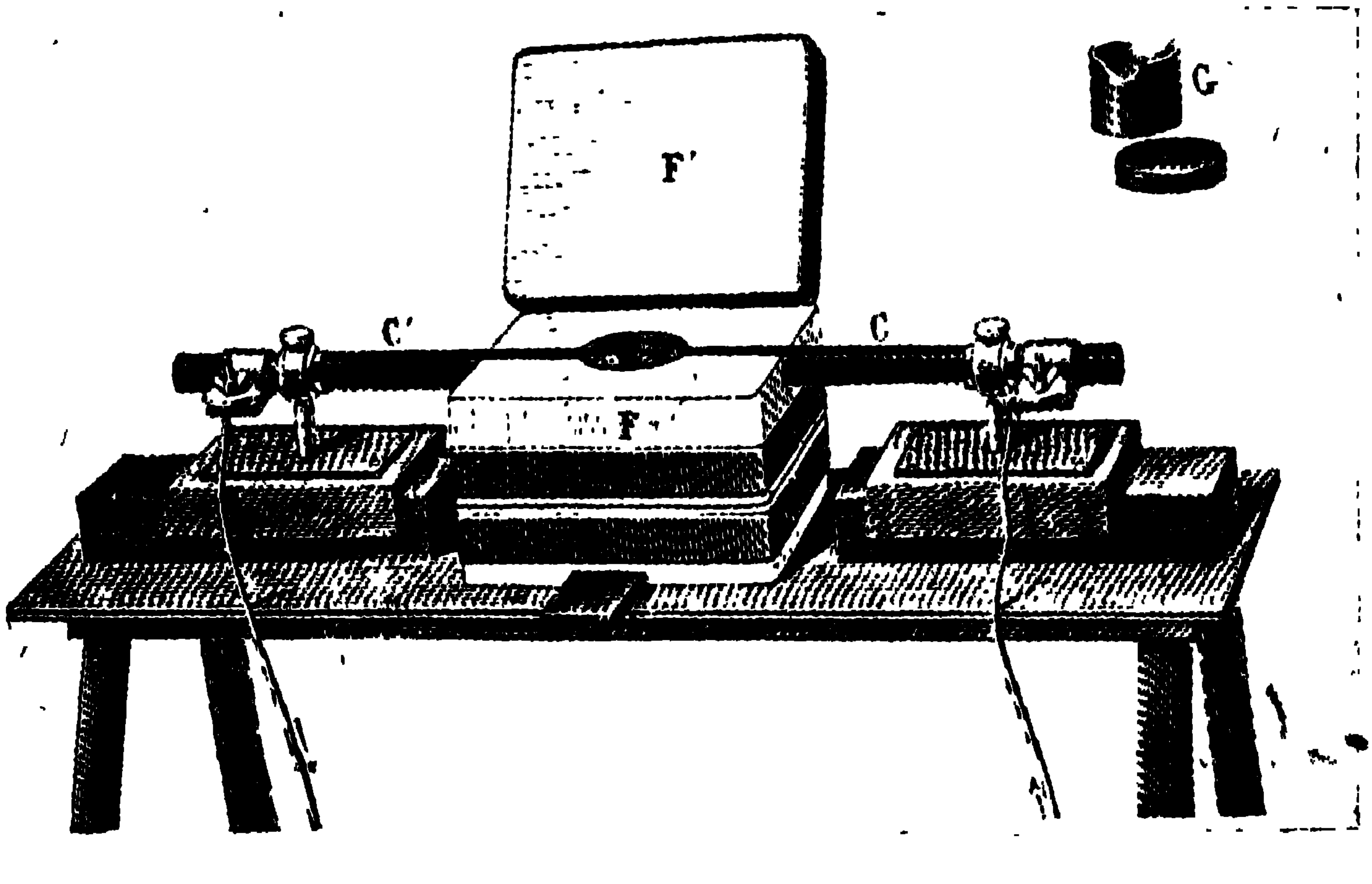

বৈদ্যুতিক চুল্লী

অতি-সস্তায় নানা রাসায়নিক জিনিষ তৈয়ারি করা হইতেছে। চূণের ঢেলার মতো যে জিনিষকে কার্বাইড্ (Carbide) বলে, তাহা বোধ করি তোমরা দেখিয়াছ। জলে ভিজাইলে ইহা হইতে অ্যাসিটিলিন (Acytilin)

গ্যাস বাহির হয়। অ্যাসিটিলিন ল্যাম্পে এই গ্যাস পোড়াইলে খুব উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়। ঐ কার্বাইড্ জিনিষটিও আজকাল অল্প খরচে বিদ্যুতের চুল্লীতে তৈয়ারি হইতেছে। সহরের কোনো কোনো বাড়িতে আজকাল বিদ্যুতের উনুনের ব্যবহার দেখিয়াছি। পাঁউরুটি টোষ্ট্ করা এবং অল্প-বিস্তর রাঁধার কাজ এই উনুনে বেশ চলে। বিদ্যুতের উনুনের ব্যবস্থাও কতকটা বৈদ্যুত চুল্লীর মতো। ইহার ভিতরে কয়লার শলাকার বদলে ধাতু-তারের সরু কুণ্ডলী (coil) থাকে। এই তার বিদ্যুতের পথে বাধা দিয়া যে-তাপ উৎপন্ন করে, তাহাতেই রান্নার কাজ চলে। ইস্তিরির ভিতরে গুলের আগুন দিয়া ধোবারা কাপড় ইস্তিরি করে। আজকাল ইস্তিরির ভিতরে তারের কুণ্ডলী রাখা হইতেছে। বিদ্যুৎ চালাইলে এই কুণ্ডলী যে-তাপ উৎপন্ন করে, তাহাতেই কাপড় ইস্তিরির কাজ চলিতেছে। এগুলি ছাড়া বিদ্যুতের তাপের আরো অনেক ব্যবহার আছে। দুই খণ্ড লোহাকে জুড়িতে গেলে কামার লোহা দু-খানিকে হাফরের আগুনে লাল করিয়া নেহাইয়ের উপরে ফেলে। তার পরে উহার উপরে ধপাধপ্ হাতুড়ির ঘা মারে। ইহাতে লোহা জুড়িয়া

যায়। মোটা মোটা লোহার কড়ি-বরগা বা রেলকে এ-রকমে জোড়া কঠিন। আজকাল বিদ্যুতে গরম করিয়া লোহা জোড়া হইতেছে। ইহাতে মজুরি কম লাগে বলিয়াই লোহার জিনিষ এত সস্তা। তোমরা যদি কখন জামসেদ্‌পুর বা অন্য কোনো জায়গার কারখানায় যাও, তবে দেখিবে, বিদ্যুতেই সেখানকার বারো আনা কাজ চালাইতেছে। বিদ্যুৎ না পাইলে এই সব কারখানার কাজ এখন এক দণ্ডও চলে না।

বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ

গিল্টির দোকানে সোনা-রূপার গিল্টি করা কত জিনিষ সাজানো থাকে। দেখিলেই মনে হয়, বুঝি জিনিষগুলা খাঁটি সোনা বা রূপা দিয়া তৈয়ারি। কিন্তু আসলে কোনোটিই সোনা বা রূপার নয়। জিনিষগুলিকে প্রথমে প্রায়ই পিতল দিয়া তৈয়ারি করিয়া, সেগুলির উপরে সোনা বা রূপার পাতলা প্রলেপ লাগানো হয়। পালিস্ করিলে তাহাই খাঁটি সোনা-রূপার মতো তক্ তক্ করে। জর্ম্মান সিল্‌ভারের কাঁটা-চামচকে ঠিক্ রূপার মতোই বোধ হয়। ইহাতেও রূপার প্রলেপ থাকে। কিছুদিন ব্যবহার করিলে যখন প্রলেপ উঠিয়া যায়, তখন ভিতরকার জর্ম্মান্ সিল্‌ভার বাহির হইয়া পড়ে। লোহার ছাতার বাঁট, চাবি, কৌটা প্রভৃতি বিলাতি জিনিষ নূতন বেলায় কেমন ঝক্‌ঝকে থাকে, তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই সব জিনিষের উপরে নিকেলের (Nickel) প্রলেপ থাকে। তোমরা বোধ করি মনে কর, সোনা-রূপা গলাইয়া তাহাতে পিতলের জিনিষ ডুবাইলেই গিল্টি হইয়া যায়।

কিন্তু তাহা নয়,—গিল্টির কাজ বিদ্যুৎ দিয়া করা হইয়া থাকে। কেবল সোনা-রূপা বা নিকেল্ নয়, বিদ্যুতের সাহায্যে লোহা বা অন্য ধাতুর গায়ে তামাও লাগানো হইতেছে।

কোষের সল্‌ফিউরিক এসিডের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিলে যে এসিডের বিশ্লেষণ হয়, তোমরা তাহা আগেই দেখিয়াছ। বিদ্যুতের এই বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যেই গিল্টির কাজ চলে। এখানে একটি ছবি

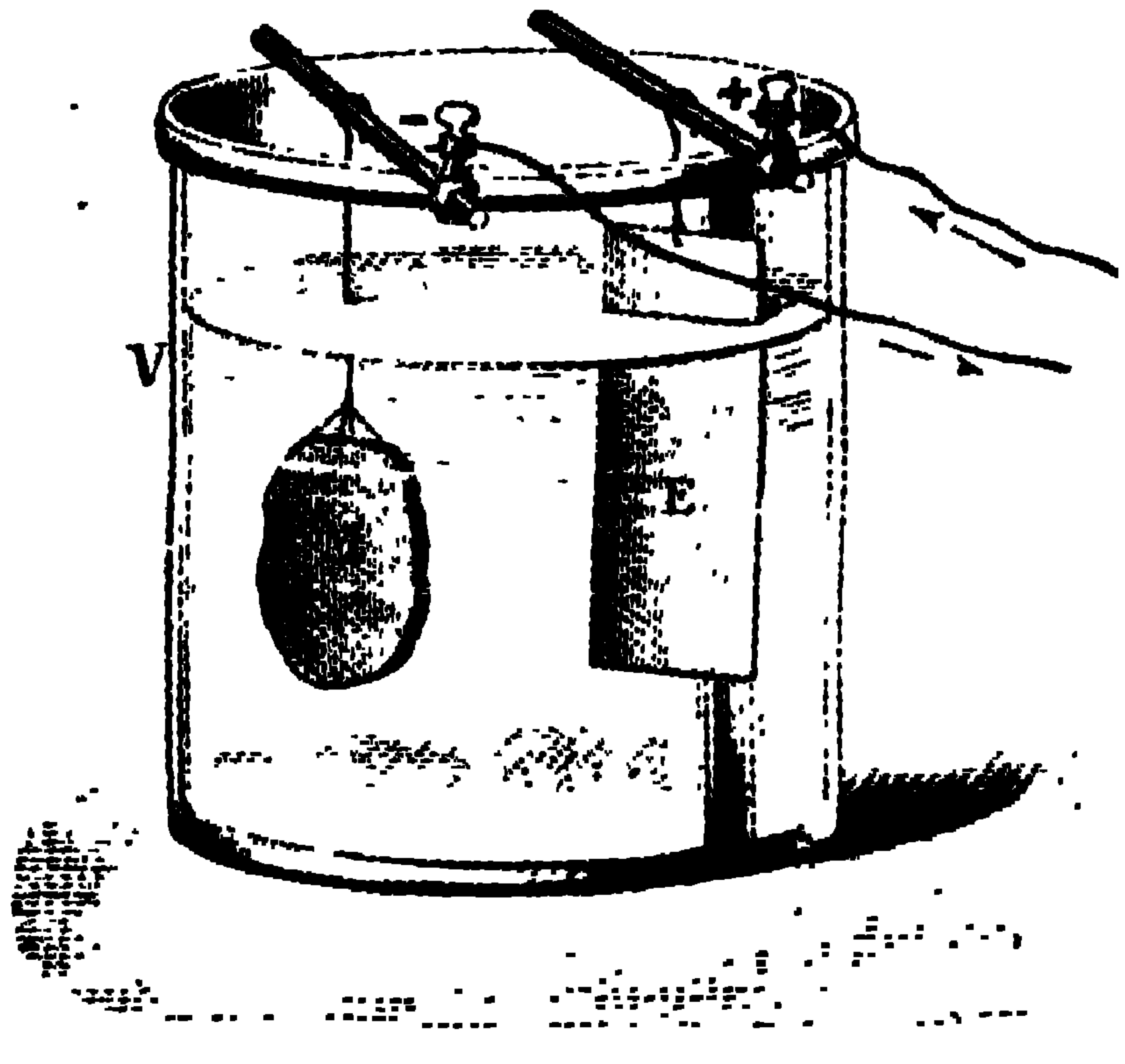

বৈদ্যুত বিশ্লেষণ

দিলাম। ছবিতে যে-কাচের পাত্র রহিয়াছে, তাহাতে তুঁতের জলের সঙ্গে সামান্য সল্‌ফিউরিক্ এসিড্

মিশাইয়া রাখা হইয়াছে। M জিনিষটা পিতল লোহা বা অন্য কোনো ধাতুর ফলক এবং E একটি তামার ফলক। ছবিতে দেখ, তামার ফলকে ব্যাটারির ধন-মেরু ও অন্য ফলকে ঋণ-মেরু যোগ করা আছে। সুতরাং তুঁতের জলের ভিতর দিয়া E হইতে M-এর দিকে বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করিবে এবং তুঁতেতে যে-তামা মিশানো আছে, তাহা পৃথক হইয়া M-এর গায়ে জমা হইবে। E-চিহ্নিত তামার ফলক দিয়া দুইটি কাজ হয়। প্রথমতঃ, ইহা বাহিরের তারের বিদ্যুৎকে ভিতরে আনে। তার পরে জলে-মিশানো তুঁতে হইতে তামা M-এর গায়ে চলিয়া গেলে, ফলকের তামাই এসিডের যোগে তুঁতে হইয়া জলে মিশে। ইহাতে পাত্রের জলে তুঁতের পরিমাণ সমান থাকিয়া যায়।

তাহা হইলে দেখ, কোনো ধাতুতে তামার প্রলেপ লাগানো কত সহজ। এই রকমে কেবল যে, তামাই লাগানো যায় তাহা নয়; কোনো ধাতব জিনিষে সোনা রূপা নিকেল প্রভৃতি ধাতুর প্রলেপও ঠিক এই রকমে লাগানো চলে। নিকেলের প্রলেপ দিতে গেলে তুঁতের বদলে জলে নিকেল্-সল্ফেট্ (Nickel Sulphate) মিশাইতে হয় এবং তামার জায়গায়

নিকেলের ফলক ঝুলাইতে হয়। সেই রকম সোনা বা রূপা লাগাইতে গেলে সোনা ও রূপা ঘটিত জিনিষ জলে মিশাইয়া রাখিতে হয়।

পূর্ব্বের ছবির মতো পাত্র সাজাইয়া তোমরা কোনো ধাতুর গায়ে অনায়াসে তামা লাগাইতে পারিবে। মনে রাখিয়ো যে-জিনিষে তামা লাগাইতে যাইতেছ, সেটিকে ব্যাটারির তারের ঋণ-প্রান্তে যুক্ত রাখা দরকার। ঐ জিনিষকে খুব ঘষিয়া-মাজিয়া তক্‌তকে রাখাও আবশ্যক। ইহা করিলে ধাতুর প্রলেপ জিনিষটির গায়ে ভালো করিয়া লাগে। বিদ্যুতের জন্য বিশেষ আয়োজন দরকার হয় না। যে-কোনো কোষের বিদ্যুতেই কাজ চলিয়া যায়।

বিদ্যুৎ দিয়া যে, কেবল ধাতু-ঘটিত জিনিষকেই বিশ্লেষ করা যায়, তাহা নয়। পরপৃষ্ঠার ছবিটি দেখ। এই ছবির মতো যন্ত্র দিয়া তোমরা জলকেও বিশ্লেষ করিতে পারিবে। তোমরা বোধ করি জানো, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন্ নামক দুইটা বায়ব জিনিষ মিলিয়া জলের উৎপত্তি করে। জলের এক-একটা অণুতে দুইটা হাইড্রোজেনের এবং একটা অক্সিজেনের পরমাণু থাকে। তাই জলের অণুকে বিশ্লেষ করিলে সেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাইবার কথা। পরপৃষ্ঠার ছবির মতো কাচের

পাত্রে খানিকটা জল রাখা হইয়াছে এবং জলটা যাহাতে বিদ্যুতের ভালো পরিচালক হয়, তাহার জন্য উহাতে খানিকটা সল্‌ফিউরিক্ এসিড মিশানো আছে। তার পরে দেখ, কোষের দুই প্রান্তের দু'টা তার জলের মধ্যে গিয়া ঠেকিয়াছে। প্লাটিনাম্ বিদ্যুতের ভালো

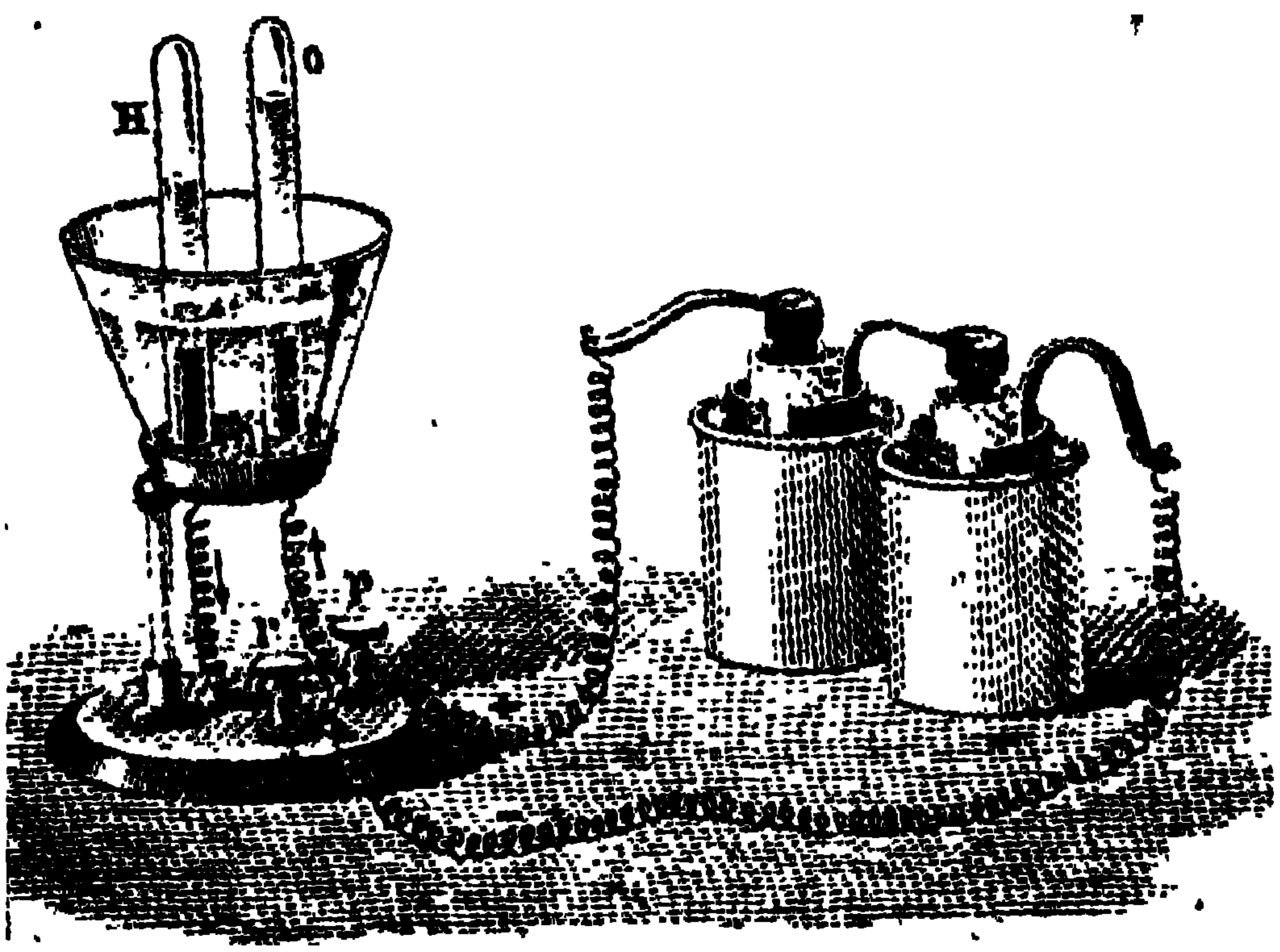

জলের বিশ্লেষণ

পরিচালক। তাই, জলের ভিতরকার তারের দুই প্রান্তে দু'টা প্লাটিনমের তার জোড়া আছে। এই অবস্থায় কোষের বিদ্যুৎ যেমনি জলের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করে, অমনি তারের ঋণ-প্রান্ত হইতে হাইড্রোজেন্ এবং ধন-প্রান্ত হইতে অক্সিজেন্

গ্যাস্ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। দেখ, প্লাটিনমের পাতার উপরে জলে-ভরা দুইটা টেষ্ট্-টিউব উপুড় করিয়া রাখিয়া সেই অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্‌কে সংগ্রহ করা হইতেছে। জলের অণুতে হাইড্রোজেনের পরমাণুই বেশি থাকে। তাই H চিহ্নিত টেষ্ট-টিউবের হাইড্রোজেনের পরিমাণ, অন্য টিউবের অক্সিজেনের চেয়ে বেশি হইয়াছে।

ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে প্রায় সত্তর বৎসর আগে বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি দেখিয়াছিলেন, বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ এলোমেলো ভাবে হয় না। ইহাতে ঋণ-ফলকে যতটা ধাতু জমে, তাহা বিদ্যুতের পরিমাণ অনুসারে কমে-বাড়ে। অর্থাৎ আম্পিয়ার যত বাড়ে, বিশ্লেষণও তত জোরে চলে। এইজন্য সূক্ষ্মভাবে বিদ্যুতের পরিমাণ মাপিতে গেলে, সেই বিদ্যুতের প্রবাহে এক সেকেণ্ডে কতটা ধাতু জমিল, তাহা ওজন করিয়া দেখা হয়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বিদ্যুতের পরিমাণ সমান থাকিলে সব ধাতুই সমান পরিমাণে জমে। কিন্তু তাহা নয়। প্রত্যেক ধাতুই নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক-একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে

ঋণ-ফলকে জমা হয়। কখনই ইহার কম-বেশি হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক আম্পিয়ার বিদ্যুতে এক সেকেণ্ডে রূপা জমে '০০১১১৮ গ্রাম্ এবং তামা জমে '০০০৩২৯ গ্রাম্ ; আবার আলুমিনিয়ম্ জমে '০০০০৯৩৬ গ্রাম্। দেখ, কত তফাৎ। বৈদ্যুত-বিশ্লেষণে এক ঘণ্টায় কোনো ধাতু এক আম্পিয়ার বিদ্যুৎ দ্বারা যতটা জমে, তাহাকে বলা হয় সেই ধাতুর Electro-Chemical equivalent.

বিদ্যুতের এই বিশ্লেষণ শক্তিকে কেবল গিল্‌টি করার কাজেই ব্যবহার করা হয় না। তোমরা বোধ হয় জানো, খনি হইতে ধাতুগুলিকে যখন খুঁড়িয়া বাহির করা যায়, তখন তাহাতে অনেক বাজে জিনিষ মিশানো থাকে। বিদ্যুতের সাহায্যে বিশ্লেষ করিয়া আজকাল অতি-সহজে খাঁটি ধাতু পাওয়া যাইতেছে। বেশি দিন নয়, পনেরো বৎসর আগেও খাঁটি আলুমিনিয়ম ধাতু সহজে পাওয়া যাইত না। যাহা পাওয়া যাইত, তাহার দাম ছিল ভয়ানক বেশি। বিদ্যুতের সাহায্যে আজকাল গাদা গাদা আলুমিনিয়ম্ তৈয়ারি হইতেছে। ইহাতেই এখন আলুমিনিয়মের ঘটি-বাটি এত সস্তা। ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ ধাতু তোমরা

সকলেই দেখিয়াছ। এই ধাতুর ফিতা বা তার দু'চার পয়সায় বাজারে অনেকটা কিনিতে পাওয়া যায়। আগুনে ধরিলে ইহা বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল আলো দিয়া পুড়িতে থাকে। আমরা যখন ছোটো ছিলাম, তখন খাঁটি ম্যাগ্‌নেসিয়ম্‌ ধাতু চোখে দেখি নাই। বিদ্যুতের সাহায্যে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া ম্যাগ্‌নেসিয়ম্‌ এখন এমন সস্তা হইয়াছে। খাঁটি তামার আদর যে আজকাল কত, তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ। অল্প দামের ধাতুর মধ্যে তামাই বিদ্যুতের ভালো পরিচালক। তাই সমস্ত পৃথিবীকে ছাইয়া যে-বিদ্যুতের তার আছে, তাহার সকলি তামা দিয়া তৈয়ারি। ভেজাল তামার চেয়ে খাঁটি তামাই বিদ্যুৎকে ভালো চালায়। আগে যে-তামা পাওয়া যাইত, তাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগ বাজে ধাতু মিশানো থাকিত। কাজেই, এই তামার তার দিয়া বিদ্যুৎ ভালো চলিত না। এখন বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণে যে খাঁটি তামা পাওয়া যাইতেছে, তাহাই টেলিগ্রাফ্‌ ও টেলিফোনের কাজে ব্যবহার করা হইতেছে। আজকাল অনেক দেশেই বিদ্যুতের সাহায্যে খাঁটি তামা তৈয়ারি করার কারখানা বসিয়াছে এবং বৎসরে লক্ষ লক্ষ মণ তামা তৈয়ারি হইতেছে।

সঞ্চয়ক কোষ

ঘড়িতে দম দিবার সময়ে আমাদের হাতের শক্তি স্প্রিঙে জমা থাকে। তার পরে সেই শক্তিই একটু একটু করিয়া ঘড়ির চাকায় লাগিয়া কাঁটাকে ঘোরায়। তাই স্প্রিঙের সঞ্চিত শক্তি ফুরাইয়া গেলে ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায়। তখন আবার দম না দিলে ঘড়ি চলে না। রাসায়নিক শক্তিই যে, কোষের মধ্যে বিদ্যুৎ হইয়া দেখা দেয়, ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। তাই ঘড়ির স্প্রিঙে যেমন শক্তিকে সঞ্চিত রাখা যায়, তেমনি রাসায়নিক শক্তিকে কাজের উপযোগী করিয়া যদি কোনো উপায়ে জমা রাখা যায় তবে ইচ্ছামতো যখন-তখন, সেই শক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল সঞ্চয়ক কোষে ঠিক্ ঐ উপায়েই রাসায়নিক শক্তি জমা রাখিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতেছেন। আমরা যাহাকে সঞ্চয়ক কোষ বলিতেছি, তাহার ইংরাজি নাম Accumulator

বা Storage Battery। তোমরা এই কোষ দেখ নাই কি? মোটর গাড়ির সাম্‌নে যে আলো থাকে, তাহা সঞ্চয়ক-কোষের বিদ্যুতেই চলে। তা-ছাড়া ইলেক্‌ট্রিক্ বোট এবং মোটর ট্রাম প্রভৃতিতেও ইহার ব্যবহার আছে। পাড়া-গাঁয়ে বিদ্যুৎ পাওয়া মুস্কিল। আট-দশটা সঞ্চয়ক-কোষ থাকিলে ইচ্ছামতো দুই একটি আলো বা পাখা চালানোর সুবিধা হয়।

এখানে সঞ্চয়ক-কোষের একটা ছবি দিলাম। ছবিতে যে-কয়েকটি ফলক দেখা যাইতেছে, তাহা সীসা-ঘটিত একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া তৈয়ারি এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতে জাফ্রির মতো খোপ কাটা আছে। খোপগুলি কি-রকম তাহা পরের ছবিখানি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। সীসা-ঘটিত লেড্ অক্সাইড্ (Lead oxide) নামক জিনিষের সঙ্গে খানিকটা সল্‌ফিউরিক্ এসিড্

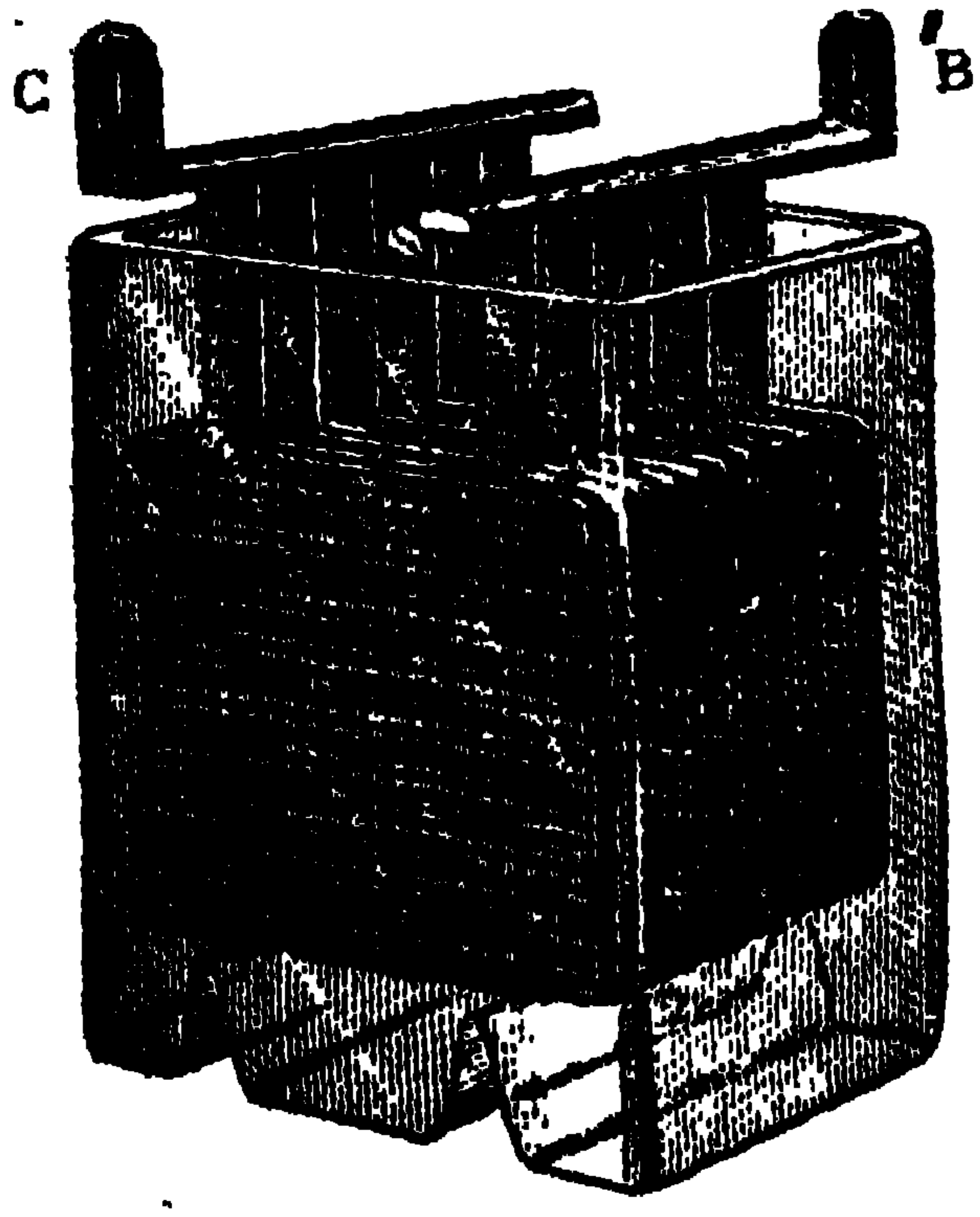

সঞ্চয়ক কোষ

মিশাইলে যে কাদার মতো একটা দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা দিয়াই ঐ খোপগুলিকে বুজানো হইয়াছে। দেখ, ছবিতে সেই রকমেরই এগারোখানি ফলক রহিয়াছে এবং সল্‌ফিউরিক্ এসিড্-মিশ্রিত জলে সে-গুলিকে ডুবানো আছে। ফলকগুলিকে কি-রকমে জোড়া হইয়াছে, তাহা ছবিতেই তোমরা দেখিতে পাইবে। প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, নবম এবং একাদশ ফলক পিতল বা তামার মোটা পাতে জুড়িয়া কোষের C প্রান্তটিকে পাওয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি বাকি ফলকগুলিকে জুড়িয়া B প্রান্তটি হইয়াছে। এ-রকম যন্ত্রকেই সঞ্চয়ক-কোষ বলা হয়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এখন B এবং C প্রান্তকে তার দিয়া যোগ করিলেই বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই রকমে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। যখন কোনো কোষের দুই ফলক একই জিনিষ দিয়া তৈয়ারি থাকে, তখন তাহাতে কোনোক্রমে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। এখন ঐ কোষের B এবং C প্রান্তকে কোনো ডাইনামোর দুই তারের সঙ্গে যোগ করিয়া দাও। এই অবস্থায় ফলকের এবং এসিড-মিশানো জলের ভিতর দিয়া ডাইনামোর বিদ্যুৎ চলিতে

আরম্ভ করিলেই, ফলকগুলিতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহাতে লেড্-অক্সাইডের যে ফলকগুলিতে বিদ্যুৎ প্রবেশ করে, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কালো লেড্-পার-অক্সাইড্ (Lead Per-oxide) হইয়া দাঁড়ায় এবং অন্য ফলকগুলির লেড্ অক্সাইড্ অক্সিজেন

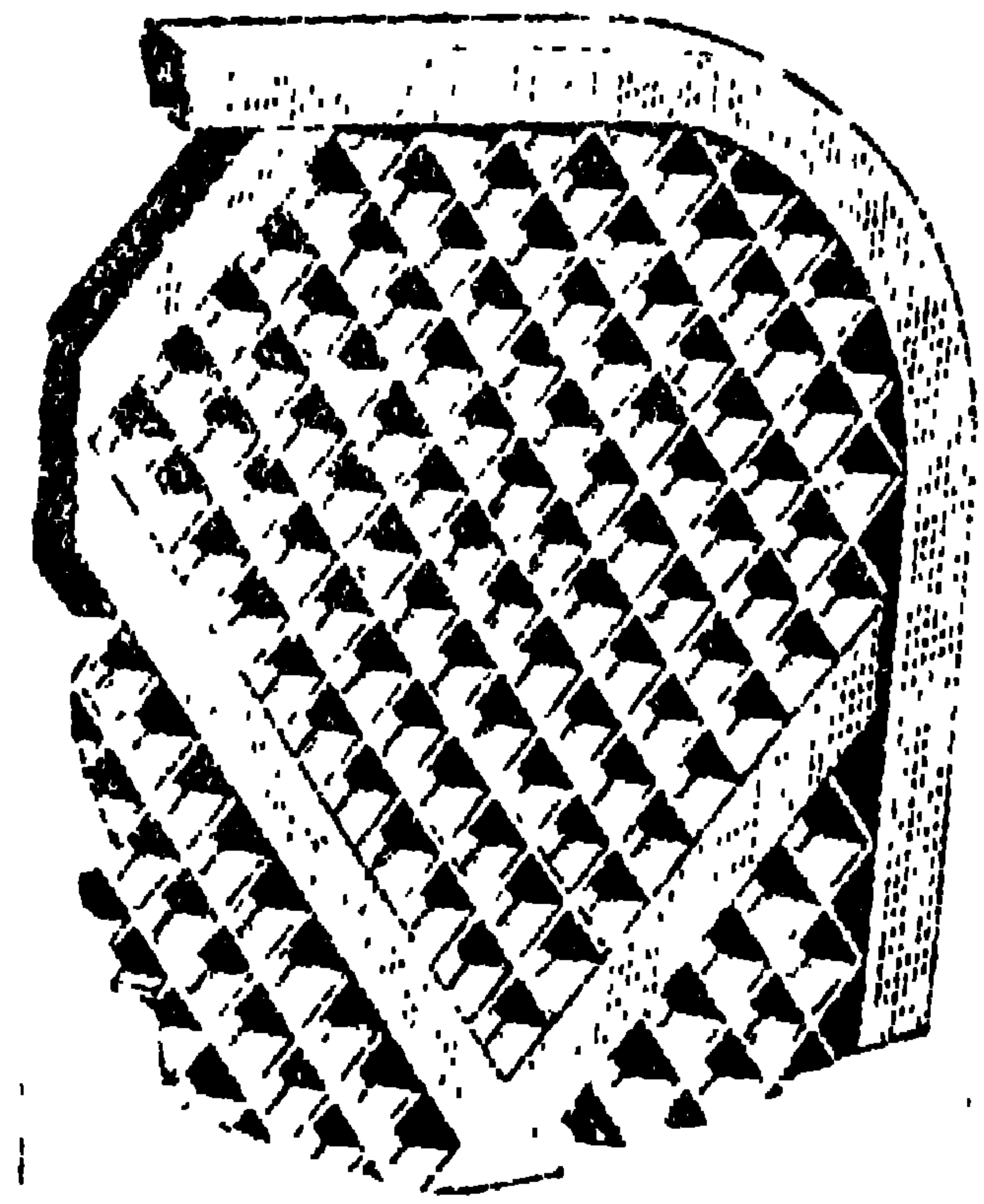

সঞ্চয়ক-কোষের ফলক

ত্যাগ করিয়া খাঁটি সীসা হইয়া পড়ে। কাজেই, বিদ্যুৎ-চালানোর পরে B এবং C-এর ফলকগুলি যাহা আগে কেবল লেড্-অক্সাইড্ দিয়া প্রস্তুত ছিল, তাহাদের মধ্যে B-এর ফলকগুলির রাসায়নিক অবস্থা C-এর ফলকগুলির অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ B-এর ফলকগুলি হইয়া দাঁড়ায় সীসার পার্-অক্সাইড্ এবং C-এর ফলকগুলি হইয়া পড়ে খাঁটি সীসা। ডাইনামোর বিদ্যুৎ দিয়া এই-রকমে সঞ্চয়ক-কোষের ফলকগুলির রাসায়নিক পরিবর্ত্তন করাকে বলা হয়,

কোষ চার্জ (Charge) করা। চার্জ করা হইলে, যেই কোষের B এবং C প্রান্তকে যোগ করা যায়, অমনি B হইতে C-এর দিকে জোরালো বিদ্যুৎ চলিতে থাকে। মনে রাখিয়ো, চার্জ করার সময়ে ডাইনামোর বিদ্যুৎ যে-দিক ধরিয়া কোষে প্রবেশ করিয়াছিল, কোষের বিদ্যুতের প্রবাহ তাহারি ঠিক উল্টা মুখে পাওয়া যায়। অর্থাৎ চার্জের সময়ে ডাইনামোর বিদ্যুৎ যদি C হইতে B-এর দিকে চলিয়া থাকে, তবে চার্জের পরে কোষের বিদ্যুৎ B হইতে C-এর দিকে চলিতে থাকিবে।

তাহা হইলে দেখ, ডাইনামোর বিদ্যুৎ রাসায়নিক কার্য্য করিয়া ফলকগুলিতে যে-শক্তি সঞ্চিত রাখে, তাহাই বিদ্যুতের আকারে কোষ হইতে বাহির হয়। আমাদের হাতের শক্তি যেমন স্প্রিংএ সঞ্চিত থাকিয়া ঘড়ির কাঁটাকে নড়ায়, এই কোষের বিদ্যুৎ সেই-রকমেই উৎপন্ন হয় না কি? সুতরাং এই যন্ত্রকে বিদ্যুৎ-সঞ্চয়ক কোষ না বলিয়া, শক্তি-সঞ্চয়ক কোষ বলিলেই বোধ করি ভালো হইত। সাধারণ সঞ্চয়ক-কোষকে চার্জ করার পরে আশী-নব্বুই ঘণ্টা চালাইলেই তাহার সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি ক্ষয় পাইয়া যায়। অর্থাৎ তখন উহার দুই ফলক ঠিক আগের মতো লেড-অক্সাইডে

পরিণত হয়। তাই আবার ডাইনামো দিয়া চার্জ না করিলে উহা হইতে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। এই রকমে বার-বার চার্জ করিয়া একই কোষ হইতে বহুকাল বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

কেবল মোটর গাড়িতেই যে বিদ্যুৎ-কোষের ব্যবহার আছে তাহা নয়। মনে কর, কোনো সহরের ডাইনামো হঠাৎ বিগ্‌ড়াইয়া গেল। তখন কি অবস্থা হয় ভাবিয়া দেখ। পথ-ঘাট দোকান-পাট সবই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। কোনো কাজই চলে না। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানি অনেক সঞ্চয়ক-কোষ চার্জ করিয়া রাখেন। কল বন্ধ হইয়া গেলে সঞ্চয়ক-কোষের বিদ্যুৎ সহরে আলো জোগাইতে থাকে। তার পরে দেখ, হঠাৎ কোনো কারণে যদি সহরে বেশি বিদ্যুতের দরকার হয়, কেবল ডাইনামোর দ্বারা তাহা জোগানো যায় না। ডাইনামোর শক্তি সীমাবদ্ধ, তাহা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেশি বিদ্যুৎ জোগাইতে পারে না। এই রকম প্রয়োজনের সময়ে সঞ্চয়ক-কোষই বিদ্যুৎ জোগায়।

বিদ্যুৎ-প্রবাহ ও চুম্বকত্ব

বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে চুম্বক-শক্তির যে খুব নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহার একটু পরিচয় তোমরা আগেই পাইয়াছ। তারের বেষ্টনীর ভিতরে ইস্পাত রাখিয়া আমরা সেই তার দিয়া বিদ্যুৎ চালাইয়াছিলাম। ইহাতে ইস্পাত চুম্বক হইয়া গিয়াছিল। * বিদ্যুতের এবং চুম্বকের শক্তি যে একবারে পৃথক্ নয়, এই পরীক্ষায় তাহা অনুমান করা যায়। আমরা এখন চুম্বক-শক্তি এবং বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা তোমাদিগকে বলিব। তোমরা টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন্, ডাইনামো, ইলেক্ট্রিক মোটর প্রভৃতি যে-সব যন্ত্র দেখিতে পাও, তাহাদের কাজ বিদ্যুতের চুম্বক শক্তির দ্বারাই চলে। সুতরাং, এই বিষয়টা ভালো করিয়া জানিয়া রাখা দবকার।

পরপৃষ্ঠায় যে-ছবিটি দিলাম, তাহা ভালো করিয়া লক্ষ্য কর। ছবিতে দেখ, একটা কম্পাস্ তাহার

---

* গ্রন্থকারের "চুম্বক" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

চুম্বক-কাঁটার এক প্রান্ত উত্তরে এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণে রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তার পরে A B চিহ্নিত যে-তারের ভিতর দিয়া B হইতে A-এর দিকে বিদ্যুৎ যাইতেছিল, সেটিকে সমান্তরাল ভাবে ঠিক কাঁটার উপরে রাখা হইয়াছিল। দেখ, ইহাতে কাঁটার অবস্থা কি হইয়াছে। তাহা এখন আর উত্তর-দক্ষিণে

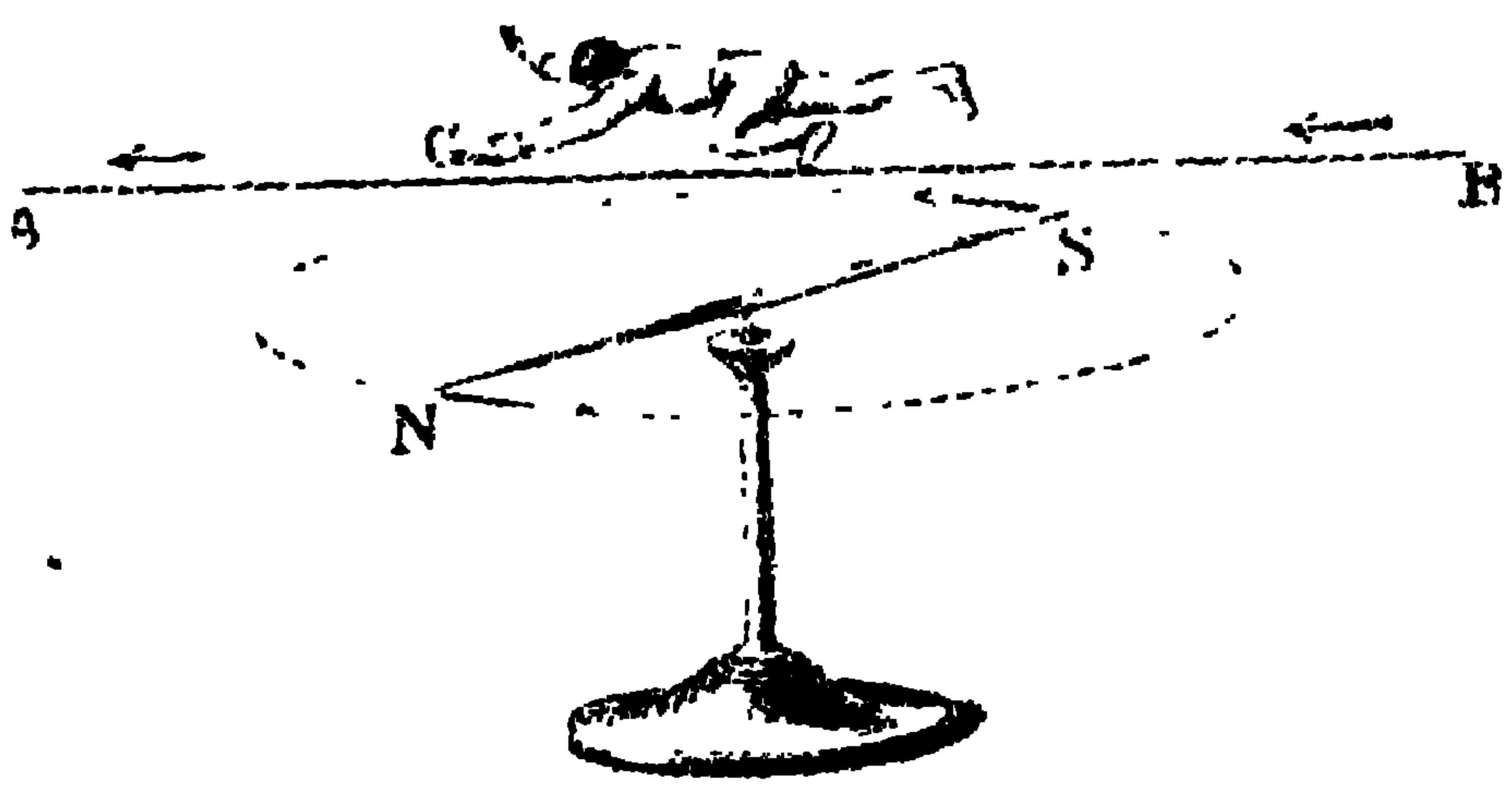

বিদ্যুৎ-প্রবাহে চুম্বকের কাঁটা

লম্বা হইয়া নাই। উহার উত্তর-মেরুটা পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-মেরু পূর্ব্বে ছিট্‌কাইয়া গিয়াছে। তারটিকে চুম্বক-কাঁটার নীচে রাখো। এখানেও উত্তর-মেরু পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-মেরু পূর্ব্বে ছিট্‌কাইবে। কাছের তার দিয়া বিদ্যুৎ চলার সময়ে চুম্বকের কাঁটাকে এই রকমে বিচলিত করা, বিদ্যুতের একটা বিশেষ গুণ।

তার দিয়া B হইতে A-এর দিকে বিদ্যুৎ চলিতেছিল। এবারে A হইতে B-এর দিকে বিদ্যুৎ চালাও। দেখিবে N-চিহ্নিত উত্তর-মেরু এখন পশ্চিমে না গিয়া পূর্ব্বে যাইতেছে এবং দক্ষিণ-মেরুই পশ্চিমে যাইতেছে। শুক্‌না কোষের তার দিয়া বিদ্যুৎ চালাইয়া এই পরীক্ষাটি সহজে দেখানো যায়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বিদ্যুতের শক্তিতে চুম্বকের কাঁটা এলোমেলোভাবে বিচলিত হয় না। বিদ্যুতের প্রবাহ যখন কাঁটার উপরে থাকিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে যায়, তখন কাঁটার উত্তর-মেরু পশ্চিমে হেলে, তার পরে সেই প্রবাহ যখন উত্তর হইতে দক্ষিণে চলে, তখন কাঁটার উত্তর-মেরু ছিট্‌কাইয়া পূর্ব্বে যাইতে চায়। তোমরা একটা কম্পাস্ কিনিয়া টর্চ-লাইটের শুক্‌না কোষের বিদ্যুৎ ঐ-রকমে চালাইয়া পরীক্ষাগুলি করিয়ো।

কিন্তু কোন্ দিকে বিদ্যুৎ চলিলে কম্পাসের উত্তর-মেরু কোন্ দিকে হেলিয়া যায়, ইহা সহজে মনে থাকে না। তাই এখানে একটা সহজ সঙ্কেতের কথা বলিতেছি। ইহা মনে রাখিলে বিদ্যুতের শক্তিতে চুম্বকের কাঁটা কোন্ দিকে হেলিবে, তোমরা তাহা

চট্ করিয়া বলিতে পারিবে। নদীর স্রোতের সঙ্গে আমরা যেমন ভাসিয়া চলি, মনে কর, ঠিক্ সেই-রকমে একটা মানুষ যেন বিদ্যুতের প্রবাহের সঙ্গে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে এবং তাহার মুখখানি আছে যেন কাঁটার দিকে। এই অবস্থায় লোকটার বাঁ হাত যে-দিকে থাকে, চুম্বকের উত্তর-মেরু ঠিক্ সেই দিকেই হেলিয়া যায়। ছবিতে ঠিক সেই-রকমের একটি মানুষ আঁকা আছে। প্রায় এক শত বৎসর আগে আম্পিয়ার সাহেব এই নিয়মটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহাকে আজো আম্পিয়ারের নিয়ম বলা হয়। আম্পিয়ারের নিয়ম যে সত্য, আগেকার ছবিটি দেখিলেই বুঝা যাইবে। দেখ, ছবিতে তারের B-প্রান্ত হইতে A-এর দিকে যে-বিদ্যুৎ চলিতেছে, তাহারি সঙ্গে একটা মানুষ চুম্বকের দিকে মুখ রাখিয়া সাঁতরাইয়া চলিয়াছে। মানুষটার বাঁ হাত আছে G-চিহ্নিত জায়গায়। কাজেই, আম্পিয়ারের নিয়ম অনুসারে চুম্বকের উত্তর-মেরু পশ্চিমে হেলিয়া যাইবে।

পরপৃষ্ঠায় যে-ছবিখানি দিলাম, তাহা লক্ষ্য কর। দেখ, তারের বেষ্টনীর মধ্যে একটি চুম্বক-শলাকা রহিয়াছে। যে-দিক্ ধরিয়া তারের ভিতরে বিদ্যুৎ

চলিতেছে, মানুষটা চুম্বকের দিকে মুখ রাখিয়া ঠিক্ সেই দিকেই সাঁতরাইয়া চলিয়াছে। লোকটার বাঁ হাত যে-দিকে থাকে, কাঁটার উত্তর-মেরু ঠিক্ সেই দিকে হেলিয়া যায়,—ইহাই আম্পিয়ারের নিয়ম। এখন ছবি সম্মুখে রাখিয়া হিসাব করিয়া দেখ, লোকটা

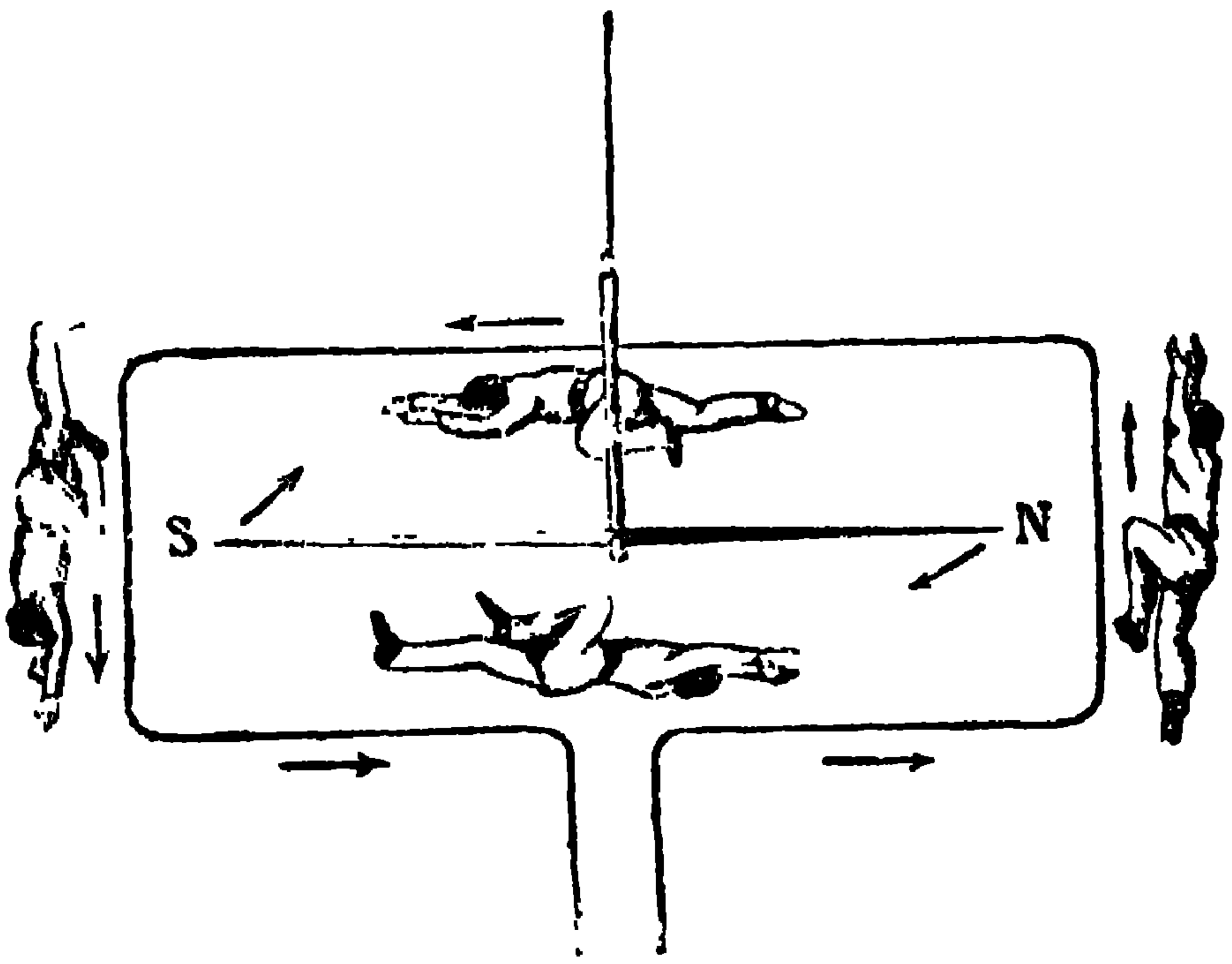

প্রবাহে চুম্বক-শলাকার বিচলন

সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে যেখানেই যাউক না কেন, চুম্বকের উত্তর-মেরু ঐ নিয়ম অনুসারে পূর্ব্বে হেলিয়া যাইতেছে। আরো হিসাব করিয়া দেখ, কাঁটার তলাকার :তারে উত্তর হইতে দক্ষিণে বিদ্যুৎ গেলে কাঁটার উত্তর-মেরু যে-দিকে ঘোরে, কাঁটার উপরে দক্ষিণ হইতে উত্তরে বিদ্যুৎ গেলে, তাহা ঠিক

সেই দিকেই হেলিয়া যায়। এইজন্য বেষ্টনীর মধ্যে চুম্বকের কাঁটা রাখিলে উপরের ও নীচের তারের বিদ্যুৎ, কাঁটাকে একই দিকে ঘোরায়। আবার বেষ্টনীর তার কাঁটার উপর-নীচে যত বেশি বার পেঁচানো থাকে, কাঁটা ততই বেশি জোরে ঘোরে।

তাহা হইলে দেখ, আম্পিয়ারের নিয়মটিকে মনে রাখার সুবিধা অনেক। বেষ্টনীর মাঝে কম্পাস্ রাখিয়া তাহার তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে কম্পাসের কাঁটা কোন্ দিকে হেলিবে, তাহা প্রবাহের দিক্ জানা থাকিলে অনায়াসে বলা যায়। আবার কাঁটা কোন্ দিকে হেলিতেছে, লক্ষ্য করিয়া বেষ্টনীর প্রবাহ কোন্ দিক্ ধরিয়া চলিতেছে তাহাও বলা চলে। গ্যালভ্যানো-মিটার (Galvanometre) অর্থাৎ বিদ্যুদ্বীক্ষণ নামে যে-যন্ত্রে বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক্ ও পরিমাণ ঠিক করা হয়, তাহাতে তারের বেষ্টনীর মধ্যে কম্পাসের কাঁটা থাকে। প্রবাহের দ্বারা কাঁটা কোন্ দিকে কতটা হেলিল, তাহা দেখিয়া বিদ্যুতের দিক্ ও পরিমাণ ঠিক্ করা হয়। এই যন্ত্রের কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের বল-ক্ষেত্র

কোনো জায়গায় চুম্বক রাখিলে তাহার চারিদিকে কি-রকম বল-ক্ষেত্র হয়, তাহা লোহার গুঁড়া ছিটাইয়া তোমাদিগকে আগেই দেখাইয়াছি। প্রায় এক শত বৎসর আগে ডেনমার্কের বৈজ্ঞানিক ওর্‌ষ্টেড্ (Oersted) দেখিয়াছিলেন, কেবল যে চুম্বকের চারিদিকে বল-ক্ষেত্র থাকে তাহা নয়, বিদ্যুৎও তারের ভিতর দিয়া চলিবার সময়ে তাহার চারিদিকে বল-ক্ষেত্র উৎপন্ন করে। যে-তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে, তোমরা যদি সেটিকে লোহার গুঁড়ার মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখো, তাহা হইলে তারের উপরে লোহার গুঁড়া লাগিয়া থাকিতে দেখিবে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের চারিদিকে যে চৌম্বক বল-ক্ষেত্র (Magnetic field) আছে, তাহা এই পরীক্ষায় বুঝা যায়।

আর একটা পরীক্ষার কথা বলিতেছি। পরপৃষ্ঠার

ছবিতে X Y চিহ্নিত একটি তামার তার আঁকা আছে। ইহার ভিতর দিয়া X হইতে Y-এর দিকে বিদ্যুতের প্রবাহ চলিতেছে এবং একখানি পেষ্ট-বোর্ড ভেদ করিয়া সেটি নীচে হইতে উপরে উঠিয়াছে। এখন যদি তোমরা পেষ্ট বোর্ডের উপরে একটু লোহার গুঁড়া ছড়াইয়া তাহাতে ধীরে ধীরে টোকা দিতে থাকো, তাহা হইলে গুঁড়াগুলিকে ঠিক্ ছবির মতো তারের চারিদিকে গোলাকারে দাঁড়াইতে দেখিবে। এই ক্ষেত্রের বল কোন্ দিক্ ধরিয়া কাজ করিবে, তাহা ছবিতে শর-চিহ্ন দিয়া আঁকা আছে। ছবিতে দেখ, বিদ্যুৎ নীচে হইতে উপরে চলিতেছে। তাহার জন্য তারের চারিদিকে বল-রেখা হইয়াছে, ডাইন হইতে বাঁ দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যে-দিক্

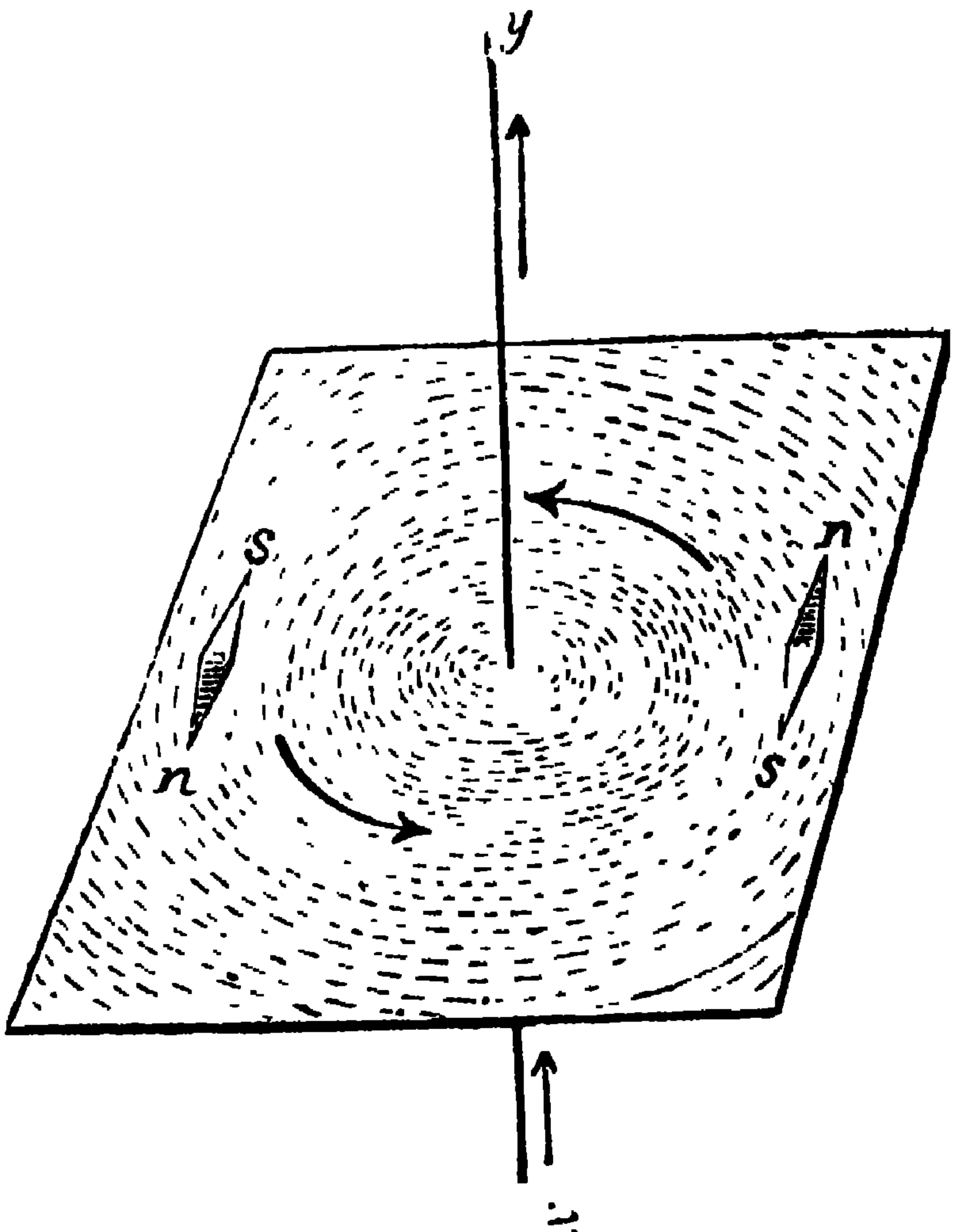

বিদ্যুৎ-প্রবাহের বল-ক্ষেত্র

ধরিয়া চলে ঠিক্ তাহারি বিপরীতে। চুম্বকের সঙ্গে এই বল-ক্ষেত্রের সম্বন্ধ কি-রকম, দুইটা চুম্বকের কাঁটা রাখিয়া ছবিতে তাহাও দেখানো হইয়াছে। X হইতে Y-এ না চলিয়া যদি বিদ্যুৎ Y হইতে X-এর দিকে চলিত, তাহা হইলে বল-রেখাগুলির দিক্ হইত বাঁ হইতে ডাইনে অর্থাৎ ঠিক্ ঘড়ির কাঁটার গতির মতো।

চুম্বকেব কাঁটার বিচলন-সম্বন্ধে আম্পিয়ার যেমন একটা নিয়মের কথা বলিয়াছেন, এখানেও সেই-রকম একটা নিয়ম পাওয়া যায়। মনে কর, যে-দিকে বিদ্যুতের প্রবাহ চলিতেছে, তারের ভিতর দিয়া ঠিক্ সেই দিকে একটা মানুষ সাঁতরাইয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় ক্ষেত্রের বলের দিক্‌টা থাকিবে, সেই লোকটার ঠিক্ বাঁ দিকে।

একটা তারকে গোলাকারে বাঁকাইয়া বিদ্যুৎ চালাইলে তাহার বল-ক্ষেত্র কি-রকম হয়, পরপৃষ্ঠার ছবি দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে। দেখ, গোলাকার তারের ফাঁকটা অনেক বল-রেখায় বোঝাই রহিয়াছে এবং সেগুলি ডাইন হইতে বাঁয়ে যাইতেছে। একখানা চুম্বকেরও বল-রেখা যে ঠিক্ এই রকমেই

চারিদিকে বিস্তৃত থাকে, তাহা তোমরা আগের অনেক পরীক্ষাতে দেখিয়াছ। ছবিতে দেখ, বল-রেখাগুলি X হইতে Y-এর দিকে চলিয়াছে। XY-কে যদি একখানা চুম্বক বলিয়া কল্পনা করা যায় এবং চুম্বকের উত্তর-মেরু যদি X-এ থাকে, তবে তাহারো বল-রেখা

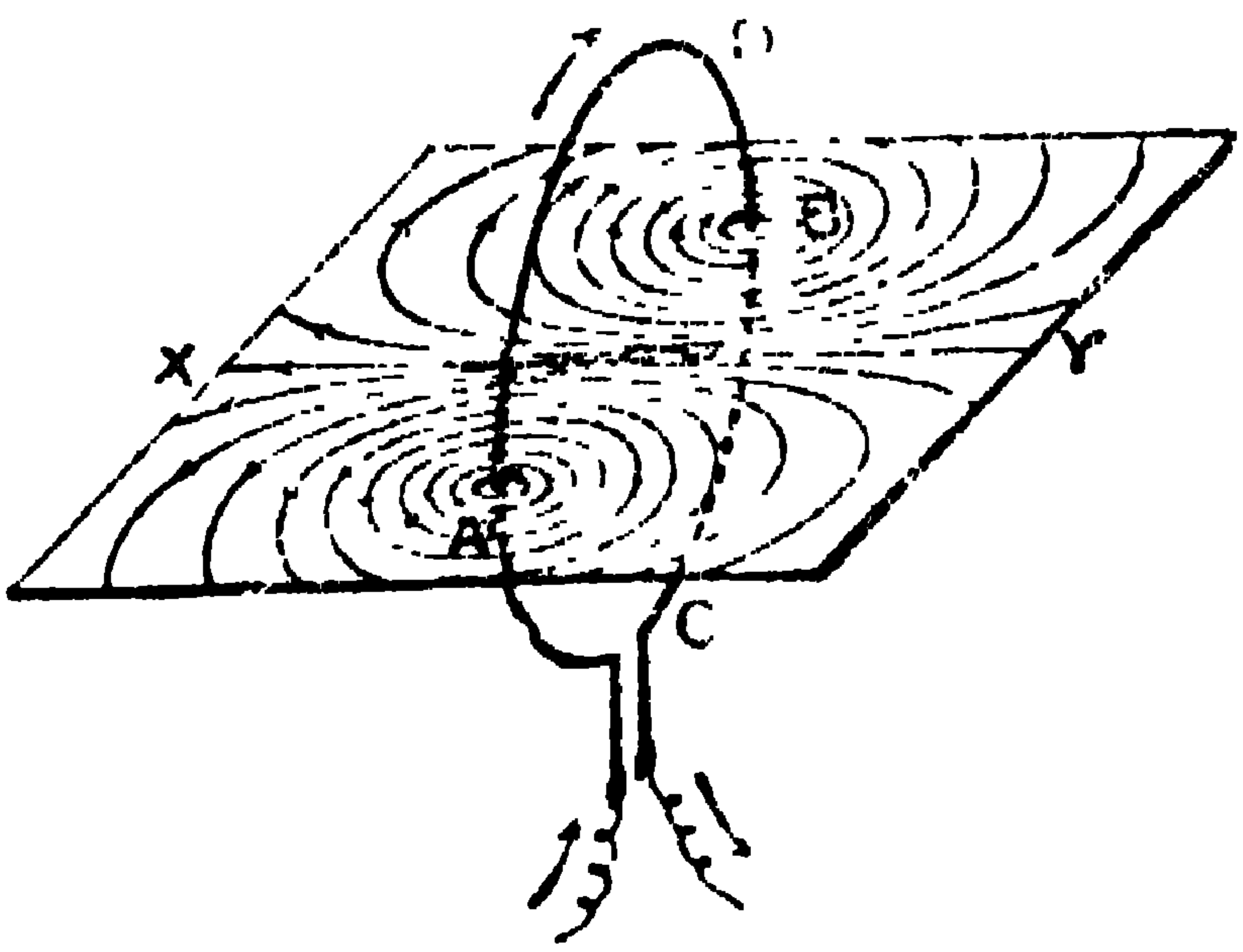

গোলাকার তারের বল-ক্ষেত্র

ঠিক্ ছবির মতো করিয়াই সাজানো দেখা যাইবে। কাজেই বলিতে হয়, গোলাকার তার ADBC-এর ভিতর দিয়া A হইতে D-এর এবং D হইতে B-এর দিকে বিদ্যুৎ চলায় যে-বল-ক্ষেত্র পাওয়া যাইতেছে, XY চুম্বকের X-এ উত্তর-মেরু থাকিলে ঠিক্ সেই রকমেরই বল-ক্ষেত্র পাওয়া যাইত। অর্থাৎ ADBC এই বাঁকানো তারটি হইয়া দাঁড়াইবে, যেন একটি

চুম্বকের ফলক। তাহার উত্তর-মেরু থাকিবে বাঁয়ে এবং দক্ষিণ-মেরু থাকিবে ডাইন্ দিকে।

নীচে যে-ছাবিটি দিলাম, তাহা হইতে বিষয়টা ভালো বুঝিতে পারিবে। দেখ, এখানেও একটা তারকে গোলাকারে বাঁকাইয়া বিদ্যুৎ চালানো হইতেছে। তারের যে-পিঠের বিদ্যুৎ তারের

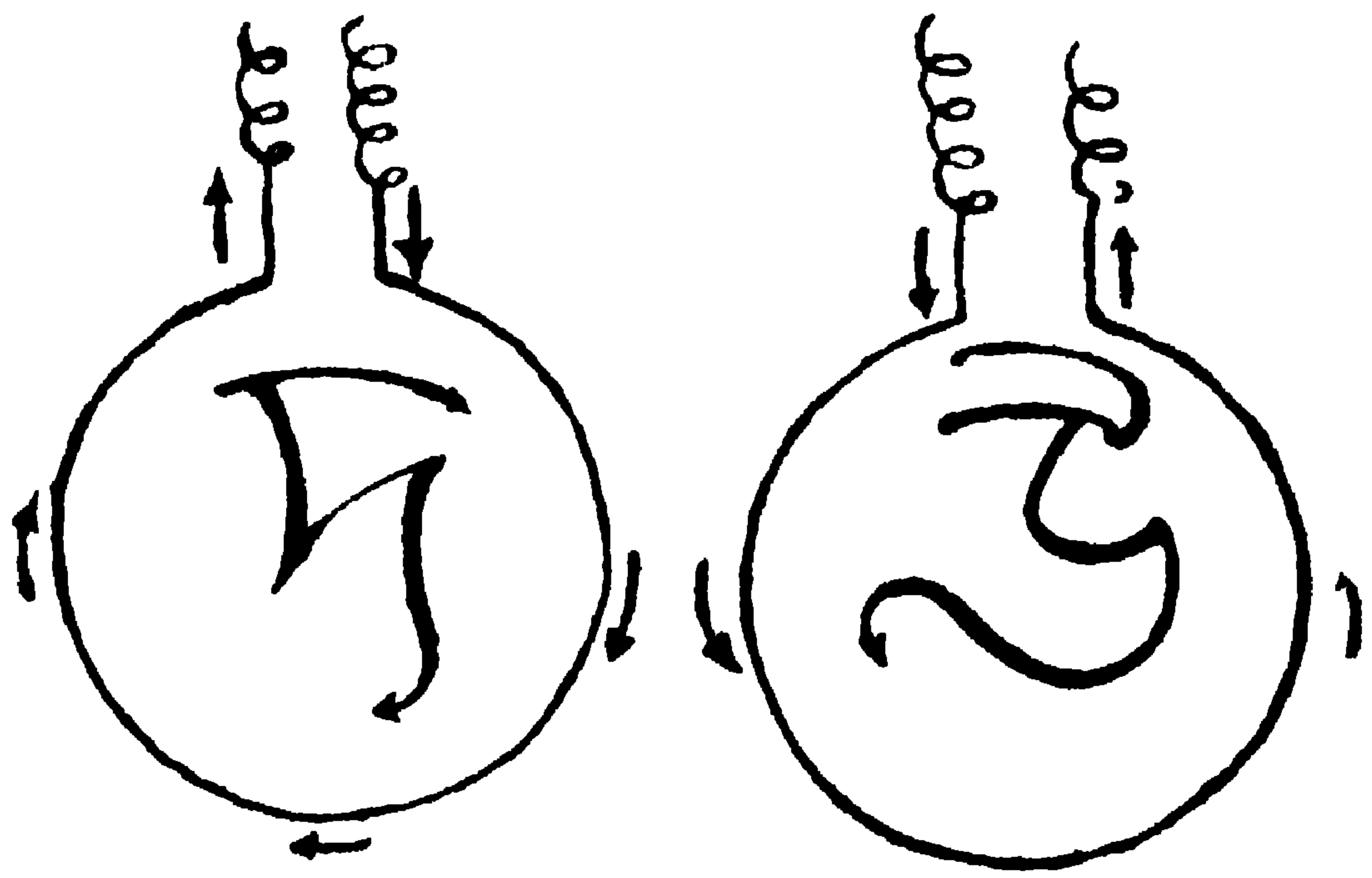

তারে প্রবাহের দিক্

ভিতর দিয়া ঘড়ির কাঁটার মতো বাঁ হইতে ডাইনে চলে, তাহার কাজ হয় চুম্বক ফলকের ঠিক্ দক্ষিণ-মেরুর মতো এবং যে-পিঠের বিদ্যুৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত, অর্থাৎ ডাইন হইতে বাঁয়ে চলে, তাহা হইয়া দাঁড়ায় যেন উত্তর-মেরু। একটি গোলাকারে বাঁকানো

তারকে দুই পিঠ হইতে দেখিলে, বিদ্যুতের প্রবাহকে কি-রকমে চলিতে দেখা যায়, এখানে তাহা পৃথক্ করিয়া আঁকিয়া দিয়াছি। বাঁয়ের ছবিতে সম্মুখের বিদ্যুৎ ঘড়ির কাঁটার দিক্ ধরিয়া চলিয়াছে। অতএব ইহার কাজ চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর মত হইবে। বাঁ-এর তারে বিদ্যুৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে চলিয়াছে। অতএব ইহাতে উত্তর-মেরুর কাজ পাওয়া যাইবে।

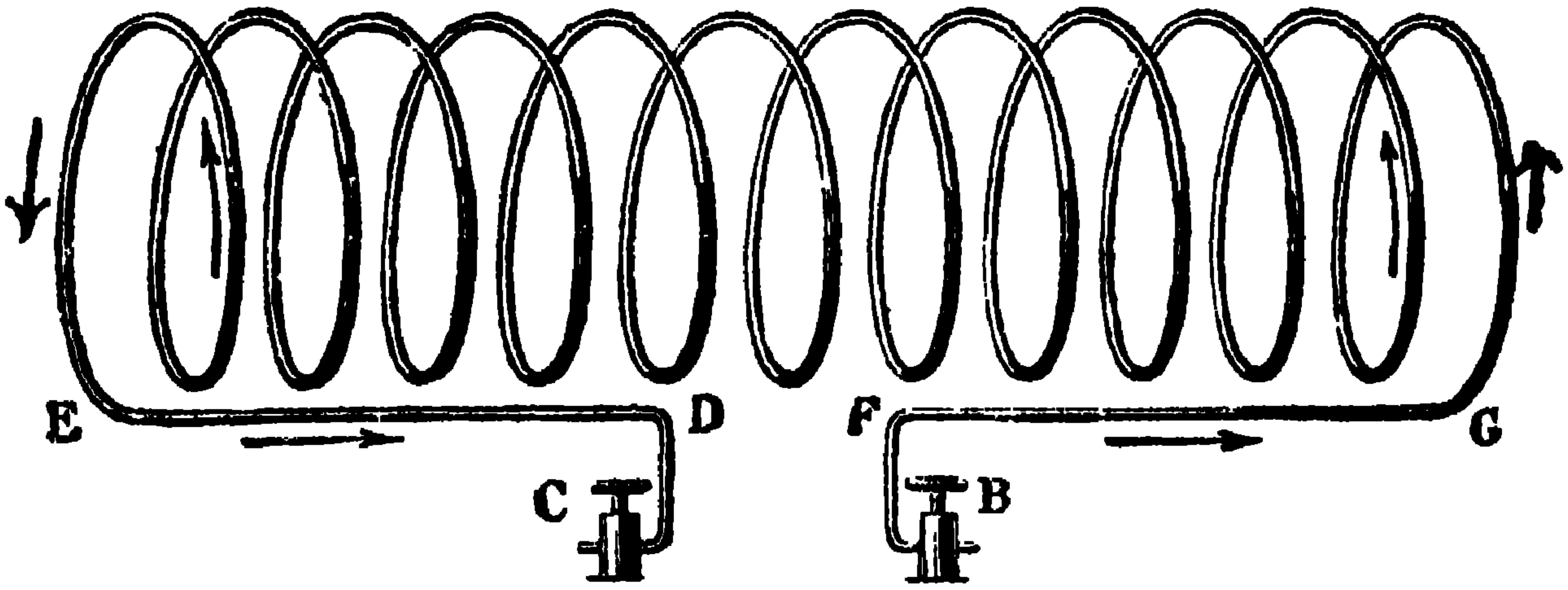

তারের বেষ্টনীতে প্রবাহ

উপরকার ছবিখানি দেখ। আগে যেমন একটা তারকে বাঁকাইয়া বৃত্ত তৈয়ারি করা হইয়াছিল, এখানে তাহা নাই। খুব লম্বা তারকে পেঁচাইয়া এখানে একটা কুণ্ডলী তৈয়ারি করা হইয়াছে এবং সেই কুণ্ডলীর তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালানো হইতেছে। পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে বেষ্টনীর ডাহিনের প্রান্ত উত্তর-মেরু এবং বাঁয়ের প্রান্ত দক্ষিণ-মেরু হইবে। আগেকার

তারে ছিল একটা বৃত্ত, এখানে হইল বহু বৃত্ত থাকে-থাকে সাজানো। এই-রকম বেষ্টনী বা কুণ্ডলীর চুম্বক-শক্তি একটা বাঁকানো তারের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি হয়। কেন বেশি হয়, তাহা বলা কঠিন নয়। তোমরা চুম্বকে দেখিয়াছ, যাহাতে বল-রেখা বেশি থাকে, তাহার শক্তিও বেশি হয়। আগেকার তারের এক ফের্তার মধ্যে যে-কয়েকটা বল-রেখা ছিল, পূর্ব্বপৃষ্ঠার ছবির মতো বেষ্টনীর বারো ফের্তায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি বল-রেখা থাকিবে। কাজেই, শক্তিও বেশি হইবে। বলরেখাগুলিই বেষ্টনীর চারিদিকে প্রবল বল-ক্ষেত্র উৎপন্ন করে। সুতরাং বেষ্টনীর তারে বিদ্যুৎ চালাইতে থাকিলে, তাহার সব কাজই চুম্বকের মতো হওয়া উচিত। পরীক্ষা করিলে বেষ্টনীতে চুম্বকের সব গুণ ধরা পড়ে।

পরপৃষ্ঠায় যে-ছবিটি দিলাম, লক্ষ্য কর। দেখ, একটা তারের বেষ্টনীর ভিতরে বিদ্যুৎ চলিয়া তাহার বাঁ প্রান্তকে উত্তর-মেরু এবং ডাইন প্রান্তকে দক্ষিণ-মেরু করিয়াছে। এখন যদি তোমরা কোনো চুম্বকের উত্তর-মেরুকে উহার বাঁ প্রান্তের কাছে আনো, তাহা হইলে এক চুম্বকের উত্তর-মেরুর সঙ্গে অন্য চুম্বকের

উত্তর-মেরুর যেমন বিকর্ষণ দেখা যায়, এখানে তোমরা তাহাই দেখিতে পাইবে। আবার চুম্বকের উত্তর-মেরুকে বেষ্টনীর ডাইন প্রান্তে অর্থাৎ দক্ষিণ-মেরুর কাছে আনিলে দুইয়ের আকর্ষণ দেখা যাইবে।

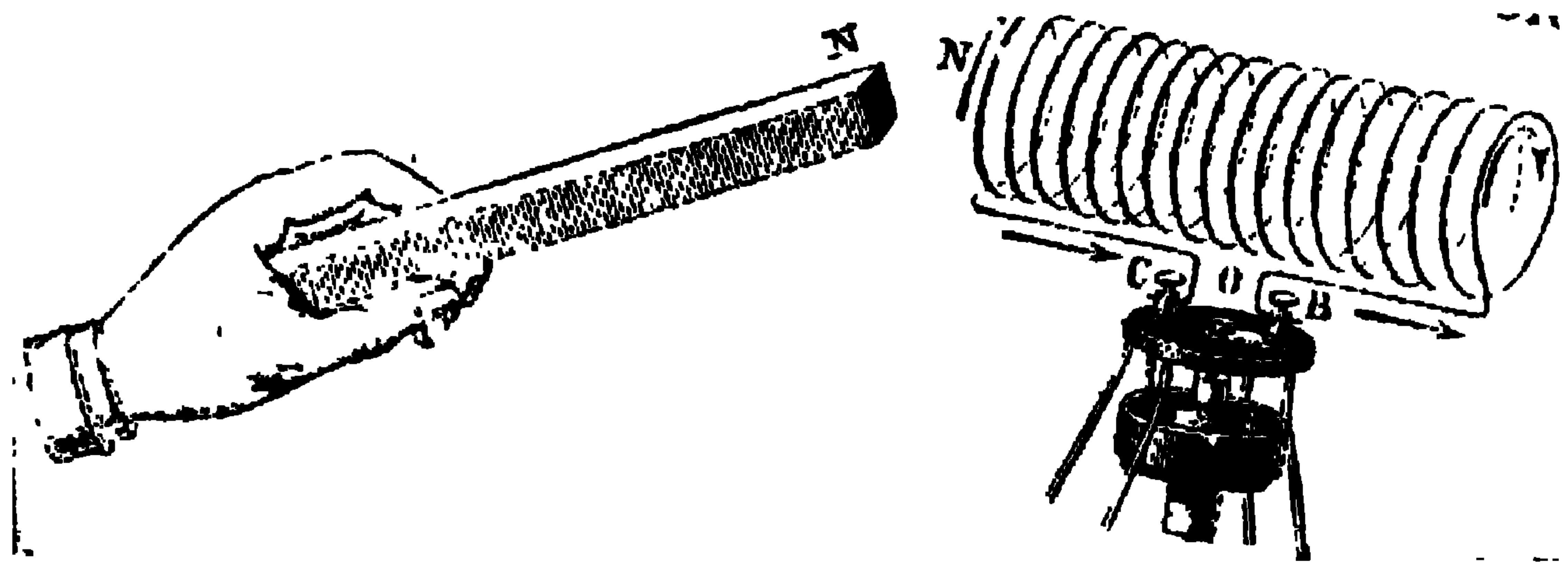

তারের বেষ্টনী ও চুম্বক

কেবল ইহাই নয়, চুম্বক না লইয়া তোমরা যদি কেবল দুইটা বেষ্টনীর মধ্যে বিদ্যুৎ চালাইয়া পরীক্ষা করিতে থাকো, তবে এই দুইয়ের কাজ ঠিক্ দুখানি চুম্বকের মতোই দেখিতে পাইবে। কথাটা বোধ করি ভালো বুঝিলে না। পরপৃষ্ঠায় যে-ছবি দিলাম তাহা লক্ষ্য কর। ডাইনের বেষ্টনীর তারে বিদ্যুৎ চলিয়া যে উত্তর-মেরুর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কাছে অন্য বেষ্টনীর দক্ষিণ-মেরু ধরা হইয়াছে। ইহাতে দুইখানি চুম্বকের মতোই পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ দেখা যাইতেছে।

এই সকল পরীক্ষা আশ্চর্য্যজনক নয় কি ? চুম্বকের নাম-গন্ধ নাই ; কেবল তারের কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালানো গেল—অমনি তাহাতে চুম্বকের সবগুণই দেখা দিল। ইহা দেখিলে সত্যই আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। দেখ, চুম্বকের শক্তির সঙ্গে তলায় তলায় বিদ্যুতের কত যোগ।

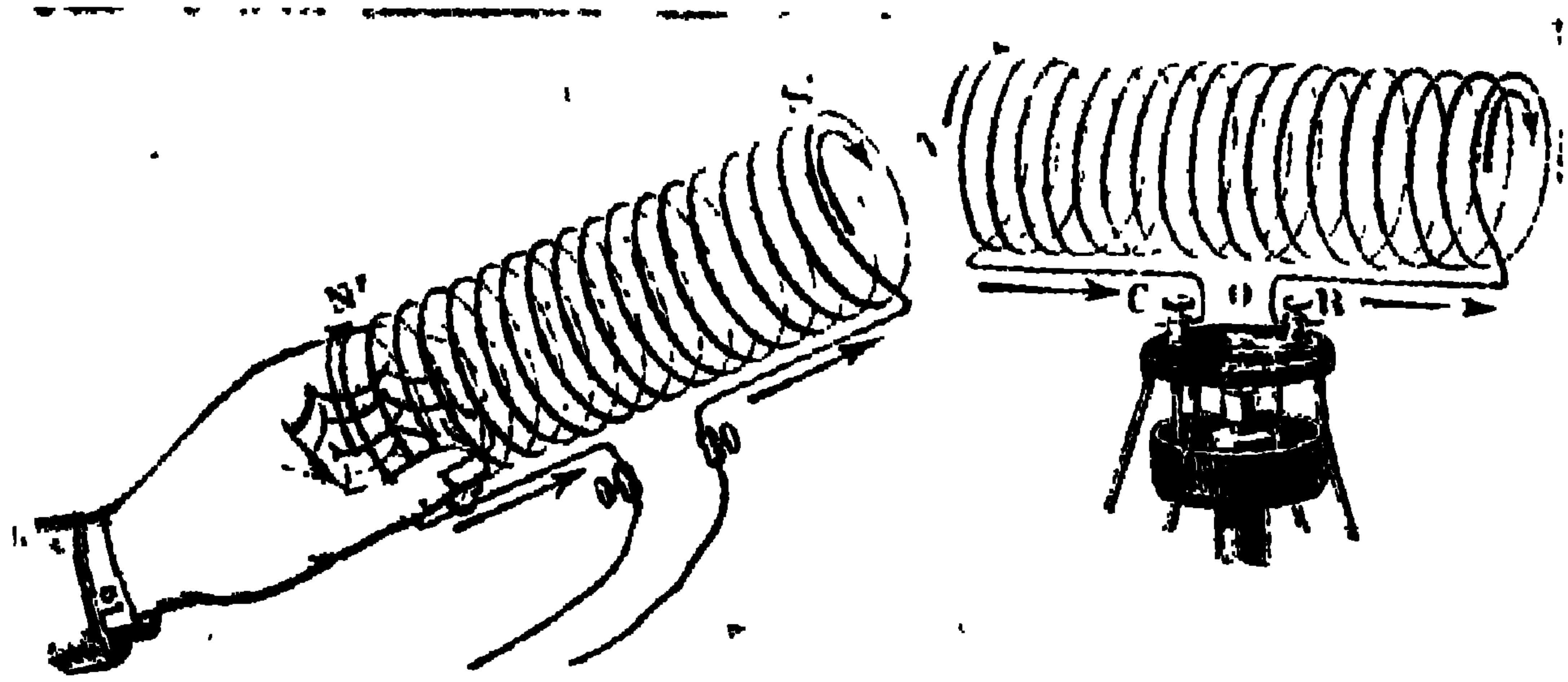

দুই বেষ্টনীতে আকর্ষণ-বিকর্ষণ

ইহা দেখিয়া এক শত বৎসর আগে ফরাসী বৈজ্ঞানিক আম্পিয়ার সাহেব চুম্বকের গুণ-সম্বন্ধে যে-কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া রাখা ভালো। তিনি বলিয়াছিলেন, লোহা নিকেল প্রভৃতি যে-সব জিনিষকে চুম্বক করা যায়, তাহাদের প্রত্যেক অণুতে বৃত্তাকার পথে বিদ্যুতের প্রবাহ চলে। যখন ঐ-সব জিনিষকে

চুম্বক করা না যায়, তখন অণুর ঐ প্রবাহগুলি এলো-মেলো ভাবে থাকে বলিয়া, তাহাতে চুম্বকের শক্তি বুঝা যায় না। তার পরে চুম্বক করিলেই সেই এলোমেলো প্রবাহগুলি এক মুখে চলিয়া চুম্বকের শক্তি দেখাইতে থাকে। নীচের ছবিটি দেখিলে আম্পিয়ারের কথা বুঝিতে পারিবে। একটা গোলাকার চুম্বককে আড়াআড়ি ভাবে কাটিলে যে-রকম দেখায়, ছবিতে তাহাই আঁকিয়া দিয়াছি। মনে কর, ইহার ভিতরকার গোলাকার অংশগুলি যেন এক একটি অণু। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, প্রত্যেক অণুর ভিতরকার বিদ্যুৎ-প্রবাহ ডাইন হইতে বাঁয়ে, অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার গতির ঠিক বিপরীতে চলিতেছে। কাজেই, অণুর এই-রকম প্রবাহের ফলে চুম্বকেও ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখে একটা প্রবল প্রবাহ জন্মে দেখা যাইতেছে। আম্পিয়ার অনুমান করিয়াছিলেন, লোহার ভিতরকার অণুর প্রবাহ এলোমেলো ভাব ত্যাগ করিয়া যখন এই রকম এক-মুখো হইয়া দাঁড়ায়, তখনি তাহাতে চুম্বক-শক্তি প্রকাশ পায়। আমরা যখন কোনো ইস্পাত-

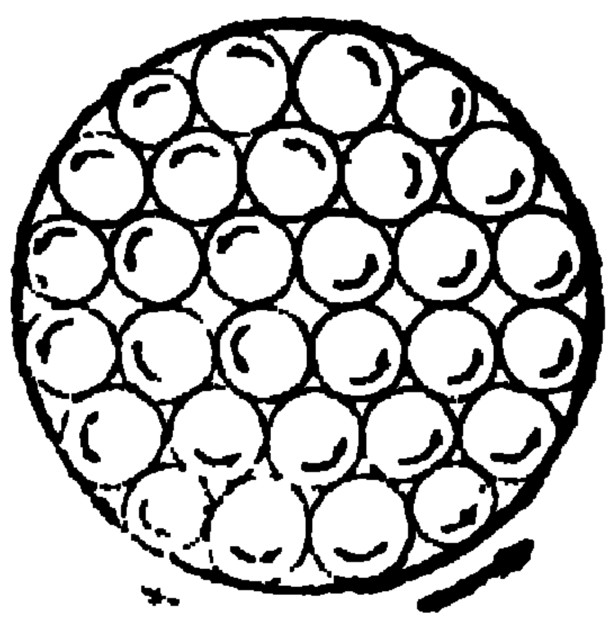

চুম্বকের অণুতে প্রবাহ

ফলকে চুম্বক ঘষিয়া তাহাতে স্থায়ী চুম্বক-শক্তি আনি, তখন আমরা তাহার অণুগুলির বিদ্যুৎ-প্রবাহকে ঐ ছবির মতো এক মুখে আনিয়া ফেলি মাত্র।

রেশম-মোড়া তারের দুই বেষ্টনীর মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহ চালাইলে, তাহাদের আকর্ষণ বিকর্ষণ কি-রকমে হয় বলিলাম। কিন্তু মনে রাখিয়ো, কেবল বেষ্টনীর বিদ্যুতেই যে, আকর্ষণ-বিকর্ষণ দেখা যায়, তাহা নয়। দুইটা তারকে সমান্তরাল ভাবে ধরিয়া বিদ্যুৎ চালাইলেও তাহাদের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ আসিয়া পড়ে।

এখানে যে-ছবিটি দিলাম, তাহা দেখ। একটা তারকে বাঁকাইয়া BADC-এর মতো চৌকোণ আকৃতি দেওয়া হইয়াছে। M-চিহ্নিত অংশও ঠিক সেই রকমে বাঁকানো আর একটা তার। একটা ব্যাটারির দুই প্রান্ত G অংশে সংযুক্ত

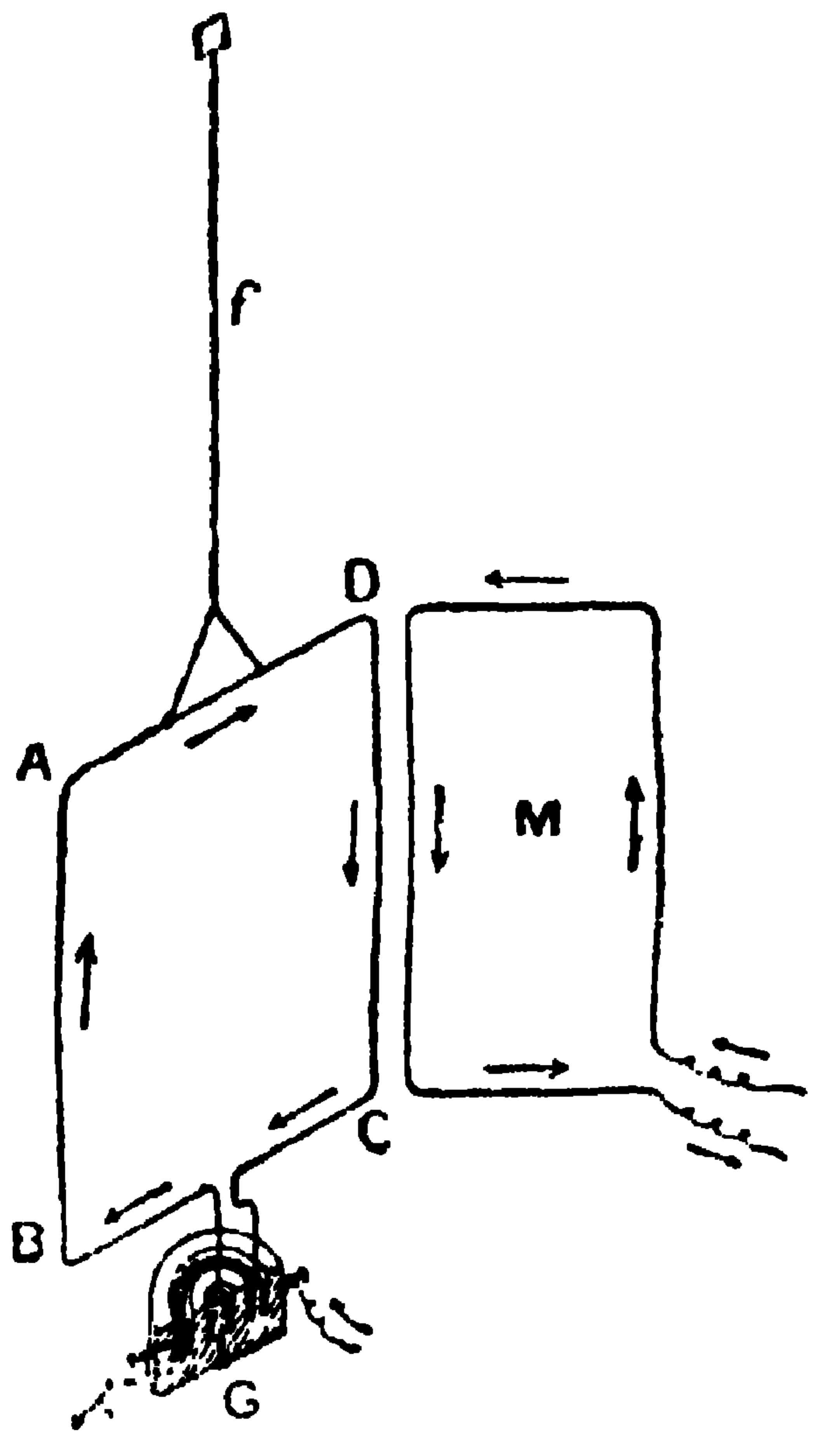

সমান্তরাল প্রবাহে আকর্ষণ-বিকর্ষণ

আছে। ছবি দেখিলেই বুঝিবে, বিদ্যুতের প্রবাহ G হইতে BADC এই পথে চলিয়াছে। M-এর তারের ভিতর দিয়া কি-রকমে বিদ্যুৎ চলিতেছে তাহা শরচিহ্ন দিয়া আঁকা আছে। এই অবস্থায় তোমরা যদি M-কে ছবির মতো করিয়া D C তারের কাছে আনো, তবে দেখিবে, M-এর তার D C তারকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, দুই সমান্তরাল তারের মধ্যে একই দিকে বিদ্যুৎ চলিলে, তার দুটি পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

এইবারে Mকে সরাইয়া AB-চিহ্নিত তারের কাছে লইয়া যাও। এখন M-এর তারের এবং A B তারের প্রবাহের দিক্ ঠিক্ বিপরীত হইবে। এই অবস্থায় M-এর তার A B-কে আকর্ষণ করিবে। ইহা হইতে বুঝা যায়, যখন দুই সমান্তরাল তারের ভিতর দিয়া বিপরীত প্রবাহ চলিতে থাকে, তখন তার দুটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

সমান্তরাল তারের এই রকম আকর্ষণ-বিকর্ষণ আম্পিয়ার সাহেব আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

গ্যাল্‌ভ্যানোমিটার, আম্পিয়ারমিটার এবং ভোল্‌টমিটার

কোনো কোষ বা ব্যাটারি দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে কি না, সহজে ঠিক্‌ করা যায় না। তারের ভিতর দিয়া যে-বিদ্যুৎ চলে, তাহা চোখে দেখা যায় না,—দেখা গেলে কোনো হাঙ্গামা থাকিত না। তা'ছাড়া বিদ্যুৎ চলিতে থাকিলে, কত জোরের বিদ্যুৎ চলিতেছে এবং তাহার প্রবাহক-বলই বা কত, তাহাও ঠিক্‌ করা দরকার। যাঁহারা বিদ্যুৎ লইয়া নাড়াচাড়া করেন, বা বিদ্যুতের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের এ-সব জানা না থাকিলে এক দণ্ডও কাজ চলে না। তোমরা একবার বিদ্যুতের কারখানায় গেলে দেখিতে পাইবে, দেওয়ালের গায়ে ঘড়ির মতো অনেক যন্ত্র সাজানো আছে। এই-সব যন্ত্রের কোনোটা বিদ্যুতের পরিমাণ প্রকাশ করে, কোনোটা-বা প্রবাহক-বল জানাইয়া দেয়। তা'ছাড়া পাছে বেশি বিদ্যুতে বাল্‌ব্‌ পুড়িয়া যায়, তাহার জন্য সারি সারি ফিউজ্‌ সাজানো থাকে। যাহারা ডাইনামো বা অন্য বিদ্যুতের যন্ত্র চালায়, তাহাদের নজর সর্ব্বদা

ঐ-সব ঘড়ির মতো যন্ত্রের উপরে থাকে। তা'ছাড়া যাহারা বাড়িতে বাড়িতে আলো ও পাখার জন্য বিদ্যুৎ জোগায়, তাহাদেরো বিদ্যুতের পরিমাণ মাপার দরকার হয়। ইহার জন্যও নানা প্রকার যন্ত্র আছে। দিনে বা মাসে কত বিদ্যুৎ খরচ হইল, তাহা এই-সব যন্ত্রে ধরা পড়ে। বিদ্যুৎ-ব্যবসায়ী তাহা দেখিয়া গৃহস্থদের কাছ হইতে বিদ্যুতের দাম আদায় করে। সাদা ব্লটিং কাগজকে পটাসিয়ম্ আয়োডাইডের (Potassium Iodide) জলে ভিজাইয়া তোমরা যদি কোনো কোষের তারের দুই প্রান্ত সেই কাগজের উপরে রাখো, তবে দেখিবে, কাগজের যে-অংশকে ধন-প্রান্ত (Anode) ছুঁইয়াছে, তাহার রঙ্ নীল হইয়া গিয়াছে। এই উপায়ে খুব মৃদু বিদ্যুতের প্রবাহও ধরা পড়ে। কোষের তারের দুই প্রান্ত জিভে ঠেকাইলেও তার দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে কি না জানা যায়। তারের ঋণ-প্রান্ত জিভের যে-অংশকে ছুঁইয়া আছে, অতি-সমান্য বিদ্যুৎ চলিলেও সেখানটায় স্পষ্ট অম্ল স্বাদ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই-সব উপায়ে বিদ্যুতের অস্তিত্ব জানা যায় মাত্র, পরিমাণ বুঝিতে গেলে রীতিমত যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। এই যন্ত্রকে ইংরাজিতে Galvanometer

এবং বাংলায় বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্র বলা হইয়া থাকে। ইহা দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক্‌ ও তাহার জোর জানা যায়।

এখানকার ছবিটি লক্ষ্য কর। ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। ইহাতে কাঠের ফ্রেমের উপরে রেশম

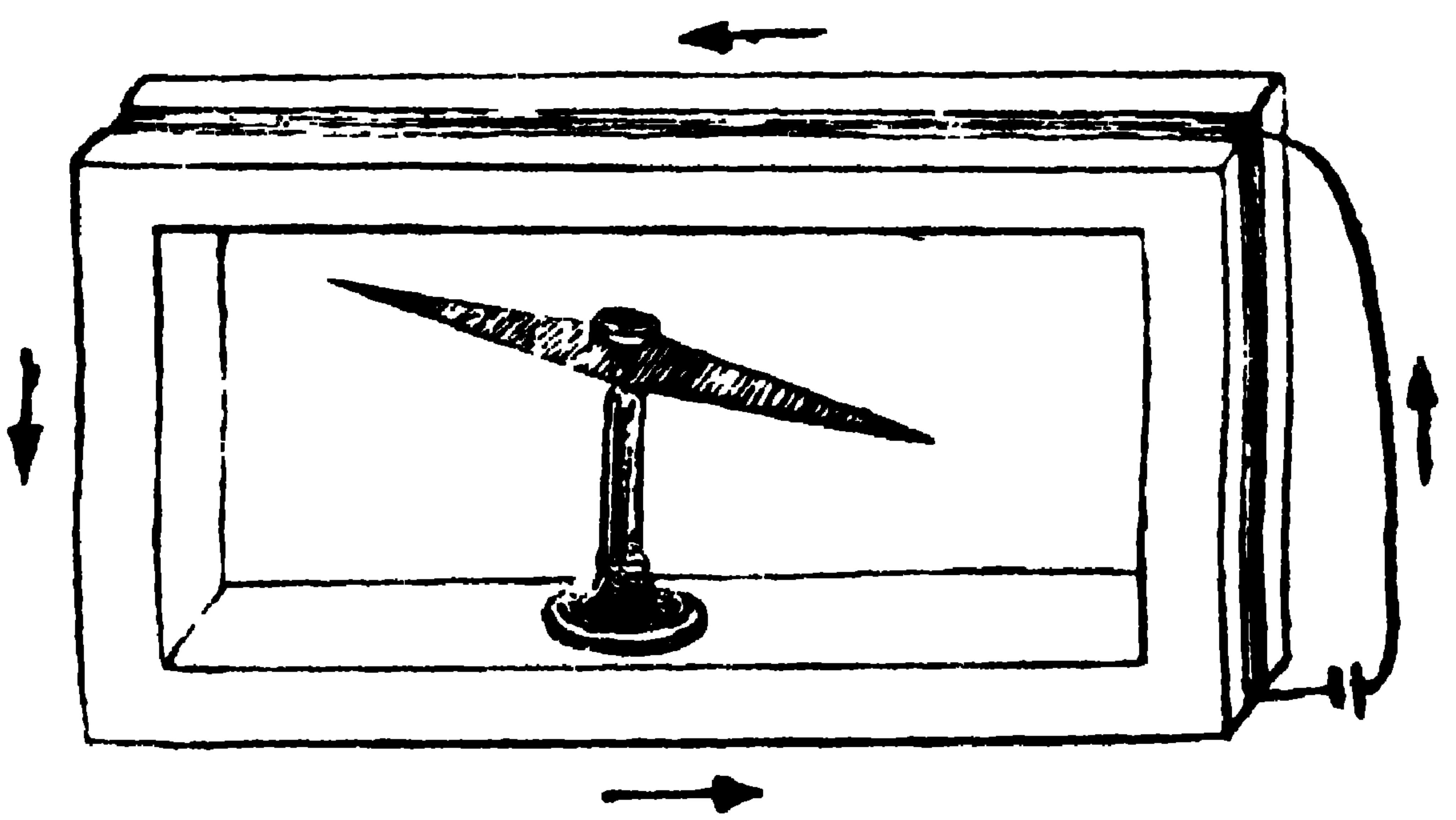

বেষ্টনীর ভিতরে চুম্বক-শলাকা

বা সূতা-মোড়া তার পাকে পাকে জড়াইয়া একটি বেষ্টনী তৈয়ারি করা হইয়াছে এবং তাহার ভিতরে একটা কম্পাসের কাঁটা রাখা হইয়াছে। কাঁটা যেমন উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া থাকে, বেষ্টনীকেও ঠিক্‌ কাঁটারই উপরে উত্তর-দক্ষিণে রাখা হইয়াছে। এখন উহার তারের ভিতর দিয়া শর-চিহ্নিত দিক্‌ ধরিয়া

বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না কি? আম্পিয়ারের নিয়ম অনুসারে কাঁটার উত্তর-মেরু বাঁয়ে এবং দক্ষিণ-মেরু ডাইনে হেলিয়া যাইবে। সুতরাং যে-কাঁটা আগে উত্তর-দক্ষিণে স্থির হইয়া ছিল, তাহা বেষ্টনীর বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তিতে পূর্ব্ব-পশ্চিমে আসিয়া দাঁড়াইবে। তারের বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করিয়া দাও, দেখিবে, কাঁটা মুখ ঘুরাইয়া আবার উত্তর-দক্ষিণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বেষ্টনীর তারের ভিতর দিয়া এখন বিপরীত মুখে বিদ্যুৎ চালাইতে থাকো, দেখিবে, আম্পিয়ারের নিয়ম অনুসারে উত্তর-মেরু ডাইনে এবং দক্ষিণ-মেরু বাঁয়ে হেলিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলে দেখ, চুম্বকের কাঁটার উত্তর-মেরু কোন্ দিকে হেলিল, তাহা দেখিয়া এই যন্ত্রে প্রবাহের দিক্ ঠিক্ করা যায়। কেবল ইহাই নয়, উহা উত্তর-দক্ষিণ রেখার সহিত কতটা কোণ করিয়া ডাইনে বা বাঁয়ে সরিয়া গেল, তাহা মাপিয়া বিদ্যুতের জোরও বুঝিয়া লওয়া যায়।

পরপৃষ্ঠার ছবিটি একটি ভালো বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রের চিত্র। ছবির ab চুম্বকের কাঁটা; ইহা ঠিক্ সেই রকমেরই আর একটি কাঁটার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আঁটা আছে। কিন্তু

তাহাদের একই মেরুকে এক দিকে রাখা হয় নাই। অর্থাৎ একের উত্তর-মেরু যে-দিকে থাকে, অপরের দক্ষিণ-মেরুকে সেই দিকে রাখিয়া উভয়কে জুড়িয়া রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয় কাঁটাটিকে ছবিতে দেখা যাইতেছে

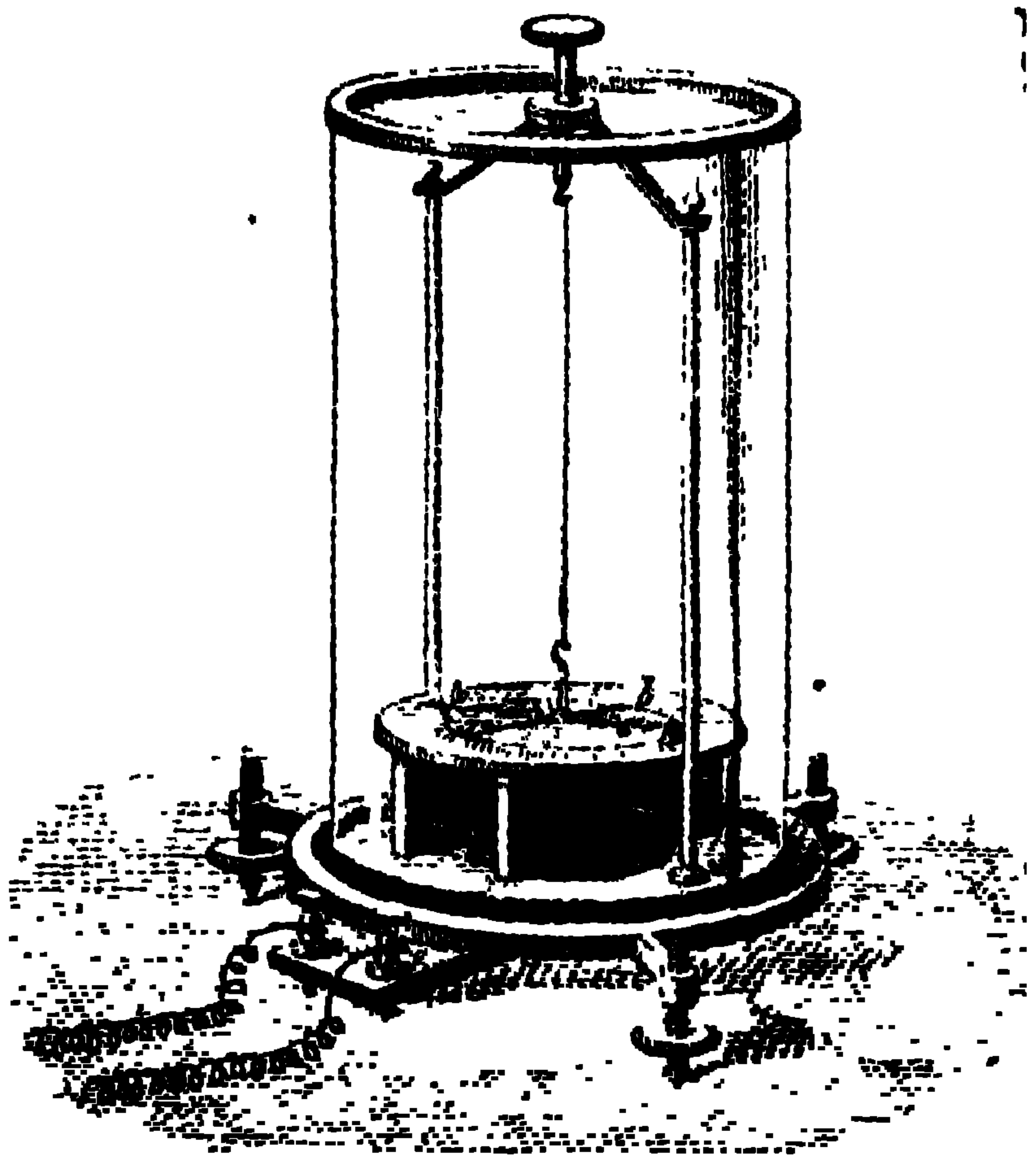

বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্র

না। সেটি আছে যন্ত্রের তলাকার বেষ্টনীর মধ্যে। এখন বেষ্টনীর তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিলেই তাহার ভিতরকার কাঁটা বিচলিত হইয়া পড়ে। কাজেই, উপরকার যে-কাঁটা ভিতরের কাঁটার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহাও ইহাতে বিচলিত হয়। এই বিচলনের পরিমাণ

দেখিয়াই বিদ্যুতের শক্তি ঠিক করা হয়। এই যন্ত্রে কি-রকমে চুম্বকের শলাকা সাজানো থাকে, তাহা নীচের ছবিতে আঁকিয়া দিলাম।

যে বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রের বিবরণ দেওয়া গেল, তাহাতে বেষ্টনী স্থির থাকে, বিচলিত হয় তাহারি ভিতরকার চুম্বকের কাঁটা। ইহারি ঠিক্ উল্‌টা প্রথায়,—অর্থাৎ স্থির চুম্বকের মধ্যে বেষ্টনীর বিচলন দেখিয়াও বিদ্যুৎ মাপা যায়। সচল বেষ্টনী এবং স্থির চুম্বক লইয়া যে বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হয়, ১৪২ পৃষ্ঠায় তাহার একটা ছবি দিলাম। ইহাকে সচল বেষ্টনী (Moving coil) বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্র বলা যাইতে পারে। দেখ, ছবির যন্ত্রটির কাঠামো একটা বড় চুম্বক। তাহার উত্তর ও দক্ষিণ মেরু N এবং S-চিহ্নিত স্থানে আছে। ইহাদের মাঝের চোঙের

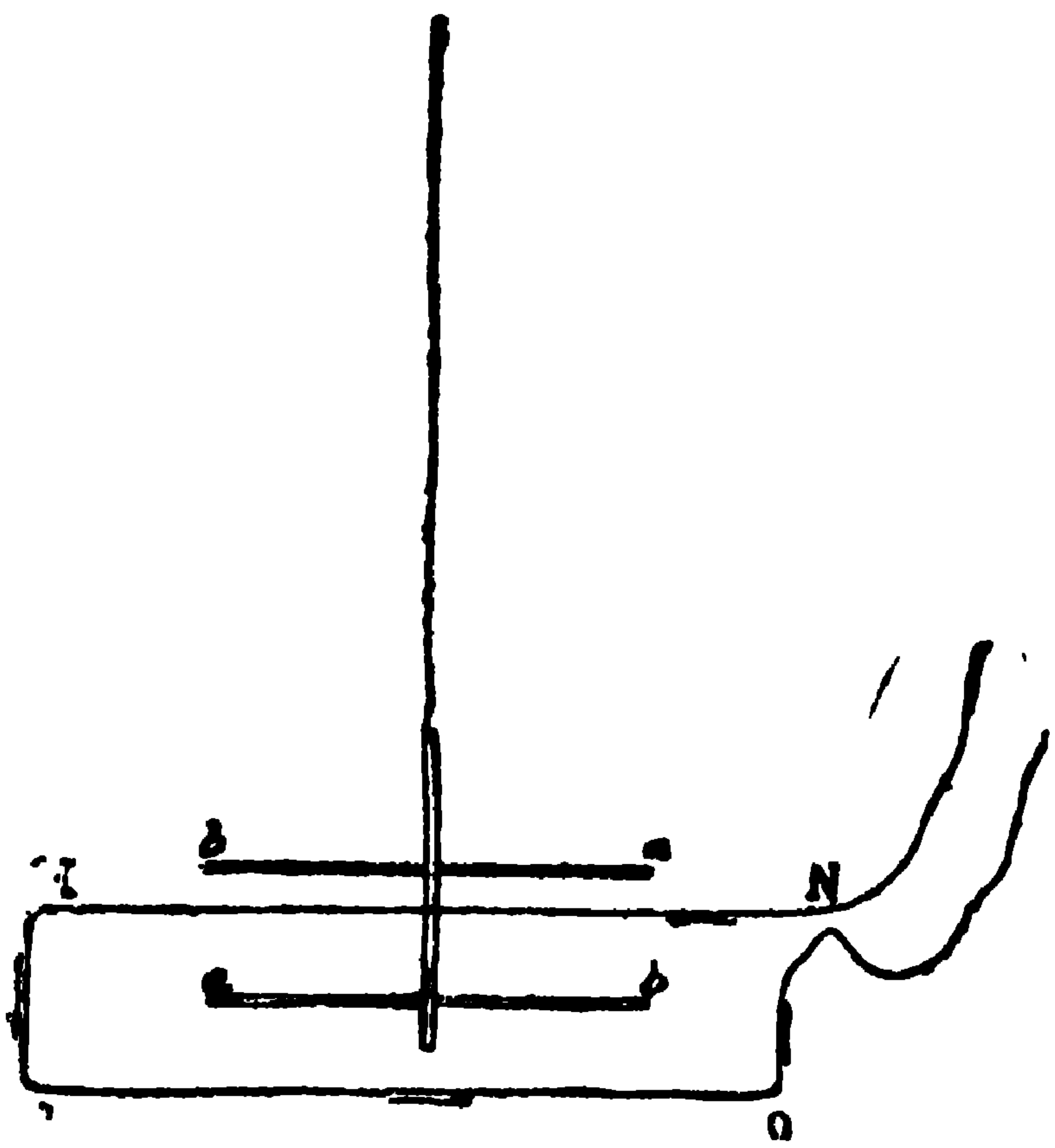

বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রের কাঁটা

মতো জিনিষটা একটি তারের বেষ্টনী। ইহার তারের দুই প্রান্ত উপরের ও নীচের f-চিহ্নিত জায়গায় সংযুক্ত আছে। যন্ত্রের M-চিহ্নিত অংশ একটি ছোটো আয়না, ইহা বেষ্টনীর সঙ্গে শক্ত করিয়া আঁটা থাকে। তাই বেষ্টনী যখন বিচলিত হয়, আয়নাখানিও সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হইয়া পড়ে। আবার আয়নার উপরে আলো ফেলিতে থাকিলে সেই আলো প্রতিফলিত হইয়া দেওয়ালের গায়ে পড়ে এবং আয়নার বিচলনের সঙ্গে তাহা দেওয়ালের গায়ে ছুটাছুটি করে।

এখন মনে করা যাউক, বেষ্টনীর তার যে সমতলে (Plane) জড়ানো আছে, তাহাকে চুম্বকের বল-রেখার সহিত সমান্তরাল করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহার তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালানো যাইতেছে। বেষ্টনী সচল অর্থাৎ উহা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে। সুতরাং চুম্বকের উত্তর-মেরু হইতে দক্ষিণ-মেরুর দিকে যে-সকল বল-রেখা আছে, সেগুলিকে নিজের কাছে রাখিবার জন্য বেষ্টনী ঘুরিয়া দাঁড়াইবে। এই-রকমে বেষ্টনী কতটা বাঁকিয়া দাঁড়াইল তাহা মাপিয়া বিদ্যুতের জোর ঠিক্ করা হয়। বেষ্টনী যেমন ঘোরে, তেমনি তাহাতে লাগানো আয়নার

প্রতিফলিত আলোও ঘুরিয়া বেড়ায়। এই যন্ত্রে সাধারণত আলোর বিচলন দেখিয়াই বিদ্যুৎ মাপা

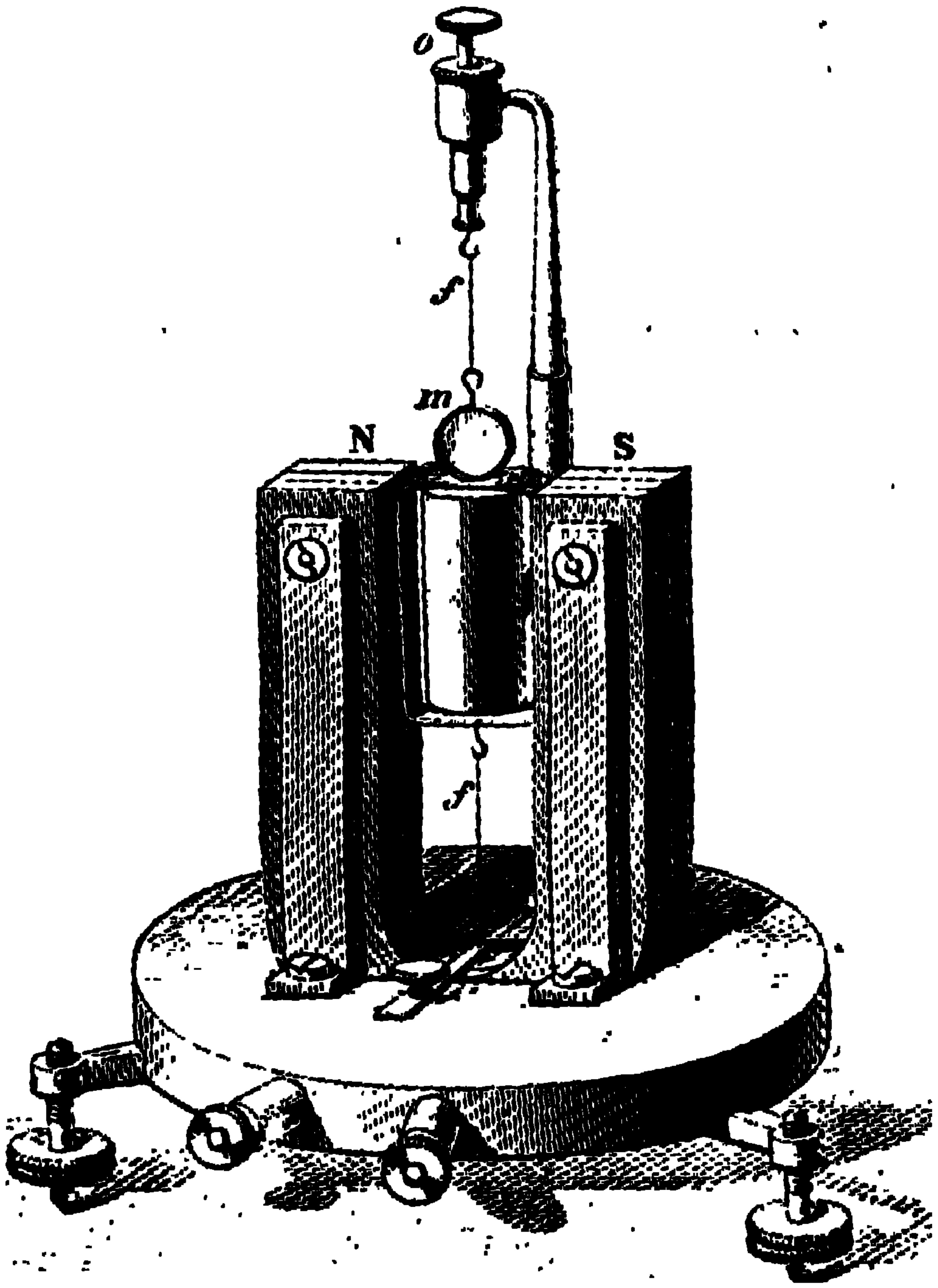

সচল বেষ্টনী বিদ্যুৎ-মাপক

হয়। তোমরা বোধ করি লর্ড কেল্‌ভিনের (Lord

Kelvin) নাম শুনিয়াছ। ইনি ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ই এই যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

মনে রাখিয়ো, চুম্বকের কাঁটা দিয়া যে বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যায়, তাহাতে সচল কাঁটা নিজের বল-রেখাগুলিকে বেষ্টনীর ভিতরে চালাইবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়ায়, এবং সচল বেষ্টনী দিয়া যে-যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যায়, তাহাতে স্থির চুম্বকের বল-রেখাগুলি যাহাতে নিজের ভিতর দিয়া যায় তাহার জন্য বেষ্টনী ঘুরিয়া আসে। ব্যাপার দুটি ঠিক্ উল্‌টা-পাল্‌টা। কিন্তু সচল বেষ্টনীর সুবিধা অনেক। চুম্বকের কাঁটাযুক্ত সাধারণ যন্ত্রে কাঁটার ঠিক্ উপরে বেষ্টনীকে না রাখিলে কাজ চলে না। তাই কাঁটা যেমন উত্তর-দক্ষিণে থাকে বেষ্টনীকেও ঠিক্ সেই রকমে কাঁটার উপরে রাখিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। সচল বেষ্টনী যন্ত্রে এই হাঙ্গামার কোনো দরকারই হয় না। ইহা কম সুবিধার কথা নয়। তা'ছাড়া যে অতি-মৃদু বিদ্যুতে চুম্বকের কাঁটা সাড়া দেয় না, তাহাতে সচল বেষ্টনীকে খুব জোরে ঘুরিতে দেখা যায়। তাই ক্ষীণ প্রবাহ মাপিতে গেলে সচল বেষ্টনী ছাড়া কাজ চলে না।

আম্পিয়ার মিটার (Ampere meter) অর্থাৎ বিদ্যুতের পরিমাণ মাপিবার যন্ত্রের গঠন এবং কাজ ঠিক্ সচল বেষ্টনী যন্ত্রেরই মতো। এখানে আম্পিয়ার মিটারের ভিতরকার কলের একটা ছবি দিলাম। এই

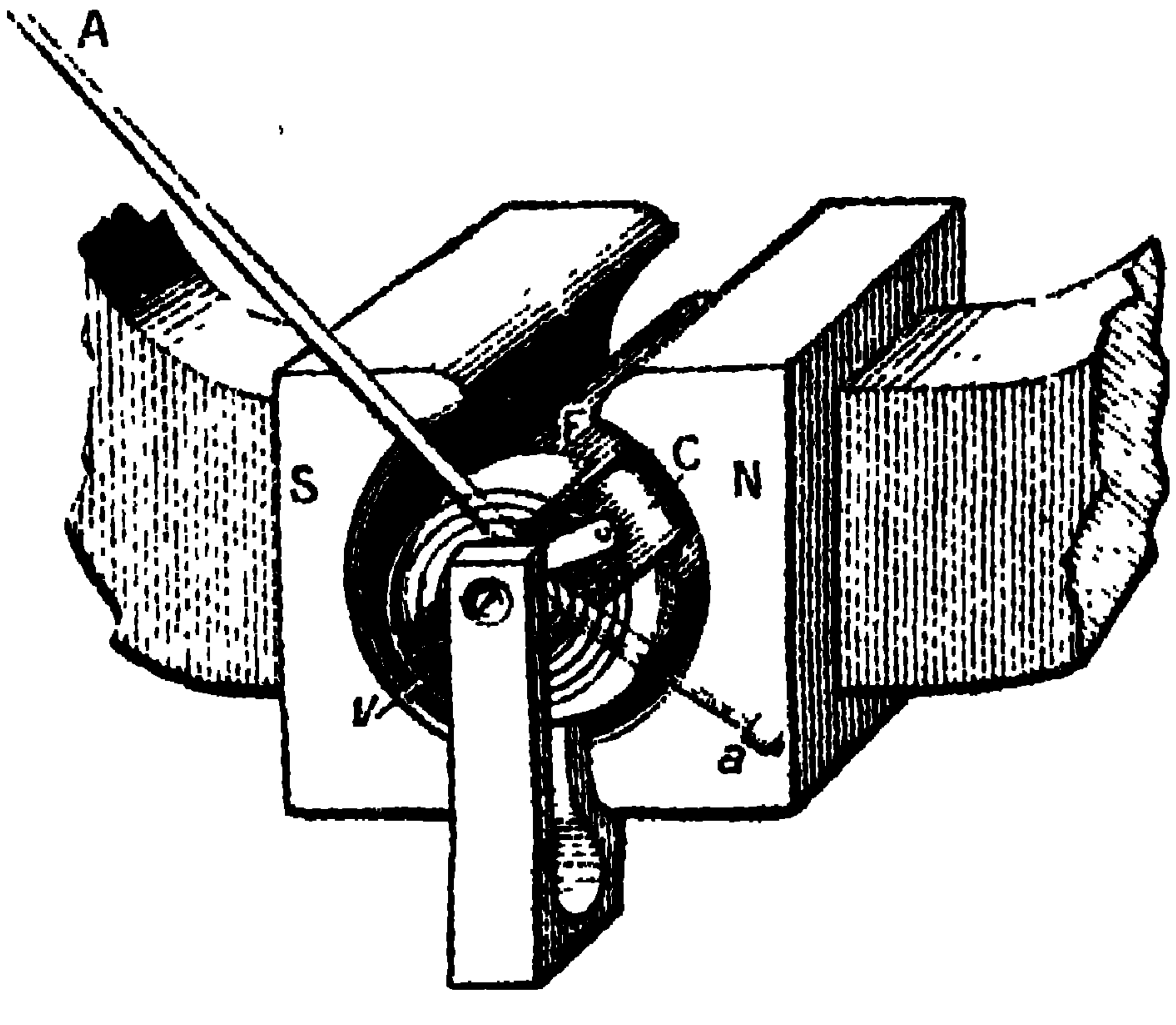

আম্পিয়ারমিটারের ভিতরের অবস্থা

কলটা একটা ঘড়ির মতো আবরণে ঢাকা থাকে। দেখ, "S N"-চিহ্নিত চুম্বকের মাঝে "C"-চিহ্নিত বেষ্টনী রহিয়াছে। "V"-চিহ্নিত স্প্রিঙ্ ইহাকে চাপিয়া রাখিয়া বিদ্যুৎ চালায় এবং যাহাতে বেষ্টনী সহজে ঘুরিয়া বেড়ায়, যন্ত্রে তাহার সুব্যবস্থা আছে। বেষ্টনীর কাছে "f"-চিহ্নিত একটি কোমল লোহার

চোঙ্‌ রহিয়াছে। ইহা চুম্বকের বল-রেখাগুলিকে দূরে না ছড়াইয়া বেষ্টনীর কাছে সংহত রাখে। তার পরে a-চিহ্নিত অংশ দিয়া যেমনি বিদ্যুৎ যায়, অমনি তাহা ঘুরিয়া দাঁড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বেষ্টনীর গায়ের

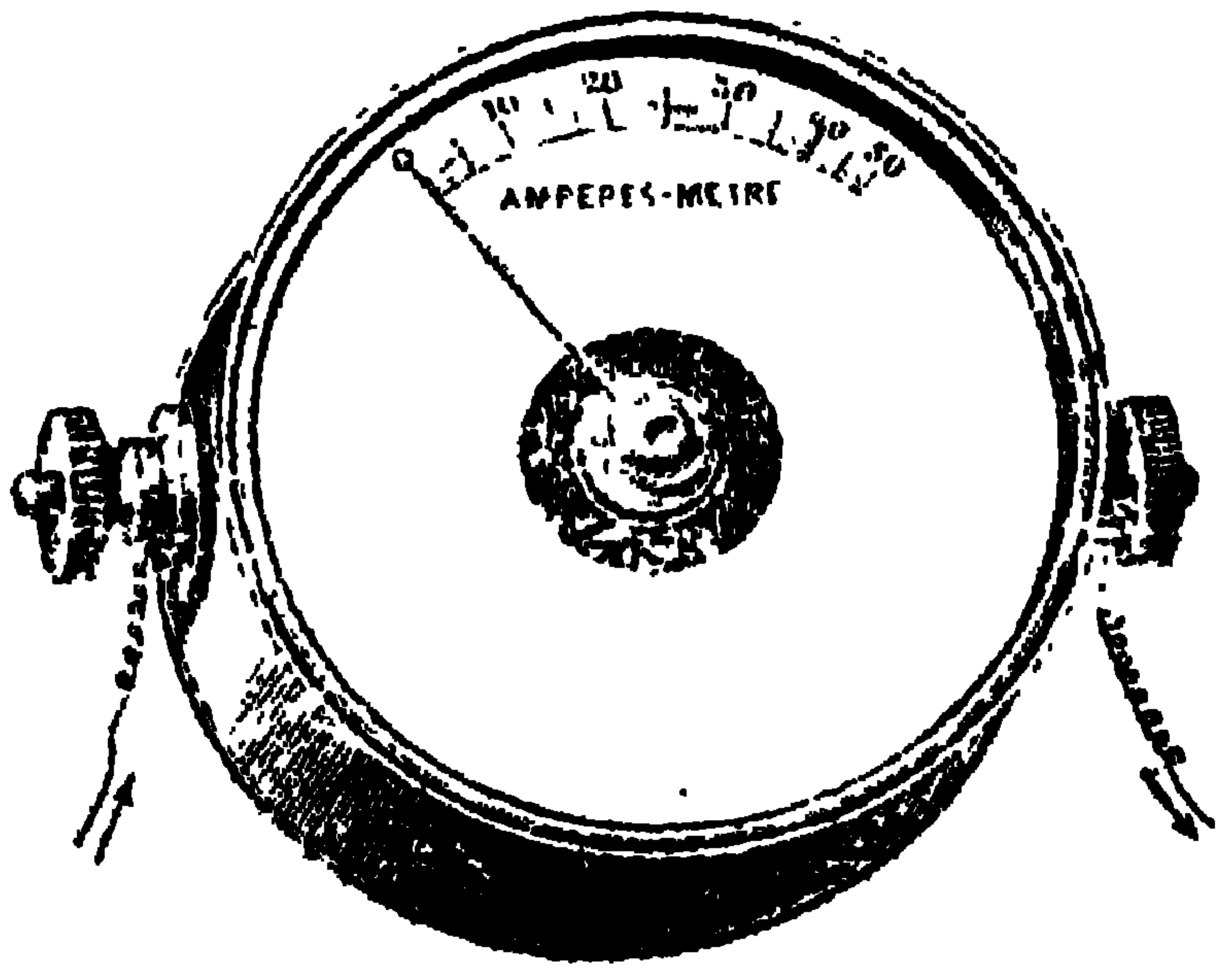

আম্পিয়ার মিটার

A-চিহ্নিত লম্বা কাঁটা সচল হইয়া পড়ে। আম্পিয়ার-মিটারের বাহিরে যে ০, ১০, ২০ ইত্যাদি অঙ্ক লেখা রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন্‌ অঙ্কের কাছে কাঁটা ঠেকিল, দেখিয়া তারের ভিতরকার বিদ্যুতের পরিমাণ কত আম্পিয়ার হইল, জানা যায়। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, মূল তারের সমস্ত বিদ্যুৎই আম্পিয়ার-মিটারের ভিতরে ঘুরিয়া বাহিরে আসে। কিন্তু তাহা

নয়। যন্ত্রে একটা খুব মোটা তার লাগানো থাকে। তারপরে ইহার সঙ্গে যে দুটা সরু তার লাগানো থাকে, তাহারি ভিতর দিয়া বেষ্টনীতে সমস্ত বিদ্যুতের অতি সামান্য অংশ, হয়ত $\frac{1}{1000}$ ভাগ মাত্র যায়। তোমরা জানো, যে-পথে বাধা কম, বিদ্যুৎ সেই পথেই চলে। কাজেই, মিটারকে যখন মূল তারের সঙ্গে লাগানো যায়, তখন তাহার প্রায় ষোল আনা বিদ্যুৎই মিটারের মোটা তার দিয়া চলিতে থাকে,—বেশি বাধা ভেদ করিয়া যে-একটু বিদ্যুৎ বেষ্টনীর মধ্যে যায়, তাহাই মিটারের কাঁটাকে নাড়ায়। এই ব্যবস্থা থাকায় মিটার লাগাইলে মূল তারের বিদ্যুৎ কমে না। অথচ বাহিরের বিদ্যুতের কত অংশ মিটারের ভিতরে গেল, জানিয়া সমস্ত বিদ্যুতের পরিমাণ ঠিক্ করা যায়।

কোনো বিদ্যুৎ-প্রবাহের ভোল্‌ট্ অর্থাৎ প্রবাহক-বল মাপিবার জন্য যে-যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহাকে ভোল্‌ট্‌মিটার (Voltmeter) নাম দেওয়া হইয়াছে। এই যন্ত্রের গঠন ও কাজ সেই সচল বেষ্টনী গ্যাল্‌ভ্যানো মিটারের মতো। তফাতের মধ্যে এই যে, ভোল্‌ট্-মিটারের বেষ্টনী খুব লম্বা সরু তার দিয়া তৈয়ারি থাকে। কাজেই, পথে বাধা পাইয়া এই যন্ত্রের ভিতর

দিয়া অতি-অল্পই বিদ্যুৎ চলে। যে মূল তারের প্রবাহক-বল মাপা হয়, তাহার যে-কোনো দুই অংশকে সরু তার দিয়া এই যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত রাখা হইয়া থাকে। ইহাতে সেই দুই জায়গার বৈদ্যুত চাপের অন্তর অর্থাৎ প্রবাহক-বল যন্ত্রের কাঁটার বিচলন দেখিয়া ধরা পড়ে।

যে মূল তার দিয়া ব্যাটারি বা ডাইনামোর বিদ্যুৎ চলিতেছে, তাহাকে কি-রকমে আম্পিয়ারমিটার ও ভোল্‌ট্‌মিটার লাগাইয়া বিদ্যুতের পরিমাণ ও তাহার

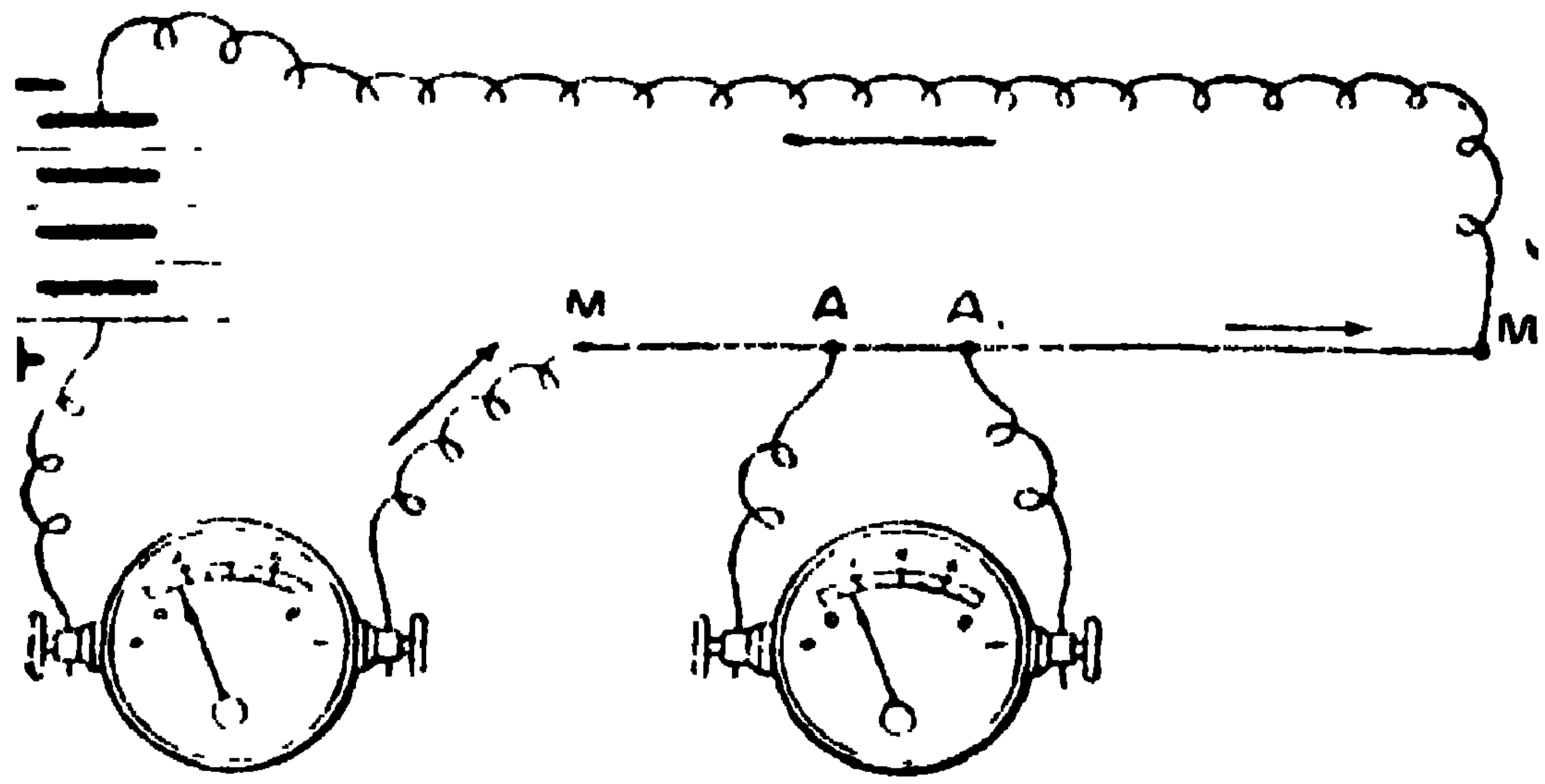

আম্পিয়ারমিটার ও ভোল্‌ট্‌মিটার লাগাইবার প্রণালী

প্রবাহক-বল মাপা হইয়া থাকে, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। দেখ, আম্পিয়ারমিটার মূল তারের সঙ্গেই আঁটা আছে। ইহার ভিতরে যে-একটা মোটা তার আছে, তাহা দিয়া মূল তারের অধিকাংশ বিদ্যুৎই

অবাধে চলিয়া যায়। তাই অ্যাম্পিয়ারমিটার লাগাইলে বিদ্যুৎ বাধা পায় না। কিন্তু ভোল্ট্‌মিটার লাগানো আছে মূল তারের সঙ্গে সরু তার জুড়িয়া। তা'ছাড়া উহার ভিতরেও সরু তারের বেষ্টনী আছে। কাজেই, যন্ত্রে বাধা দেয় অনেক। এই কারণে যন্ত্রের ভিতর দিয়া অতি-অল্প বিদ্যুৎ যায় বলিয়া মূল তারের বিদ্যুতের পরিমাণ কমে না। অর্থাৎ A A^1 অংশ দিয়া আগে যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ যাইতেছিল, এখনো ঠিক্ সেই পরিমাণেই বিদ্যুৎ চলিতে থাকে, অথচ A এবং A^1 বিন্দু দুটির মধ্যের প্রবাহক-বল যন্ত্রের কাঁটায় প্রকাশ পায়।

বৈদ্যুত-চুম্বক ও টেলিগ্রাফ্

ইস্পাতের উপরে রেশম-মোড়া তার জড়াইয়া সেই তারের ভিতরে বিদ্যুৎ চালাইতে থাকিলে, ইস্পাত চুম্বকের গুণ পায়,—ইহা তোমরা আগে দেখিয়াছ। তা'ছাড়া রেশম-মোড়া তারের বেষ্টনীর মধ্যে কোমল লোহা রাখিয়া তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে থাকিলে যে, লোহা অস্থায়ী চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়, তাহাও তোমরা আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ। বেষ্টনীতে যতক্ষণ বিদ্যুৎ চলে, কেবল ততক্ষণই লোহাতে চুম্বক-শক্তি থাকে। যেই বিদ্যুৎ চলা বন্ধ হয়, অমনি লোহা সেই শক্তি হারায়। এই রকম অস্থায়ী চুম্বককেই বৈদ্যুত-চুম্বক (Electro-magnet) বলা হয়। বৈদ্যুত-চুম্বক দিয়া কি-রকমে ইলেক্‌ট্রিক্ বেল্ বাজে, ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। তা'ছাড়া টেলিগ্রাফের কাজও বৈদ্যুত-চুম্বক দিয়া চলে। ইহার কথা তোমাদিগকে এখন বলিব।

এখানে যে দুখানি ছবি দেওয়া হইল, তাহা ভালো করিয়া দেখ। প্রথম ছবিখানিতে কেবল একটি বেষ্টনী

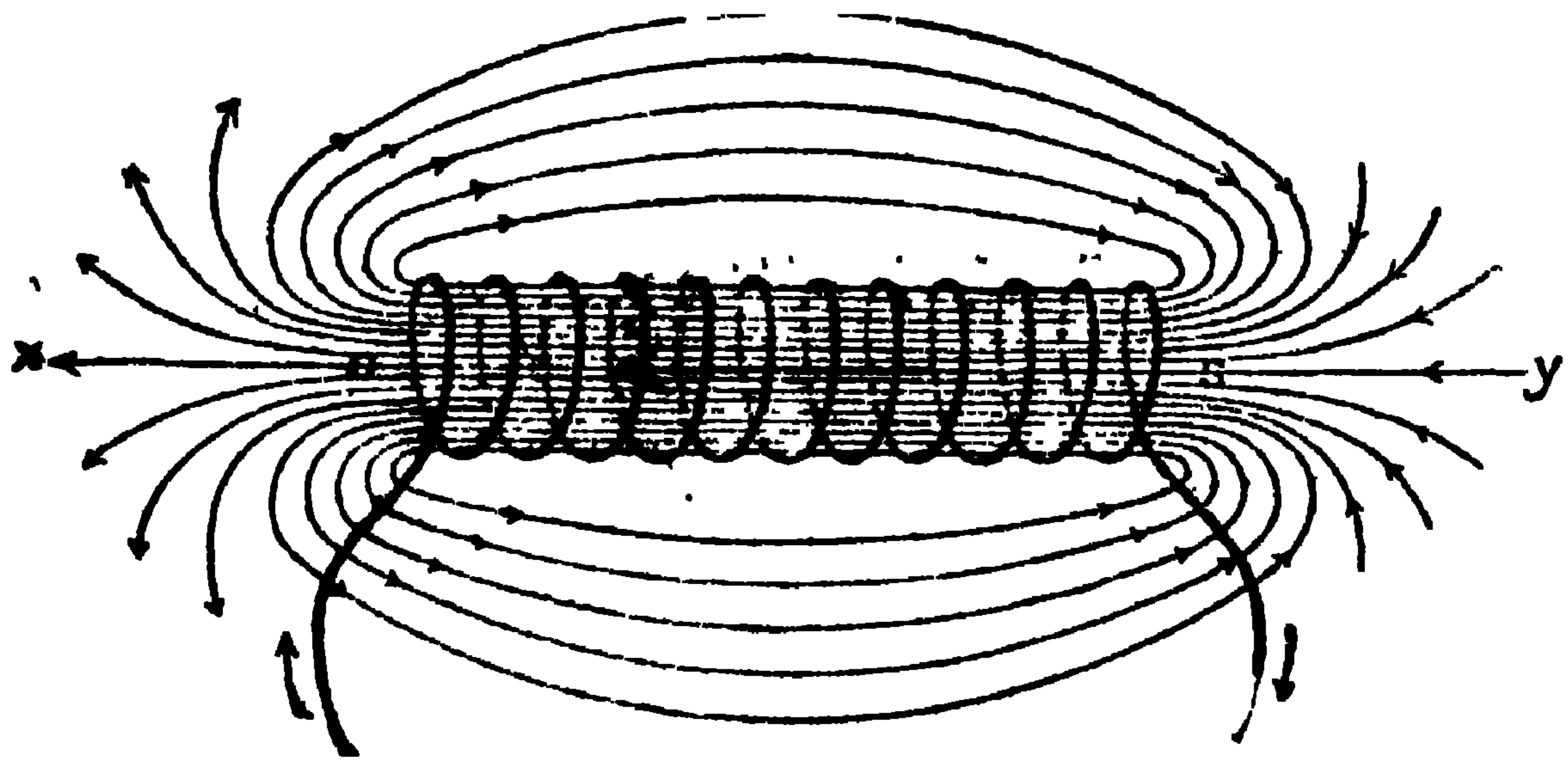

ফাঁকা বেষ্টনীর বল-রেখা

আঁকা আছে। ইহার রেশম-মোড়া তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে। তাই ইহার ভিতরে কতকগুলি বল-রেখা উৎপন্ন হইয়া বেষ্টনীর এক প্রান্তকে উত্তর-

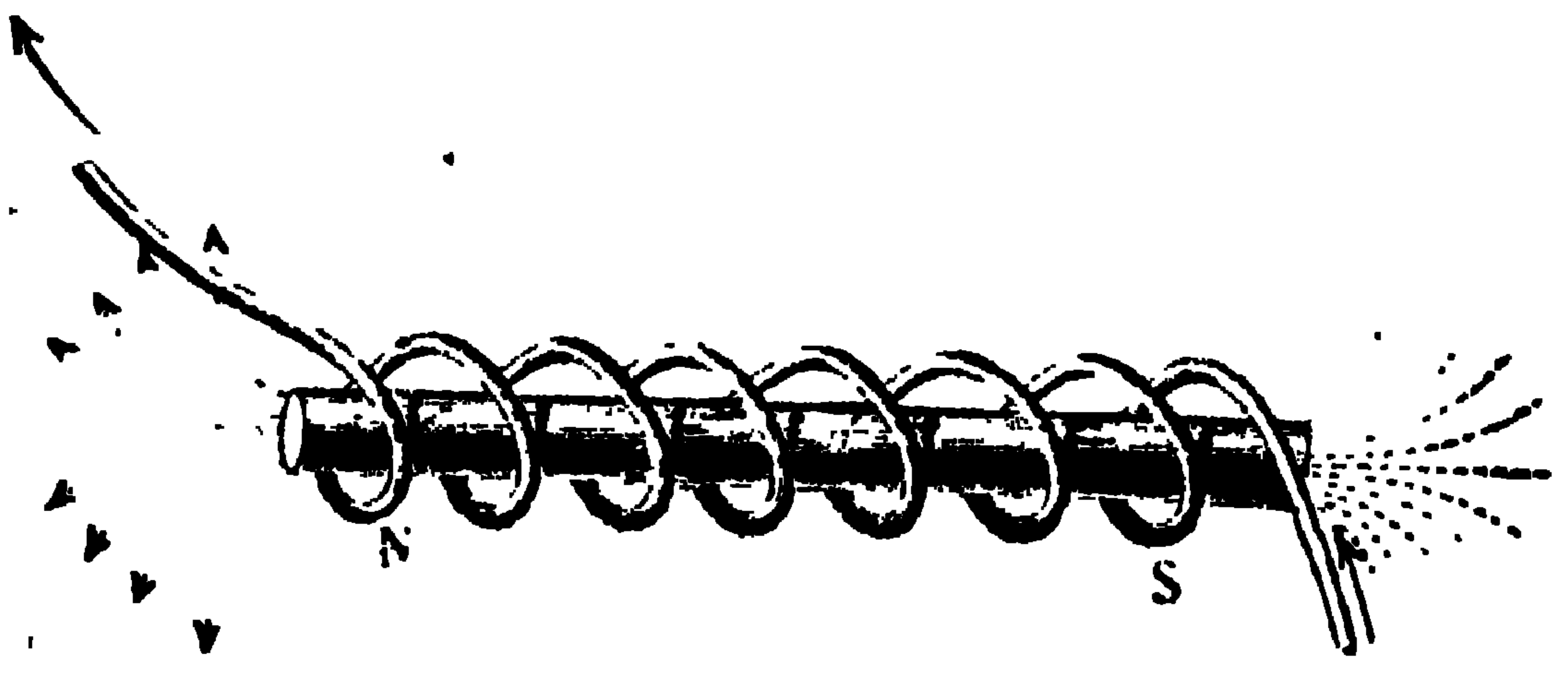

লোহাযুক্ত বেষ্টনীর বল-রেখা

মেরু এবং অপর প্রান্তকে দক্ষিণ-মেরু করিয়াছে।

এই বেষ্টনীরই মধ্যে একটি কোমল লোহার দাণ্ডা রাখিলে কি হয়, তাহা পরের ছবিখানিতে আঁকিয়া দিয়াছি। দাণ্ডা চুম্বক হইয়া পড়িয়াছে; তাই শূন্য বেষ্টনীর চেয়ে লোহাযুক্ত বেষ্টনীতে অনেক বল-রেখা দেখা যাইতেছে। এখন তোমরা যদি বেষ্টনীর তারে বিদ্যুৎ যাওয়া বন্ধ কর, তাহা হইলে লোহা ও বেষ্টনী চুম্বক-শক্তি হারাইবে। কাজেই, এই অবস্থায় তাহাতে একটি বল-রেখারও সন্ধান মিলিবে না।

এইবারে টেলিগ্রাফের তার দিয়া কি-রকমে বিদ্যুতের সাহায্যে সঙ্কেত চলে, তাহার মোটামুটি ব্যাপারটা তোমাদের বলিব। পরপৃষ্ঠার ছবিখানি দেখ। ইহাতে G একটি ব্যাটারি। ব্যাটারির এক প্রান্তের তার P ধাতু-ফলক দিয়া মাটিতে পোঁতা আছে। অন্য প্রান্ত খোলা রহিয়াছে। K আর একটা ধাতু-ফলক। B জায়গায় স্প্রিঙ্ লাগানো আছে, ইচ্ছা করিলেই K-কে টিপিয়া ধরিলে তাহাকে ব্যাটারির মুক্ত প্রান্তের সঙ্গে লাগানো যায়। B C D E একটা খুব লম্বা ধাতুর তার। C এবং D-এর মধ্যেকার দূরত্ব পঞ্চাশ, ষাট বা দুই-চারি শত মাইল হইলেও ক্ষতি নাই। ছবির ১নং ষ্টেশনের সঙ্গে এই তারটি ২নং

ষ্টেশনকে সংযুক্ত রাখিয়াছে। ২নং ষ্টেশনের A-চিহ্নিত অংশটি একটা রেশম-মোড়া তারের বেষ্টনী। ইহার মধ্যে একটা কোমল লোহার দাণ্ডা আছে। এই বেষ্টনীর তারের এক প্রান্ত O ধাতু-ফলক দিয়া মাটিতে

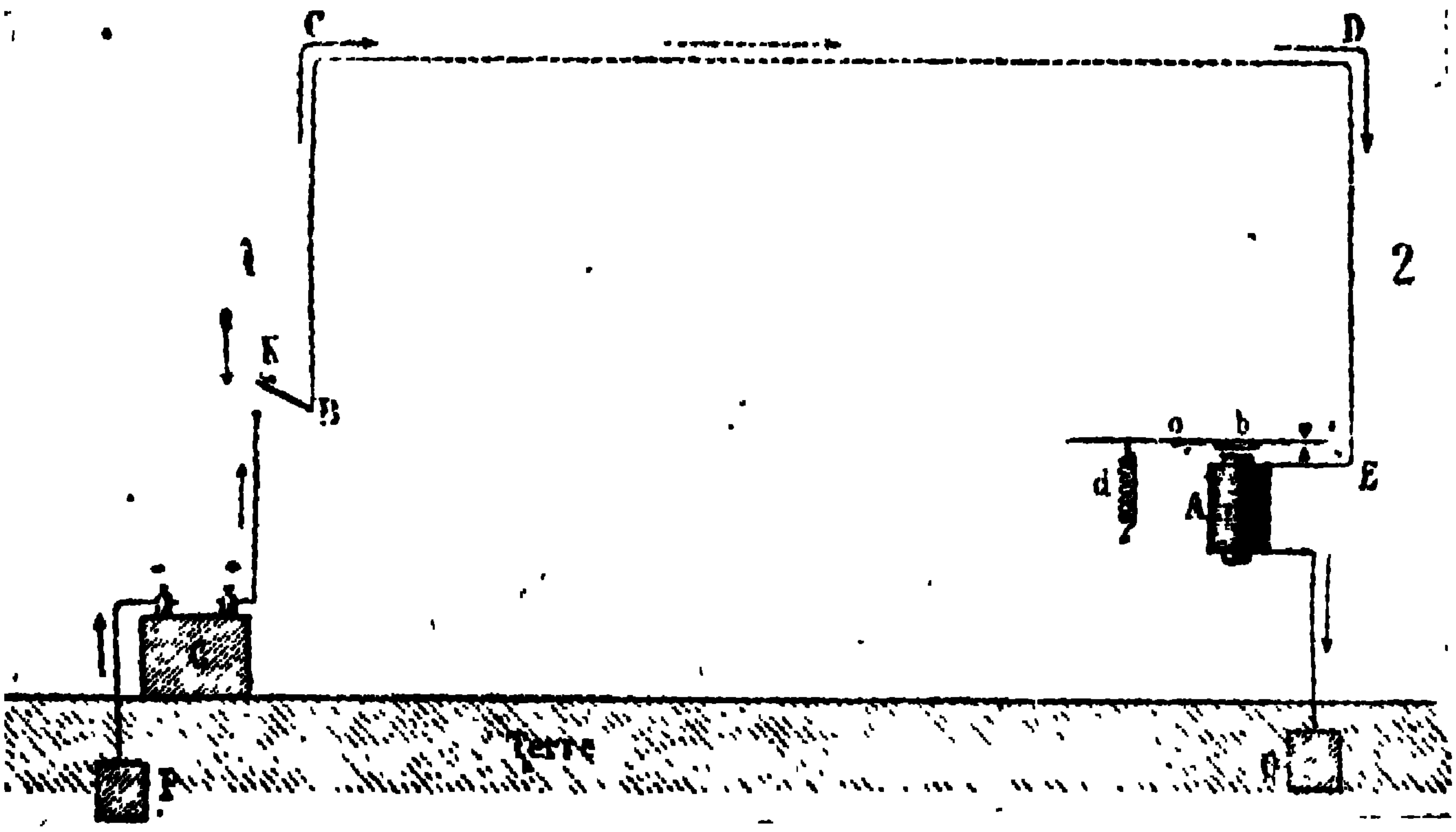

দুই ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ প্রেরণের প্রণালী

পোঁতা আছে। অন্য প্রান্ত B C D E এই লাইনের তারের সঙ্গে E জায়গায় সংযুক্ত রহিয়াছে। A বেষ্টনীর উপরকার b-চিহ্নিত অংশটি একটি কোমল লোহার পাত। d-চিহ্নিত স্প্রিঙ্ তাহাকে ঠেলিয়া বেষ্টনী হইতে দূরে রাখিয়াছে।

এখন মনে কর, ১নং ষ্টেশনের K-চিহ্নিত চাবিটিকে টিপিয়া আমরা লাইনের তারের সঙ্গে ব্যাটারির মুক্ত

প্রান্ত সংযুক্ত করিলাম। এই অবস্থায় কি ঘটিবে, বলা যায় নাকি? ব্যাটারির বিদ্যুৎ K B C D E এই পথে চলিয়া ২নং ষ্টেশনের বেষ্টনীর তারের ভিতর দিয়া চলিবে এবং তার পরে O-এ পৌঁছিয়া মাটির ভিতর দিয়া P-এ আসিবে। কিন্তু P, ব্যাটারির অপর প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে। কাজেই, K জায়গায় ফাঁক থাকায় যে-বিদ্যুৎ আগে চলিবার পথ পাইতেছিল না, এখন তাহাই দুই চারি শত মাইল লম্বা লাইনের তার ও মাটির ভিতর দিয়া চক্রাকারে চলিতে থাকিবে। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, মাটির ভিতরে তার নাই, তবে কি-রকমে O হইতে P-এ বিদ্যুৎ পৌঁছিবে। মনে রাখিয়ো, ভিজা মাটি বিদ্যুতের সুপরিচালক। তাই বিদ্যুৎ, P হইতে O-এ মাটির তলা দিয়া আপনিই চলে।

যাহা হউক, K চাবিকে টিপিয়া লাইন ও মাটির তলা দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে ২নং ষ্টেশনে কি ঘটে, দেখা যাউক। এখন A বেষ্টনী দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে। কাজেই, উহার ভিতরকার কোমল লোহা চুম্বকে পরিণত হইবে এবং তাহা b-চিহ্নিত লোহাকে জোরে গায়ে টানিয়া "টরে" করিয়া শব্দ করিবে।

ইহার পর K চাবিকে ব্যাটারির প্রান্ত হইতে বিচ্ছিন্ন কর। এখন কি হইবে, বলা যায় না কি? এই অবস্থায় লাইনের এবং বেষ্টনীর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিবে না। কাজেই K চাবিকে টিপিয়া ধরায় বেষ্টনীর ভিতরকার যে কোমল লোহা চুম্বক-শক্তি পাইয়াছিল, এখন সেই শক্তি হারাইয়া উহা সাধারণ লোহা হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাতে b-চিহ্নিত লোহার ফলক মুক্তি পাইয়া স্প্রিঙের জোরে উপরে উঠিবে। সুতরাং দেখ, যতবার ১নং ষ্টেশনের K চাবিকে টিপিয়া ছাড়া যাইবে, ২নং ষ্টেশনের A-চিহ্নিত বেষ্টনী লোহা চুম্বক হইয়া ঠিক্ তত বার b-কে টানিবে এবং প্রত্যেক বারে টরে টরে শব্দ করিবে। K চাবিকে ব্যাটারির তারের প্রান্তে বেশিক্ষণ ছুঁইয়া রাখো, শব্দটা দীর্ঘ হইয়া "টক্কা" এই রকম শুনাইবে। তাহা হইলে দেখ, K চাবিকে অল্পক্ষণের জন্য টিপিলে "টরে" শব্দ শুনা যায়, এবং দীর্ঘকাল টিপিলে "টক্কা" শব্দ কানে আসে। রেল বা পোষ্ট-অফিসের টেলিগ্রাফ্ মাষ্টার, এই রকম ছোটো-বড় "টরে টক্কা" শব্দ লইয়া এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে সঙ্কেতে খবর পাঠাইয়া থাকেন। তোমরা একবার টেলিগ্রাফ্ অফিসে গিয়া দেখিয়ো, সংবাদ

গ্রহণের সময়ে টেলিগ্রাফের কলে ক্রমাগত "টরে-টক্কা" শব্দ হইতেছে। ২ নং ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ্ মাষ্টার এই শব্দ শুনিয়াই ১ নং ষ্টেশন হইতে কি খবর আসিতেছে বুঝিয়া লন।

"টক্কা-টরে" এই ছোটো-বড় শব্দে খবর জানিয়া লওয়া কঠিন নয়। আঁকা-বাঁকা লাইন টানিয়া আমরা ইংরেজি বাংলা অক্ষর লিখি। দুইটা হেলানো সরল রেখার মাঝে আর একটা সরল রেখা টানিলে ইংরাজি A অক্ষরটা হয়। তেমনি দুটা বাঁকানো রেখা এবং এবং একটা সরল রেখায় B অক্ষরটা লেখা যায়। যে-সব দেশে ইংরাজি ভাষার প্রচলন আছে সেখানকার লোকে A, B, C, D ইত্যাদির এই রকম চেহারা দেখিয়া কোন্ কোন্ অক্ষর লেখা আছে বুঝিয়া লয়। রেখার যোগে যেমন অক্ষর লেখা হয়, তেমনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র "টরে-টক্কা" এই দুই শব্দের যোগে অক্ষর রচনা করা হয়। আমরা চোখে দেখিয়া অক্ষর বুঝিয়া লই, টেলিগ্রাফ্ মাষ্টার তাহাই শব্দ শুনিয়া বুঝিয়া লন। ছোটো বড় শব্দের কি-রকম যোগে কোন্ কোন্ অক্ষর হয়, নীচে তাহা লিখিয়া দিলাম। মনে করা যাউক, ইংরাজি "ফুলষ্টপ" যেন টরেকে" এবং হাইফেনের

মতো লম্বা রেখা যেন দীর্ঘ শব্দ "টক্কা"কে প্রকাশ করিতেছে। এই রকমে,—

∘ —	অর্থাৎ টরে টক্কা	=	A
— ∘ ∘ ∘	টক্কা টরে টরে টরে	=	B
— ∘ — ∘	টক্কা টরে টক্কা টরে	=	C
— ∘ ∘	টক্কা টরে টরে	=	D
∘	টরে	=	E
• ∘ — ∘	টরে টরে টক্কা টরে	=	F
— — ∘	টক্কা টক্কা টরে	=	G
∘ ∘ ∘ ∘	টরে টরে টরে টরে	=	H
∘ ∘	টরে টরে	=	I
∘ — — —	টরে টক্কা টক্কা টক্কা	=	J
— ∘ —	টক্কা টরে টক্কা	=	K
∘ — ∘ ∘	টরে টক্কা টরে টরে	=	L
— —	টক্কা টক্কা	=	M
— ∘	টক্কা টরে	=	N
— — —	টক্কা টক্কা টক্কা	=	O
∘ — — ∘	টরে টক্কা টক্কা টরে	=	P
- — ∘ —	টক্কা টক্কা টরে.টক্কা	=	Q
∘ — ∘	টরে টক্কা টরে	=	R

∘ ∘ ∘	টরে টরে টরে	=	S
—	টক্কা	=	T
∘ ∘ —	টরে টরে টক্কা	=	U
∘ ∘ ∘ —	টরে টরে টরে টক্কা	=	V
∘ — —	টরে টক্কা টক্কা	=	W
— ∘ ∘ —	টক্কা টরে টরে টক্কা	=	X
— ∘ — —	টক্কা টরে টক্কা টক্কা	=	Y
— — ∘ ∘	টক্কা টক্কা টরে টরে	=	Z

ইংরাজি A, B, C ইত্যাদি অক্ষরকে টেলিগ্রাফের শব্দে প্রকাশ করার ইহাই বাঁধা নিয়ম। সুতরাং যদি ইংরাজি COME এই কথাটিকে ১নং ষ্টেশন হইতে পাঁচ শত বা হাজার মাইল দূরের ২নং ষ্টেশনে পাঠাইতে চাই, তাহা হইলে ১নং ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ্ মাষ্টার কখনো অল্পক্ষণ এবং কখনো বা বেশিক্ষণ টিপিয়া নীচের মতো টক্কা-টরে শব্দ করিবেন,

— ∘ — ∘	— — —	— —	∘
C	O	M	E

এই শব্দ শুনিয়া ২নং ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ্ মাষ্টারের COME এই কথাটি বুঝিয়া লইতে একটুও বিলম্ব হইবে না। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, টেলিগ্রাফের

তারের ভিতর দিয়া দূরে সঙ্কেত যাইতে না জানি কত সময় লয়। কিন্তু সময় অতি-অল্পই লাগে। বিদ্যুৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬৩২৬ মাইল বেগে চলে। সুতরাং এখান হইতে কোনো সঙ্কেতকে ইংলণ্ড বা আমেরিকার মতো দূরদেশে পাঠাইতে এক নিমেষও সময় লাগে না। ইংরাজি ও বাংলা অক্ষর কে প্রথমে রচনা করিয়াছিলেন জানি না। ইংরেজি অক্ষরের যে টেলিগ্রাফ্ সঙ্কেতের কথা বলিলাম, তাহা মর্স (Morse) নামে একজন বৈজ্ঞানিক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখন মর্সের সঙ্কেতেই টেলিগ্রাফের কাজ চলিতেছে।

পরপৃষ্ঠায় যে-ছবিটি আঁকিয়া দিলাম, তাহা দেখিলে A এবং B দুই ষ্টেশনে কি-রকম টেলিগ্রাফের কল থাকে বুঝা যাইবে। ছবিতে দেখ, দুই ষ্টেশনেই বৈদ্যুত-চুম্বক এবং ব্যাটারি আছে। ব্যাটারির এক প্রান্ত মাটির সঙ্গে এবং অপর প্রান্ত b এবং d-চিহ্নিত চাবির সঙ্গে যোগ করা রহিয়াছে। মনে কর, আমরা যেন A ষ্টেশন হইতে B ষ্টেশনে সঙ্কেত পাঠাইতেছি। b চিহ্নিত চাবি, P ব্যাটারির তারের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। কাজেই, ব্যাটারির বিদ্যুৎ লাইনের তার দিয়া

এবং d-এর ভিতর দিয়া মাটিতে চলিয়া যাইবে। তার পরে তাহা মাটির তলায় তলায় চলিয়া আবার A ষ্টেশনের ব্যাটারিতে পৌঁছিবে। যতক্ষণ A ষ্টেশনের b চাবি টেপা থাকিবে, ততক্ষণ P-এর বিদ্যুৎ এই রকম চক্রাকারেই চলিতে থাকিবে। ইহার ফলে কি ঘটিবে,

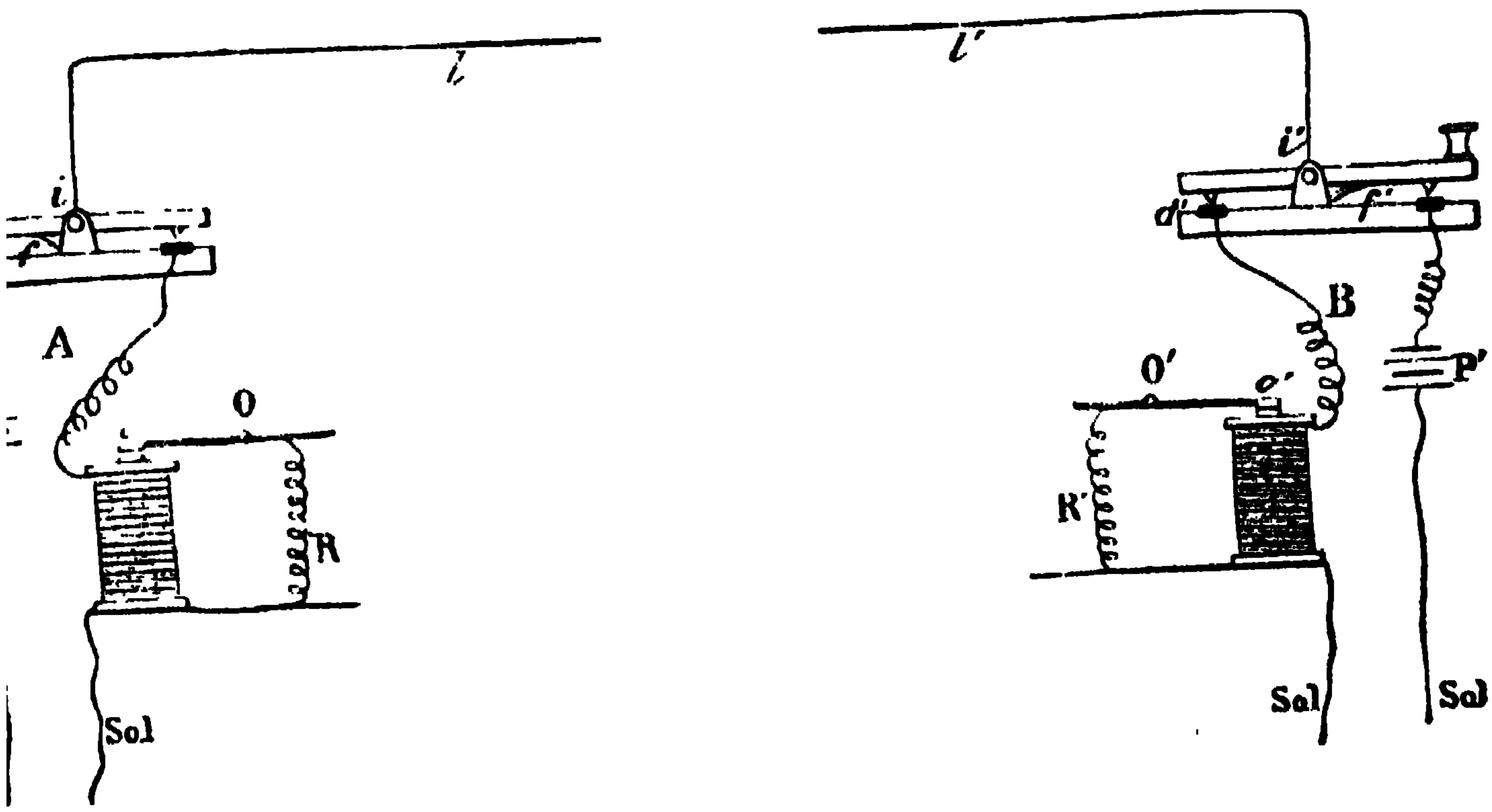

টেলিগ্রাফের কল

বলা যায় না কি? বিদ্যুৎ B ষ্টেশনের বৈদ্যুত-চুম্বকের বেষ্টনীর ভিতরে চলিয়া মাটিতে যাইতেছে। কাজেই, ঐ বেষ্টনীর টানে B ষ্টেশনের কলের C^1 লোহার ফলকটি বৈদ্যুত-চুম্বকের গায়ে ঠেকিয়া শব্দ করিবে। A ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ্ মাষ্টার যত বার চাবির b-চিহ্নিত

অংশকে থাকিয়া থাকিয়া টিপিবেন, ততবারই "টরে-টক্কা" শব্দ হইতে থাকিবে। তার পরে B ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ্ মাষ্টার সেই শব্দ শুনিয়া A ষ্টেশনের সঙ্কেত জানিয়া লইতে পারিবেন। B ষ্টেশন হইতে যখন A ষ্টেশনে খবর পাঠানো হয়, তখন ঠিক্ এই রকমেই কল চালানো হয়। অর্থাৎ টেলিগ্রাফ্ মাষ্টার তখন B ষ্টেশনের চাবিটাকে টিপিয়া P^1 ব্যাটারির তারের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। ইহাতে P^1 ব্যাটারির বিদ্যুত চলিয়া A ষ্টেশনের বৈদ্যুত-চুম্বককে উত্তেজিত করে। তার পরে সেখানকার C লোহার ফলককে ঐ চুম্বকই টানিয়া "টরে-টক্কা" শব্দ করিতে থাকে। দেখ, এই যন্ত্রে টেলিগ্রাফের সঙ্কেত পাঠাইবার কেমন সুব্যবস্থা আছে।

টেলিগ্রাফের লাইনের তার কি-রকমে খাম্বায় লাগাইতে হয়, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু সকল সময়েই যে, তার খাম্বায় লাগানো থাকে, তাহা নয়। মাটির তলা ও সমুদ্রের তলা দিয়াও টেলিগ্রাফের তার চালানো হয়। মাটি বিদ্যুতের পরিচালক, তাই তামার তারকে খুব ভালো করিয়া গটাপার্চা মুড়িয়া মাটিতে পোতা হয়। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি দূরদেশে যে-তারে টেলিগ্রাফ্-সঙ্কেত

যায়, তাহা সমুদ্রের তলায় ফেলিয়া রাখা হয়। সমুদ্র অতি ভয়ানক জায়গা। সাধারণ তারকে সমুদ্রে ফেলিয়া রাখিলে জল-জন্তুদের উৎপাতে তাহা দু'-দিনেই নষ্ট হয়। তা'ছাড়া সমুদ্র-জলে যে-লবণ থাকে, তাহা তারে এমন মরিচা ধরায় যে, অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলি ক্ষয় পায়। তাই রেল-লাইনে তোমরা যে-তার দেখিতে পাও, সেগুলিকে সমুদ্রের তলায় ফেলিলে কাজ চলে না।

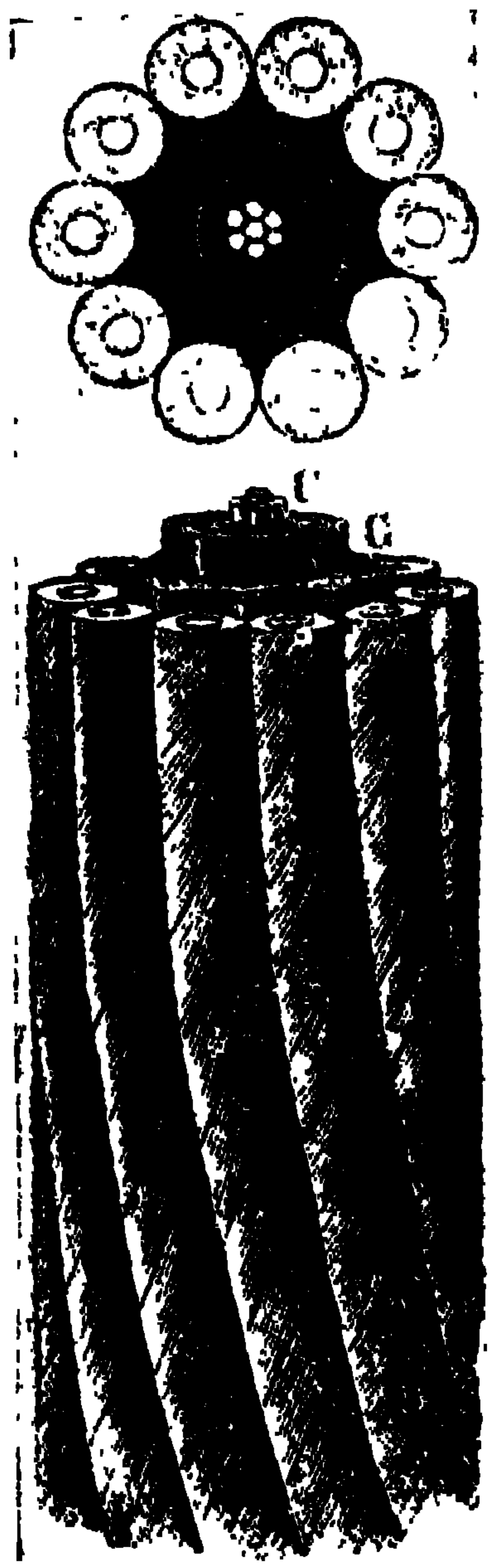

সমুদ্র-তলের বৈদ্যুত তার

এখানে সমুদ্র-তলাকার তারের একটা ছবি দিলাম। তারকে এড়োএড়ি ভাবে কাটিলে, যেরূপ দেখায়, তাহা উপরকার ছবিতে আঁকা আছে। সেই তারকেই সাধারণভাবে যেমন দেখায়, তাহা নীচেকার ছবিতে আঁকিয়া দিয়াছি। দেখ, ঠিক্ মাঝে সাতটি তার রহিয়াছে। খাঁটি তামার এই রকম সাতটি তারকে দড়ার মতো জড়াইলে যে একটি তার

হয়, তাহা দিয়াই বিদ্যুৎ যাওয়া-আসা করে। উপরে যে দড়াদড়ির মতো আবরণ দেখা যাইতেছে, তাহা অপরিচালক গটাপর্চা পিচ্ ধুনা আলকাত্‌রা ও শণের দড়ি দিয়া প্রস্তুত। এত হাঙ্গামা করিয়া ভিরতকার তার মোড়া থাকে বলিয়াই সমুদ্রের তলায় পড়িয়া থাকিয়া তারগুলি নষ্ট হয় না।

বৈদ্যুতিক প্রবাহের আবেশ

চুম্বকের কাছে লোহা রাখিলে, লোহায় চুম্বক-শক্তির আবেশ হয়। ইহা তোমরা আগে দেখিয়াছ। তা'ছাড়া বিদ্যুৎপূর্ণ কোনো জিনিষের কাছে পরিচালক জিনিষ রাখিলে তাহাতে বিপরীত বিদ্যুতের আবেশ হয়। ইহার কথাও তোমাদের আগে বলিয়াছি। কোনো চুম্বক বা বিদ্যুৎ-প্রবাহের কাছে তারের বেষ্টনী রাখিলে তাহাতে যে আপনা হইতেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের আবেশ হয়, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসর আগে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে সাহেব এই ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন। সেই বৎসরটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তোমরা আজকাল যে-সব ডাইনামো মোটর টেলিফোন প্রভৃতি দেখিতেছ, তাহা ফ্যারাডের এই আবিষ্কারের সাহায্যে নির্ম্মিত হইতেছে। দুই হাজার বা দশ হাজার বিদ্যুৎ-কোষ মিলিয়া যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে না পারে, একটা ছোটো ডাইনামোতে তাহার চেয়ে অনেক

বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে। এসিড দিয়া কোষ সাজানোর হাঙ্গামা ইহাতে নাই,—চুম্বকের বলক্ষেত্রে তারের বেষ্টনীকে ঘোরাইলেই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য আবিষ্কার! এই আবিষ্কারে পৃথিবীর যে উপকার হইতেছে, তাহা দেখিলে বোধ করি ফ্যারাডে নিজেই অবাক্ হইয়া যাইতেন।

পরপৃষ্ঠার ছবিটি দেখ। ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়। B একটা রেশম-মোড়া তারের বেষ্টনী। G-চিহ্নিত বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রে ইহার দুই প্রান্ত জোড়া আছে। N কোনো চুম্বকের উত্তর-মেরু। দেখ, এই যন্ত্র-গুলির কোনো অংশে বিদ্যুৎ-কোষ নাই এবং বিদ্যুৎও নাই। এখন তোমরা চুম্বকের ঐ উত্তর-মেরুকে তাড়াতাড়ি বেষ্টনীর কাছে আনিতে থাকিলে, একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে। এই অবস্থায় বেষ্টনীর তারে আপনিই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রকে বিচলিত করিবে। কোষ নাই, ব্যাটারি নাই,—অথচ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইল। এই রকমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়াকেই বিদ্যুতের আবেশ (Induction) বলা হয়। কিন্তু এই আবিষ্ট বিদ্যুৎ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। যেই চুম্বক স্থির হইয়া দাঁড়ায়, অমনি বেষ্টনীর বিদ্যুৎ

বন্ধ হইয়া যায়। তার পরে এই চুম্বককে বেষ্টনীর কাছ হইতে যখন তাড়াতাড়ি দূরে আনা যায়, তখন আবার সেই বেষ্টনীতেই আর এক দফা ক্ষণিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন

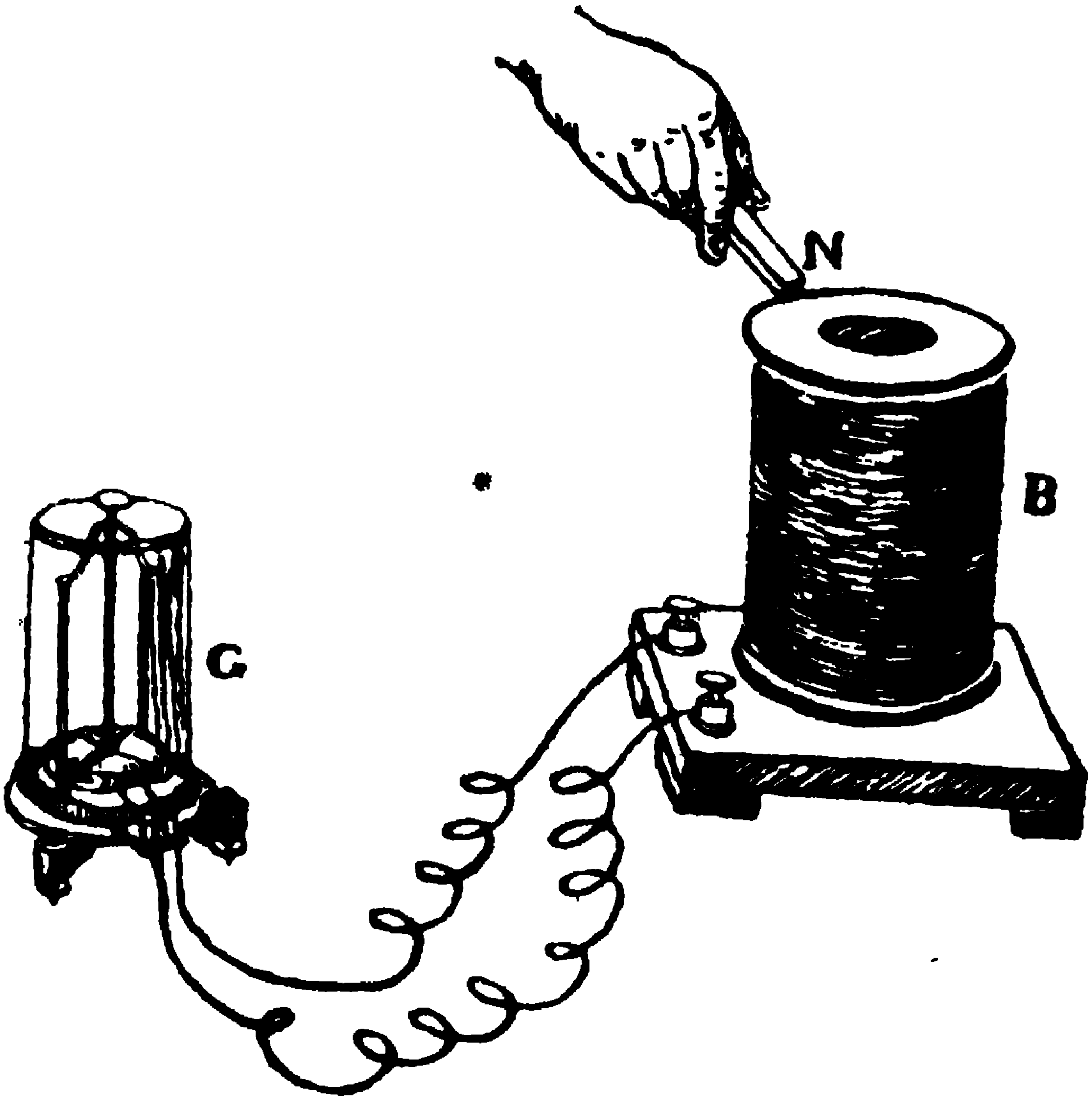

চুম্বকের সাহায্যে বিদ্যুতের আবেশ

হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বারের বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক্ একই থাকে না। অর্থাৎ চুম্বককে বেষ্টনীর কাছে আনায়, আবিষ্ট বিদ্যুৎ যে-দিক্ ধরিয়া চলিয়াছিল, চুম্বককে দূরে লওয়ায় তাহাকে ঠিক্

উল্‌টা দিকে চলিতে দেখা যাইবে। বেষ্টনীর তারে কোন্ অবস্থায় কোন্ দিক্ ধরিয়া বিদ্যুৎ চলিবে, তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখা যায়, আবার হিসাব করিয়াও বলা চলে। তোমরা মনে রাখিয়ো, কেবল ইস্পাতের স্থায়ী চুম্বককে বেষ্টনীর কাছে নড়াইলেই বেষ্টনীতে যে বিদ্যুৎ জন্মে তাহা নয়। স্থায়ী চুম্বকের চেয়ে বৈদ্যুত চুম্বকের জোর বেশি। তোমরা যদি বৈদ্যুত চুম্বক লইয়া এই পরীক্ষাটি কর, তাহা হইলে বেষ্টনীর ক্ষণিক প্রবাহ আরো সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

হিসাবের কথাটা এখানে বলিয়া রাখি। চুম্বকের উত্তর-মেরুতে যে-বিদ্যুতের-প্রবাহ কল্পনা করা যায়, তাহা কোন্ দিক্ ধরিয়া চলে, তোমাদিগকে আগে তাহার কথা অনেকবার বলিয়াছি। তাহা চলে, উত্তর-মেরুকে ঘেরিয়া ডাইন হইতে বাঁয়ে, অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে। চুম্বকের উত্তর-মেরুকে তাড়াতাড়ি কাছে আনায় বেষ্টনীতে যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ জন্মে, তাহারো গতি হয় ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে। তার পরে উত্তর-মেরুকে দূরে লইয়া গেলে বেষ্টনীতে যে-বিদ্যুৎ জন্মে, তাহার দিক্ থাকে ঘড়ির কাঁটার মতো, অর্থাৎ বাঁ হইতে ডাইনে। উত্তর-মেরুর বদলে দক্ষিণ-মেরুকে ঐ-রকমে

পরে পরে বেষ্টনীর কাছে ও দূরে লইয়া গিয়া পরীক্ষা কর। সেখানেও সেই ব্যাপার দেখিতে পাইবে। দক্ষিণ-মেরুর প্রবাহ চলে ঘড়ির কাঁটার দিক্ ধরিয়া। দক্ষিণ-মেরুকে কাছে আনায় বেষ্টনীতে যে-বিদ্যুৎ জন্মিবে, তাহার গতি হইবে ঘড়ির কাঁটার মতো বাঁ হইতে ডাইনে, এবং দূরে লইয়া যাইবার সময়ে সেই প্রবাহই উল্টাইয়া চলিবে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে। মনে রাখিয়ো, চুম্বক বা বৈদ্যুত চুম্বকের যে-মেরু দিয়া বেষ্টনীতে প্রবাহ উৎপন্ন হইল, তাহার গতিকে বাধা দিবার জন্য বেষ্টনীতে যে-পাকের বিদ্যুৎ চাই, ক্ষণকালের জন্য বেষ্টনীতে তাহারই আবেশ হয়।

যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাতের দরকার হয়, তখন তাহা দু'রকমে ঘটিতে পারে। তুমি আমার কাছে এলে দেখা হয়, এবং আমি তোমার কাছে গেলেও দেখা হয়। সেই রকম, চুম্বকের মেরুকে বেষ্টনীর কাছে আনিলে বা দূরে লইয়া গেলে যে-ফল পাওয়া যায়, চুম্বককে স্থির রাখিয়া বেষ্টনীকে চুম্বকের কাছে বা দূরে লইয়া গেলেও সেই ফল পাওয়ারই সম্ভাবনা। পরীক্ষা করিলে সত্যই ইহা দেখা যায়। বেষ্টনীকে তাড়াতাড়ি চুম্বকের কাছে আনো বা চুম্বক হইতে দূরে

লইয়া যাও, দেখিবে, বেষ্টনীতে ঠিক্ আগেকার মতোই বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে।

চুম্বককে হঠাৎ বেষ্টনীর কাছে বা দূরে লইলে, অথবা বেষ্টনীকে সেই রকমে হঠাৎ চুম্বকের নিকটবর্ত্তী করিলে বা দূরে লইয়া গেলে, তাহাতে কেন ক্ষণিক বিদ্যুৎ-প্রবাহের আবেশ হয়, ফ্যারাডেই তাহার আভাষ দিয়াছিলেন। তাঁহারি কথা অনুসারে এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, কোনো বেষ্টনীর ভিতরে যদি হঠাৎ চৌম্বক বল-রেখার সংখ্যাকে বাড়ানো বা কমানো যায়, তাহা হইলে বেষ্টনীর তারে ক্ষণিক প্রবাহের আবেশ হয়। তাঁহারা আরো বলেন, বল-রেখার সংখ্যাকে বৃদ্ধি করায় যে-প্রবাহ হয়, তাহার দিক্, সংখ্যাকে কম করায় প্রবাহের দিকের ঠিক্ উল্‌টা হইয়া পড়ে।

কথাটি বোধ করি তোমরা ভালো বুঝিতে পারিলে না। পরপৃষ্ঠায় যে দুখানি ছবি দিলাম, তাহার বাঁয়ের খানিকে দেখ। ছবির N কোনো চুম্বকের উত্তর-মেরু। দেখ N হইতে পাঁচটি বল-রেখা বাহির হইয়াছে। এখন MM বেষ্টনীকে যদি হঠাৎ N-এর কাছে আনা যায়, তাহা হইলে কি হয়, বলা যায় না কি? বেষ্টনী যতই

N-এর কাছে আসিতে থাকে, ততই বেশি বল-রেখা তাহার বেড়ের মধ্যে আসিয়া পড়ে। দেখ, প্রথমে বেষ্টনীর ভিতরে ছিল একটি বল-রেখা, তার পরে N-এর কাছে আনায় তাহাতেই আসিয়া পড়িয়াছে

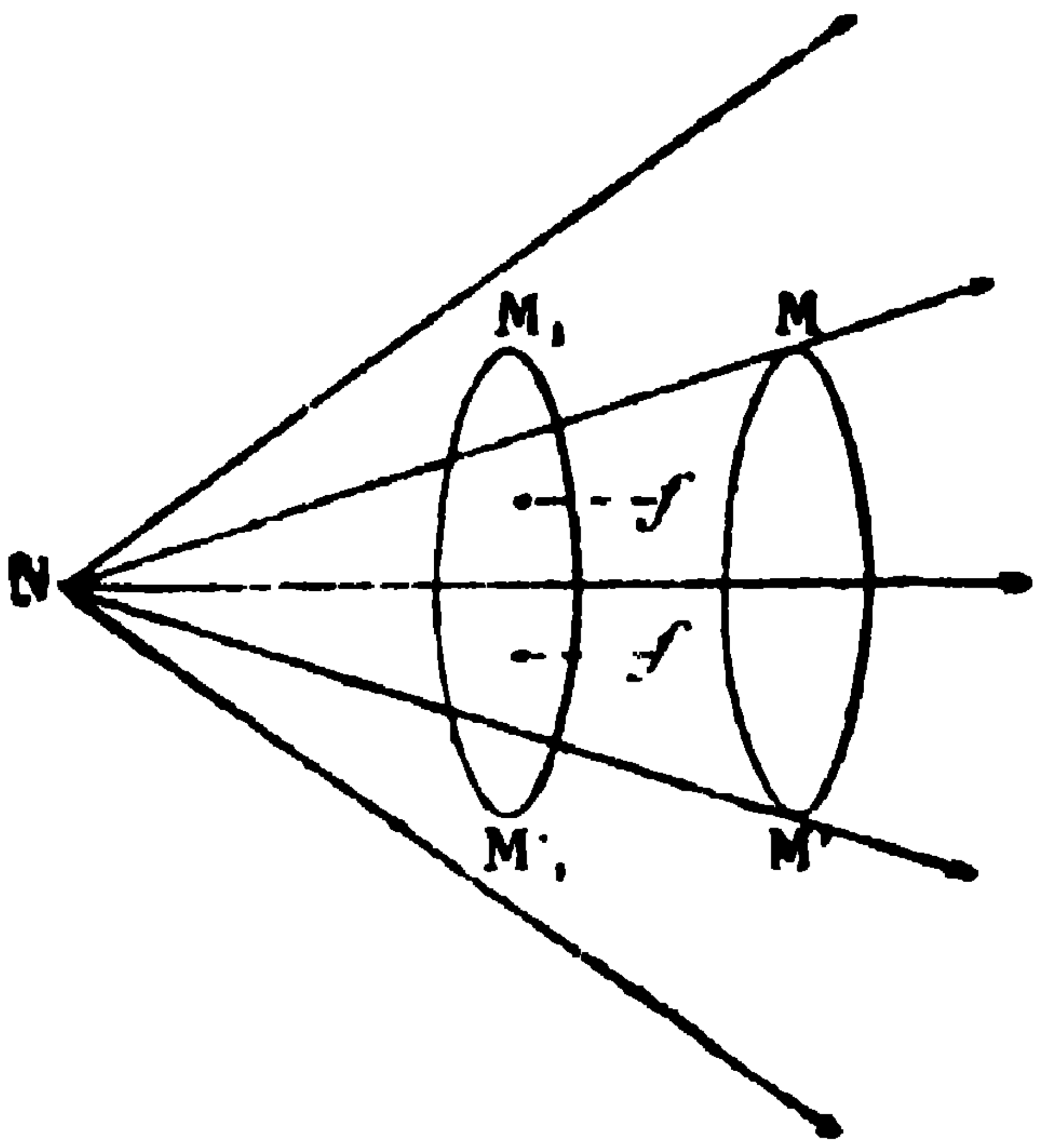

চুম্বক ও বলরেখা (১)

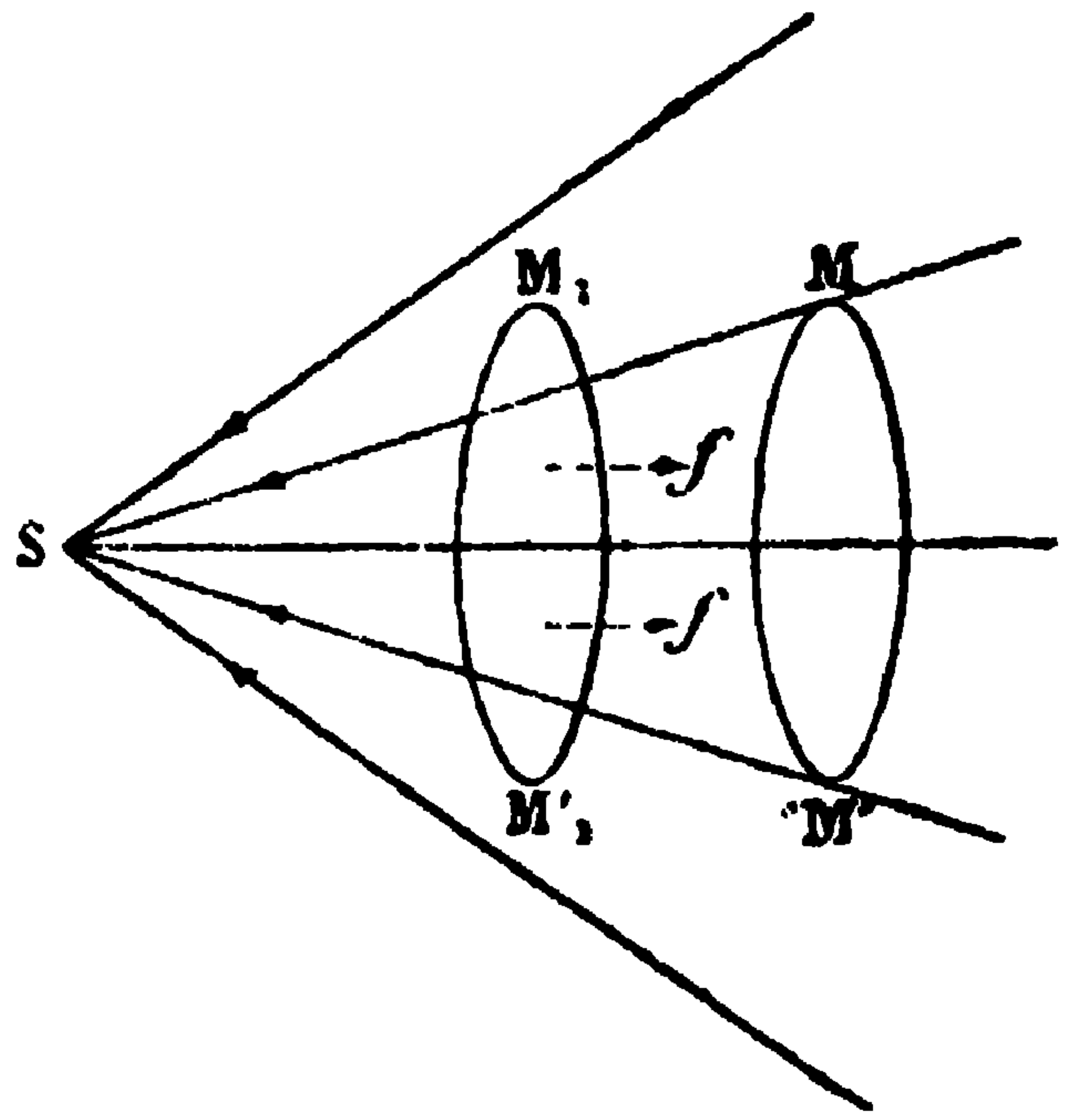

চুম্বক ও বলরেখা (২)

তিনটি রেখা। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, বেষ্টনীর ভিতরকার চৌম্বক বল-রেখার এই যে হঠাৎ বৃদ্ধি, তাহাই বেষ্টনীর তারে প্রবাহ উৎপন্ন করে।

এখন পরের ছবিখানি দেখ। ইহাতে S দক্ষিণ-মেরু হইতে পাঁচটি বলরেখা বাহির হইয়াছে, এবং এবারে MM বেষ্টনীকে দক্ষিণ-মেরু হইতে দূরে লওয়া হইতেছে। ছবিতে দেখ, বেষ্টনীকে দূরে লইয়া যাওয়ায়,

তাহার ভিতরকার তিনটি বল-রেখা কমিয়া একটিতে দাঁড়াইয়াছে। বল-রেখার এই-রকম হঠাৎ কমাতেও বেষ্টনীর তারে ক্ষণিক বিদ্যুতের প্রবাহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বল-রেখার বৃদ্ধিতে প্রবাহ যে-দিক্ ধরিয়া চলে, বল-রেখা কমিলে প্রবাহের দিক্ তাহারি উল্‌টা হয়।

চৌম্বক বল-রেখাই যে, বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করে, ফ্যারাডে একটি সুন্দর পরীক্ষায় তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, আমাদের এই পৃথিবীখানি একটা প্রকাণ্ড চুম্বক। সাধারণ চুম্বকের উত্তর-দক্ষিণ মেরুকে জুড়িয়া যেমন বল-রেখা থাকে, পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরুকে যোগ করিয়া সেই-রকম অনেক বল-রেখা আমাদের চারিদিকের জলে স্থলে আকাশে সাজানো আছে। সুতরাং আমরা যখন কোনো বেষ্টনীকে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে জোরে ঘুরাইতে থাকি, তখন উহার ভিতরকার বল-রেখার সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং সংখ্যার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় সত্যই তাহা দেখা যায়। একটা বেষ্টনীর দুই প্রান্তের তার বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রে লাগাইয়া তাহাকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ধরিয়া রাখো এবং তার পরে

উহাকে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বন্ বন্ করিয়া ঘুরাইতে থাকো। দেখিবে, বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রের কাঁটাকে বিচলিত করিতেছে। কারণ, বেষ্টনীকে উত্তর-দক্ষিণে ঘুরাইলে তাহার ভিতর-কার চৌম্বক বল-রেখা ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে বা কমে। ইহাতেই প্রবাহ উৎপন্ন হয়। দেখ, বিদ্যুৎ-কোষ নাই, চুম্বকও নাই, কেবল পৃথিবীর চৌম্বক বল-রেখার সাহায্যে বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইল। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি?

এই ত গেল চুম্বকের সাহায্যে বিদ্যুতের আবেশ। তা'ছাড়া এক তারের বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে অন্য তারে যে, ক্ষণিক বিদ্যুতের প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়, ইহাও ফ্যারাডে প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। পরপৃষ্ঠার ছবিটি দেখ। ছবির B, B^1 অংশ রেশম-মোড়া তারের দুইটি বেষ্টনী। B বেষ্টনীর তারের দুই প্রান্ত P ব্যাটারীর সঙ্গে সংযুক্ত আছে। সুতরাং ইহাতে বিদ্যুৎ চলিতেছে। B^1 বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ নাই। তাহার তারের দুই প্রান্ত G-চিহ্নিত বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রের সঙ্গে যোগ করা আছে। বেষ্টনীর ভিতরে অতি অল্প বিদ্যুৎ চলিলেও, তাহা বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রের কাঁটার

বিচলন দেখিলেই বুঝা যায়। এখন যদি তোমরা বিদ্যুৎ-যুক্ত B বেষ্টনীকে দূর হইতে তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎহীন B^1 বেষ্টনীর কাছে আনো, তাহা হইলে

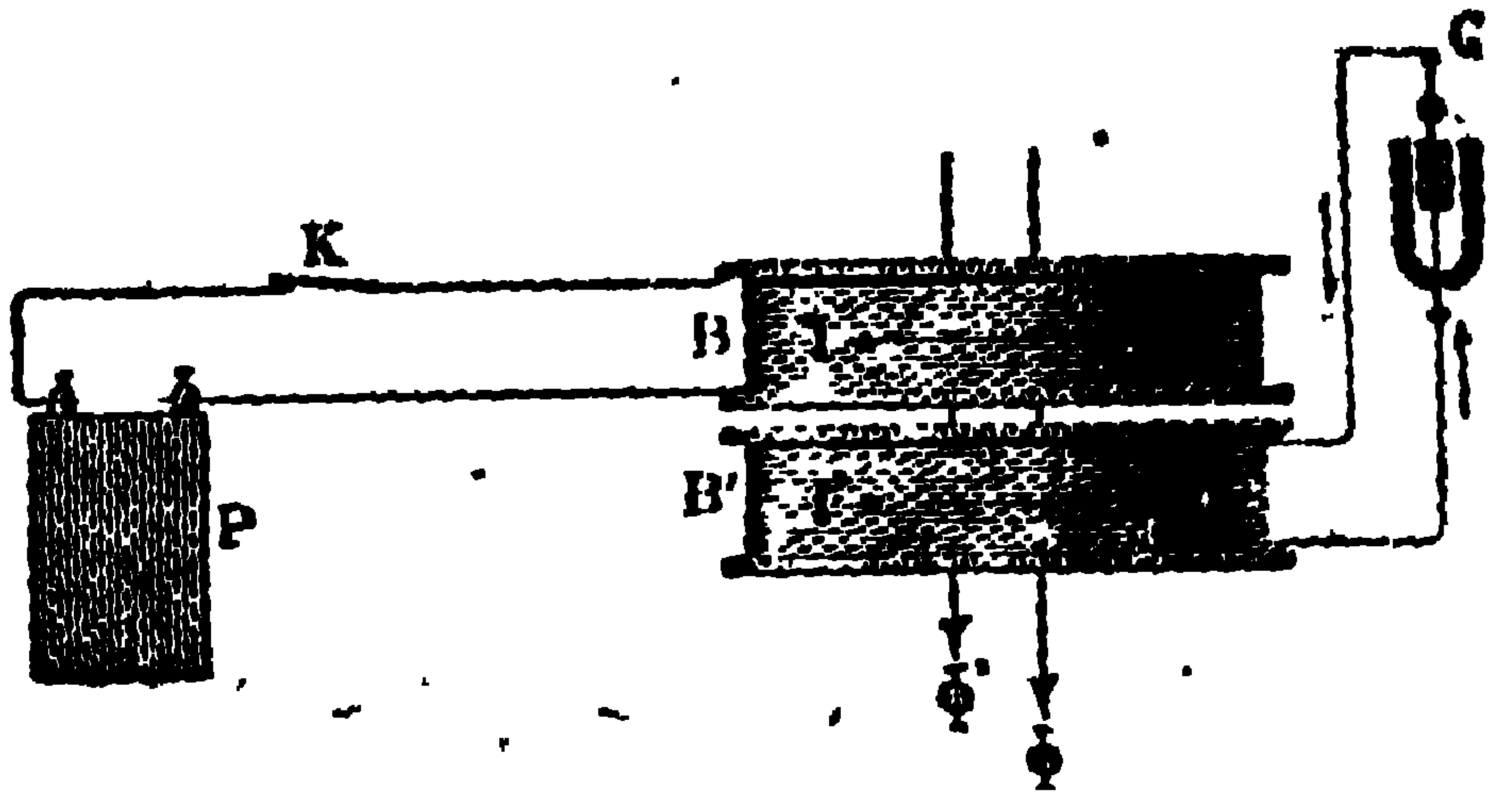

বিদ্যুতের সাহায্যে বিদ্যুতের আবেশ (১)

এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে। তখন B বেষ্টনী হইতে হঠাৎ অল্পক্ষণের জন্য একটা বিদ্যুতের প্রবাহ দেখা দিবে এবং এই প্রবাহের দিক্ থাকিবে B-এর প্রবাহের দিকের ঠিক্ উল্‌টা। তার পরে B বেষ্টনীকে যেমনি তাড়াতাড়ি B^1 বেষ্টনী হইতে দূরে লইয়া যাইতে থাকিবে, তেমনি উহাতে আর এক-বার প্রবাহ দেখা যাইবে। কিন্তু এবারকার প্রবাহের দিক্ হইবে ঠিক্ B^1-এর প্রবাহের দিকের মতো।

এই পরীক্ষা অন্য রকমেও করা চলে। মনে কর, B, B^1 বেষ্টনী দুটিকে ছবির মতো খুব কাছাকাছি

রাখা হইয়াছে। B বেষ্টনীতে যে ব্যাটারি লাগানো আছে, তাহার বিদ্যুৎকে K-চিহ্নিত চাবি আঁটিয়া ও খুলিয়া বেষ্টনীর ভিতর দিয়া ইচ্ছামতো চালানো যায় এবং বন্ধ করাও চলে। মনে কর, K চাবি খোলা আছে। সুতরাং B বেষ্টনী দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে না। এখন যদি তোমরা তাড়াতাড়ি K চাবিকে আঁটিয়া B-এর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে থাকো, তবে B^1 বেষ্টনীতে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিক বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেখা দিবে এবং ইহার দিক্ হইবে B-এর বিদ্যুতের দিকের ঠিক্ বিপরীতে। এবারে K চাবি খুলিয়া B বেষ্টনীর ভিতরকার প্রবাহকে হঠাৎ বন্ধ কর, এখানেও আবার B^1-এর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু এই বিদ্যুতের দিক্ হইবে অবিকল B-এর বিদ্যুতের দিকের মতো।

এখানে কয়েকটি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। ঐ দুই বেষ্টনীর মধ্যে যাহার ভিতর দিয়া ব্যাটারির বিদ্যুৎ চালানো যায়, তাহাকে বলা হয় মুখ্য-বেষ্টনী (Primary Coil) এবং যাহাতে বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রবাহের আবেশ হয়, তাহার নাম দেওয়া হয় গৌণ বেষ্টনী (Secondery Coil)। গৌণ বেষ্টনীতে

তারের পাক যত বেশি থাকে, এই ক্ষণিক আবিষ্ট বিদ্যুতের পরিমাণও তত বেশি হয়। অর্থাৎ দশ পাক-যুক্ত গৌণ-বেষ্টনীতে মুখ্য বেষ্টনীর দ্বারা যে প্রবাহক-বলের আবেশ হয়, কুড়ি পাকে তাহার দ্বিগুণ, ত্রিশ পাকে তিন গুণ এবং এক শত পাকে দশ গুণ প্রবাহক-বল হইয়া পড়ে। পাকের সঙ্গে প্রবাহক-বল এই অনুপাতে বাড়িয়া চলে। তাহা হইলে দেখ, মুখ্য বেষ্টনীর কোনো পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবল গৌণ বেষ্টনীর পাকের সংখ্যা বাড়াইয়া আমরা উহার আবিষ্ট বিদ্যুতের প্রবাহক-বলকে ইচ্ছামত বাড়াইতে পারি।

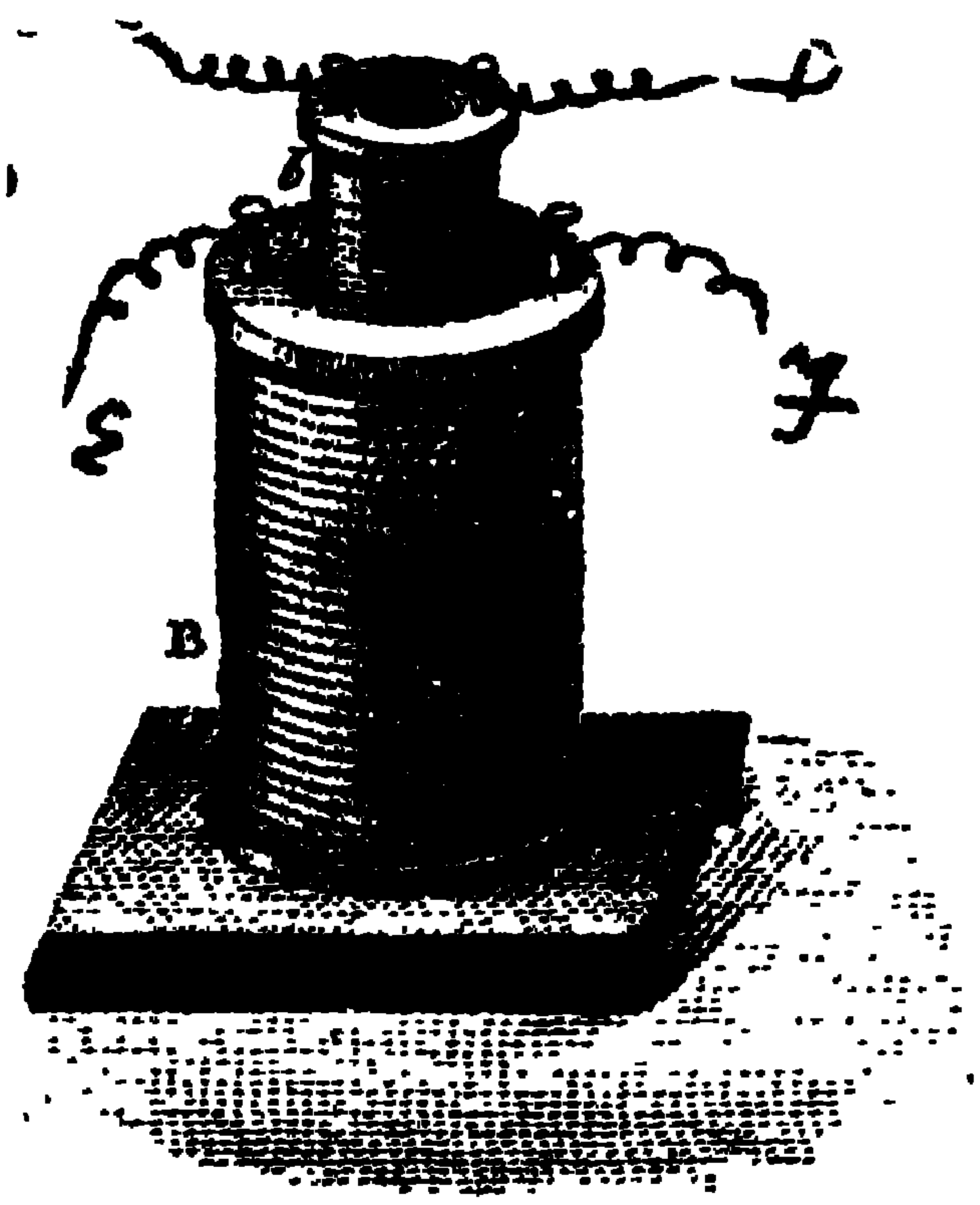

এক বেষ্টনীর প্রবাহে অন্য বেষ্টনীতে বিদ্যুতের আবেশ

যাহা বলা হইল, তোমরা এখানকার ছবিটি দেখিলে বুঝিতে পারিবে। দেখ, **B** এবং **C**-চিহ্নিত দুইটি বেষ্টনী রহিয়াছে। **B** বেষ্টনীতে রেশম-মোড়া সরু তার হাজার বা দুই হাজার

পাক জড়ানো আছে। কিন্তু C বেষ্টনীতে তারের পাক বেশী নাই। খুব মোটা তারের কুড়ি পঁচিশ পাকে ইহা প্রস্তুত। এখন যদি তোমরা মুখ্য বেষ্টনীর তারের C এবং D প্রান্তকে ব্যাটারিতে লাগাইয়া উহার ভিতর দিয়া হঠাৎ বিদ্যুৎ চালাইতে থাকো, তাহা হইলে, অপর বেষ্টনীর E, F প্রান্তকে যোগ করিলেই খুব প্রবল ক্ষণিক বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেখা যাইবে। কেবল ইহাই নয়, মুখ্য বেষ্টনীর বিদ্যুৎ বন্ধ করিলেও গৌণ বেষ্টনীতে সেই-রকম ক্ষণিক বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু পূর্ব্বের আবিষ্ট বিদ্যুৎ যে-দিক্ ধরিয়া চলিতেছিল, এখন তাহারি উল্টা দিকে চলিবে।

এই-রকমে এক বেষ্টনীর বিদ্যুতে অন্য বেষ্টনীতে কেন ক্ষণিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, প্রশ্ন করিলে, বৈজ্ঞানিকেরা এখানেও সেই বল-রেখার কথা আনিয়া ফেলেন। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, কোনো তার দিয়া বিদ্যুৎ চলিলেই তাহার চারিদিকে চৌম্বক বল-রেখা উৎপন্ন হয়। কাজেই, যে-বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ চলিতেছে, তাহাকে বিদ্যুৎ-হীন বেষ্টনীর কাছে আনিলেই এই দ্বিতীয় বেষ্টনীর ফাঁকে প্রথমের অনেক বল-রেখা প্রবেশ করে। ইহাতেই

তারের পাক যত বেশি থাকে, এই ক্ষণিক আবিষ্ট বিদ্যুতের পরিমাণও তত বেশি হয়। অর্থাৎ দশ পাক-যুক্ত গৌণ-বেষ্টনীতে মুখ্য বেষ্টনীর দ্বারা যে প্রবাহক-বলের আবেশ হয়, কুড়ি পাকে তাহার দ্বিগুণ, ত্রিশ পাকে তিন গুণ এবং এক শত পাকে দশ গুণ প্রবাহক-বল হইয়া পড়ে। পাকের সঙ্গে প্রবাহক-বল এই অনুপাতে বাড়িয়া চলে। তাহা হইলে দেখ, মুখ্য বেষ্টনীর কোনো পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবল গৌণ বেষ্টনীর পাকের সংখ্যা বাড়াইয়া আমরা উহার আবিষ্ট বিদ্যুতের প্রবাহক-বলকে ইচ্ছামত বাড়াইতে পারি।

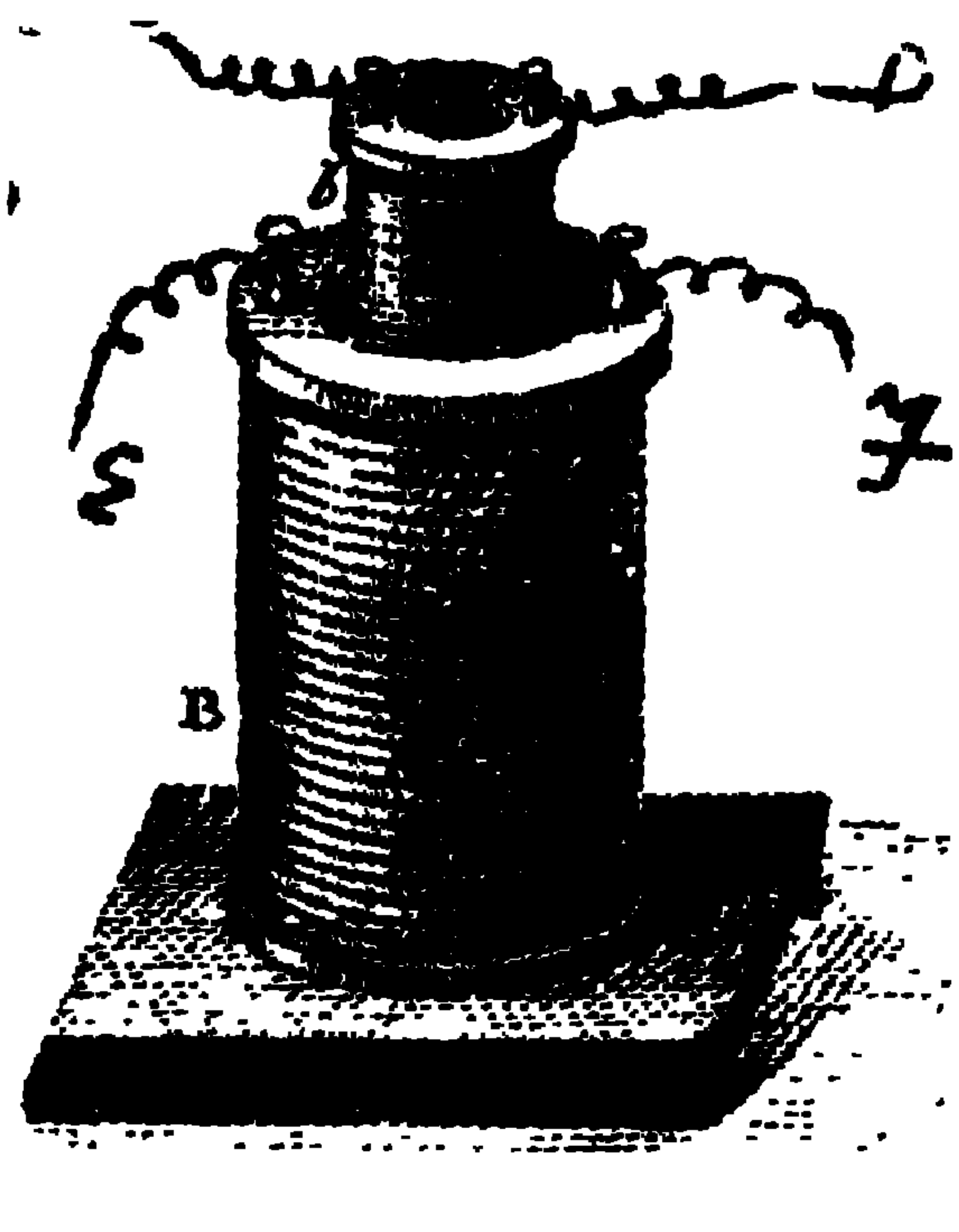

এক বেষ্টনীর প্রবাহে অন্য বেষ্টনীতে বিদ্যুতের আবেশ

যাহা বলা হইল, তোমরা এখানকার ছবিটি দেখিলে বুঝিতে পারিবে। দেখ, B এবং C-চিহ্নিত দুইটি বেষ্টনী রহিয়াছে। B বেষ্টনীতে রেশম-মোড়া সরু তার হাজার বা দুই হাজার

পাক জড়ানো আছে। কিন্তু C বেষ্টনীতে তারের পাক বেশী নাই। খুব মোটা তারের কুড়ি পঁচিশ পাকে ইহা প্রস্তুত। এখন যদি তোমরা মুখ্য বেষ্টনীর তারের C এবং D প্রান্তকে ব্যাটারিতে লাগাইয়া উহার ভিতর দিয়া হঠাৎ বিদ্যুৎ চালাইতে থাকো, তাহা হইলে, অপর বেষ্টনীর E, F প্রান্তকে যোগ করিলেই খুব প্রবল ক্ষণিক বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেখা যাইবে। কেবল ইহাই নয়, মুখ্য বেষ্টনীর বিদ্যুৎ বন্ধ করিলেও গৌণ বেষ্টনীতে সেই-রকম ক্ষণিক বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু পূর্ব্বের আবিষ্ট বিদ্যুৎ যে-দিক্ ধরিয়া চলিতেছিল, এখন তাহারি উল্টা দিকে চলিবে।

এই-রকমে এক বেষ্টনীর বিদ্যুতে অন্য বেষ্টনীতে কেন ক্ষণিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, প্রশ্ন করিলে, বৈজ্ঞানিকেরা এখানেও সেই বল-রেখার কথা আনিয়া ফেলেন। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, কোনো তার দিয়া বিদ্যুৎ চলিলেই তাহার চারিদিকে চৌম্বক বল-রেখা উৎপন্ন হয়। কাজেই, যে-বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ চলিতেছে, তাহাকে বিদ্যুৎ-হীন বেষ্টনীর কাছে আনিলেই এই দ্বিতীয় বেষ্টনীর ফাঁকে প্রথমের অনেক বল-রেখা প্রবেশ করে। ইহাতেই

প্রথম বেষ্টনীর বিদ্যুৎ, দ্বিতীয় বেষ্টনীতে বিদ্যুতের আবেশ করে।

তাহা হইলে দেখ, এখন যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বিদ্যুতের আবেশ কাহাকে বলে, জানা যায়। কোনো বেষ্টনীর ভিতরকার বল-রেখাগুলির সংখ্যা কোনো উপায়ে তাড়াতাড়ি পরিবর্ত্তিত করিলে তাহাতে যে-বিদ্যুৎ-প্রবাহ জন্মে, তাহাকেই বলে আবিষ্ট বিদ্যুৎ। তা'-ছাড়া আরো জানা যায় যে, কোনো বেষ্টনীতে চুম্বক দ্বারা বা অন্য বেষ্টনীর বিদ্যুৎ দ্বারা যে ক্ষণিক বিদ্যুতের আবেশ হয়, তাহার চাপ অর্থাৎ প্রবাহক-বল মোটামুটি তিনটি নিয়ম অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। (১) বেষ্টনীর ভিতরকার বল-রেখার সংখ্যা যত পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার আবিষ্ট বিদ্যুতের প্রবাহক-বল ততই বাড়ে। (২) বল-রেখার সংখ্যা যত তাড়াতাড়ি পরিবর্ত্তিত হয়, প্রবাহক-বল ততই বাড়িয়া চলে। (৩) কোনো বেষ্টনীর তারে ডাইন হাতে বাঁয়ে, বা বাঁ হইতে ডাইনে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে হইলে সেই বিদ্যুতে বেষ্টনীতে যে-দিক্ ধরিয়া বল-রেখা চলে, তাহারি বিপরীত দিক্‌গামী বল-রেখা বেষ্টনীতে প্রবেশ করাইতে হয়।

রুম্‌কর্ফের বেষ্টনী

তোমরা দেখিয়াছ, গৌণ বেষ্টনীতে তারের পাকের সংখ্যা যত বাড়ানো যায়, মুখ্য বেষ্টনী ততই জোরালো বিদ্যুতের আবেশ করে। জোরালো বিদ্যুতের প্রয়োজন আজকাল সর্ব্বত্রই। বেতার টেলিগ্রাফ্‌ ও টেলিফোনে জোরালো (অর্থাৎ বেশি প্রবাহক-বলের) বিদ্যুৎ ব্যবহার না করিলে চলে না। যে এক্স-রে (X-Ray) দিয়া ডাক্তাররা রোগীর ভাঙা হাড় পরীক্ষা করেন তাহাতেও খুব জোরালো বিদ্যুতের দরকার। তাই মুখ্য বেষ্টনীতে ক্ষীণ বিদ্যুৎ চালাইয়া গৌণ বেষ্টনীতে জোরালো বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার যে-যন্ত্র আছে, তাহার বিবরণ দিব। এই যন্ত্রের নাম Ruhmkorff's Coil অর্থাৎ রুম্‌কর্ফের বেষ্টনী। কেহ কেহ আবার ইহাকে Induction Coil অর্থাৎ আবেশ-বেষ্টনীও বলেন। ফরাসী বৈজ্ঞানিক রুম্‌কর্ফ

এই যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে রুম্‌কর্ফ-বেষ্টনী বলা হয়। আজকাল এই শ্রেণীর আরো

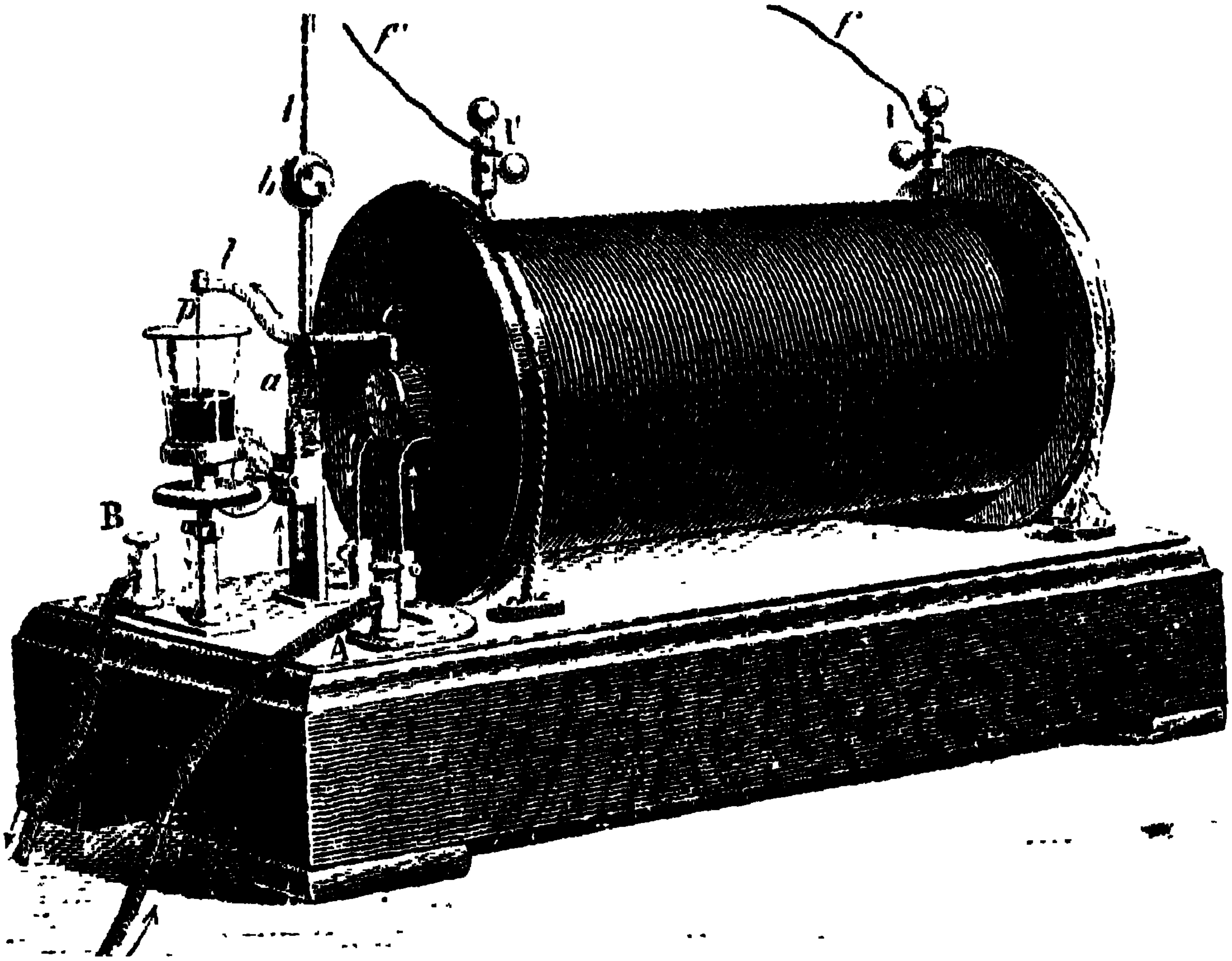

রুম্‌কর্ফ-বেষ্টনী

অনেক যন্ত্র দেখা যায়। কিন্তু সকলেরই মূল গঠন একই রকম।

পরপৃষ্ঠার ছবিটি দেখ। ছবির F অংশটি কতকগুলি কোমল লোহার শলাকা। এইগুলিকে জড়াইয়া

A-চিহ্নিত মুখ্য বেষ্টনী রহিয়াছে। দেখ, এই বেষ্টনীর তার খুব মোটা। পাঁচ-ছয় গজ রেশম-মোড়া মোটা তারকে জড়াইয়া এই বেষ্টনী তৈয়ারি করা হইয়াছে। ইহার তারের দুই প্রান্তে P-চিহ্নিত ব্যাটারি জোড়া

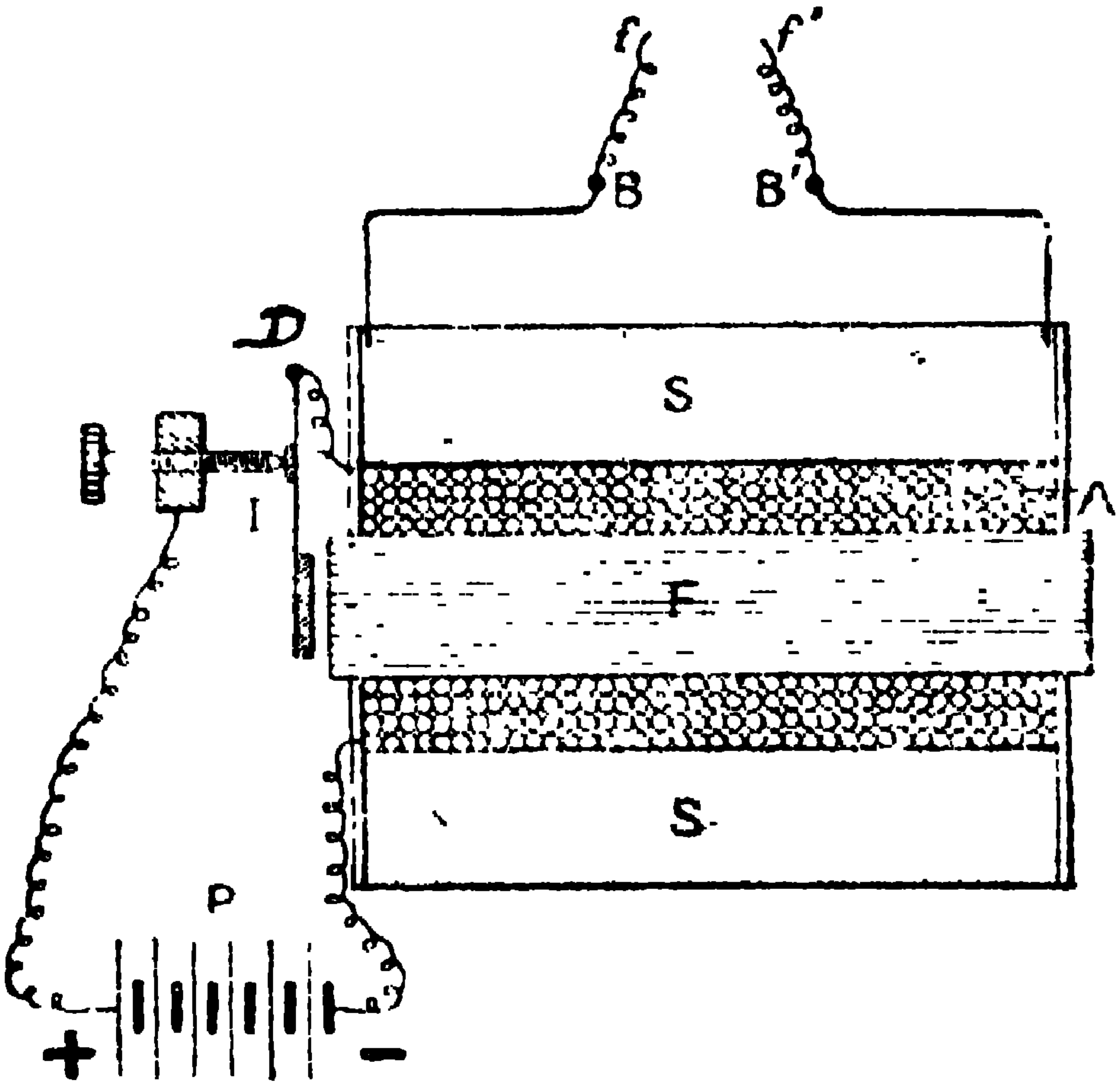

রুম্‌কর্ফ-বেষ্টনীর ক্রিয়া

আছে। এই বেষ্টনীর উপরে রহিয়াছে S-চিহ্নিত গৌণ বেষ্টনী। রেশম-মোড়া, খুব লম্বা সরু তারকে ইবনাইটের চোঙে জড়াইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। বড় যন্ত্রে এই তার কখনো কখনো ছয়-সাত মাইল

পর্য্যন্ত লম্বা থাকে। মুখ্য বেষ্টনীতে যেমন চার-পাঁচ থাক্ তার থাকে, গৌণ বেষ্টনীতে থাকে হাজার হাজার পাক্ তার। ছবিতে দেখ, গৌণ বেষ্টনীর তারের B B^1 প্রান্ত, f f^1-এ শেষ হইয়াছে। মুখ্য বেষ্টনীর বিদ্যুৎ, গৌণ বেষ্টনীতে যে প্রবাহক-বল উৎপন্ন করে, তাহাতে f এবং f^1-এর ফাঁকের ভিতর দিয়া চট্ চট্ শব্দে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ চলিতে থাকে। প্রবাহক-বলের পরিমাণ বড় যন্ত্রে কখনো কখনো পঞ্চাশ হাজার ভোল্‌টেরও সমান হয়। তাই মাঝের বাতাসের বাধা ভেদ করিয়া স্ফুলিঙ্গ চলে। এই যন্ত্রের স্ফুলিঙ্গকে কখনো কখনো এক হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়।

যে-রকমে রুম্‌কর্ফ-বেষ্টনীর কাজ চলে, তোমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। P ব্যাটারির বিদ্যুৎ I-চিহ্নিত মুখ্য বেষ্টনীর তার দিয়া যেমনি ব্যাটারিতে আসে, সঙ্গে সঙ্গে বেষ্টনীর ভিতরকার F-চিহ্নিত কোমল লোহা চুম্বক হইয়া পড়ে। ছবিতে যে D-চিহ্নিত হাতুড়ির মতো অংশটি রহিয়াছে, তাহা স্প্রিঙের মতো লোহা দিয়া প্রস্তুত। উহা D জায়গায় আট্‌কাইয়া আছে; তাই উহার মাথাটা

বাঁয়ে ও ডাইনে খেলিয়া বেড়ায়। মুখ্য বেষ্টনীর ভিতরকার F লোহা চুম্বক হইবামাত্র, তাহা Dকে টানিয়া কাছে আনে। ইহাতে I এবং D-এর মধ্যে যে যোগ ছিল, এখন আর তাহা থাকে না। কাজেই, মুখ্য বেষ্টনীর তার দিয়া বিদ্যুৎ চলা বন্ধ হয়। ইহাতে যে কি ফল হয়, তোমরা বোধ করি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ,—F তাহার চুম্বক-শক্তি হারায় এবং D স্প্রিঙ্‌ ছিট্‌কাইয়া আবার I-এর গায়ে ঠেকে। এই-রকমে আপনা হইতে D-এর খুব ঘন কম্পগতি হয় এবং প্রত্যেক কাঁপুনির সঙ্গে তাহা F-কে চুম্বক করিয়া পরক্ষণেই উহার চৌম্বক শক্তি নষ্ট করে। ইহাতে গৌণ বেষ্টনীতে কি হয়, অনায়াসেই বলা যায়। F চুম্বকে পরিণত হওয়ায় যে-সকল বল-রেখা S গৌণ বেষ্টনীর ভিতর দিয়া চলিতেছিল, চুম্বক-শক্তি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি হঠাৎ লোপ পায়। তার পরে, F আবার যেমনি চুম্বক হইয়া পড়ে, অমনি অনেক বল-রেখা গৌণ বেষ্টনীতে প্রবেশ করে। বল-রেখার এই-রকম হঠাৎ উৎপত্তি ও লোপে গৌণ বেষ্টনীর তারে যে প্রবাহক-বল জন্মে, তাহাতেই f এবং f^1-এর ফাঁক দিয়া বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ আনাগোনা করিতে থাকে।

মনে রাখিয়ো, বল-রেখার বাড়া-কমার সঙ্গে গৌণ বেষ্টনীতে যে-প্রবাহ জন্মে, তাহার দিক্ একই থাকে না। তাহা একবার f হইতে f^1-এ এবং পরক্ষণেই f^1 হইতে f-এ,—এই রকমে চলিতে আরম্ভ করে। তাই রুম্‌কর্ফের বেষ্টনীতে যে-বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তাহা এক দিক্ ধরিয়া চলে না,—তাহার গতি একবার বাঁ হইতে ডাইনে হইয়াই পরক্ষণে ডাইন হইতে বাঁয়ে হইয়া দাঁড়ায়। D স্প্রিঙ্ ঘন ঘন কাঁপিয়া মিনিটে যতবার f-কে চুম্বক করে, গৌণ বেষ্টনীর বিদ্যুৎ ততবার দিক্‌পরিবর্ত্তন করে।

যখন রুমকর্ফ-বেষ্টনীর কাজ চলিতে থাকে, তখন প্রায়ই I স্ক্রু হইতে ছোটো ছোটো বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ লাফাইয়া D-এ গিয়া ঠেকে। ইহাতে I এবং D-এর যোগ ছিন্ন হইয়া যায়। কেন এই স্ফুলিঙ্গ হয়, বলা কঠিন নয়। I এবং D সংযুক্ত থাকায় মুখ্য বেষ্টনীর ভিতর দিয়া যে-বিদ্যুৎ যাইতেছিল, তাহা I ও D পৃথক্ হইবামাত্র বন্ধ হয় না। তাই, সেই বিদ্যুৎ অন্য পথ না পাইয়া I হইতে লাফাইয়া D-এ ঠেকে। কাজেই, ইহাতে গৌণ বেষ্টনীতে বিদ্যুতের আবেশ হইতে দেরি হয়। যাহাতে I

এবং D-এর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ না চলে, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা এই যন্ত্রেই থাকে। এখানকার ছবিটি দেখিলে তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে। ছবিতে কেবল মুখ্য বেষ্টনীই আঁকা আছে। P-চিহ্নিত অংশটি

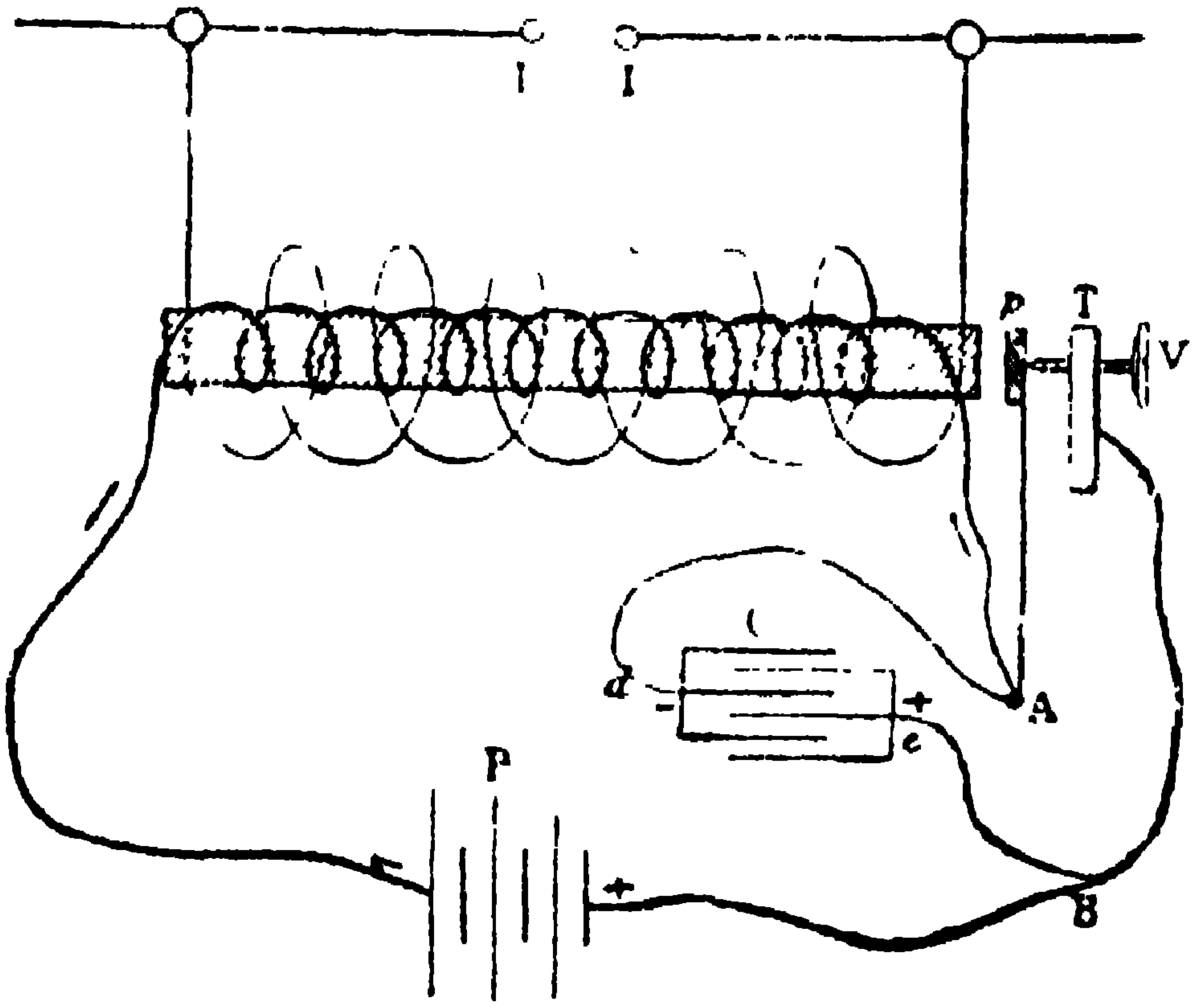

কম্‌কর্ফ-বেষ্টনীতে কন্‌ডেন্সার্

সেই হাতুড়ি, T সেই স্ক্রু। যন্ত্রের তলাকার C-চিহ্নিত অংশটি একটি বিদ্যুৎ-সংগ্রহ-যন্ত্র (Condenser)। ইহার ধন ও ঋণ-ফলকগুলির সঙ্গে T এবং P সংযুক্ত আছে। T যখন P হইতে তফাৎ হইয়া দাঁড়ায়, এই ব্যবস্থা থাকায় তখন বিদ্যুৎ T হইতে P-এ লাফাইয়া যন্ত্রের নীচেকার সংগ্রহকে আশ্রয় লয়।

আত্ম-আবেশ

এখানকার ছবিতে দেখ, একটা খুব লম্বা রেশম-মোড়া তারকে জড়াইয়া বেষ্টনীর আকারে রাখা হইয়াছে। বেষ্টনীর এক প্রান্ত P ব্যাটারির এক মেরুতে যুক্ত আছে এবং অন্য প্রান্তটি যুক্ত আছে

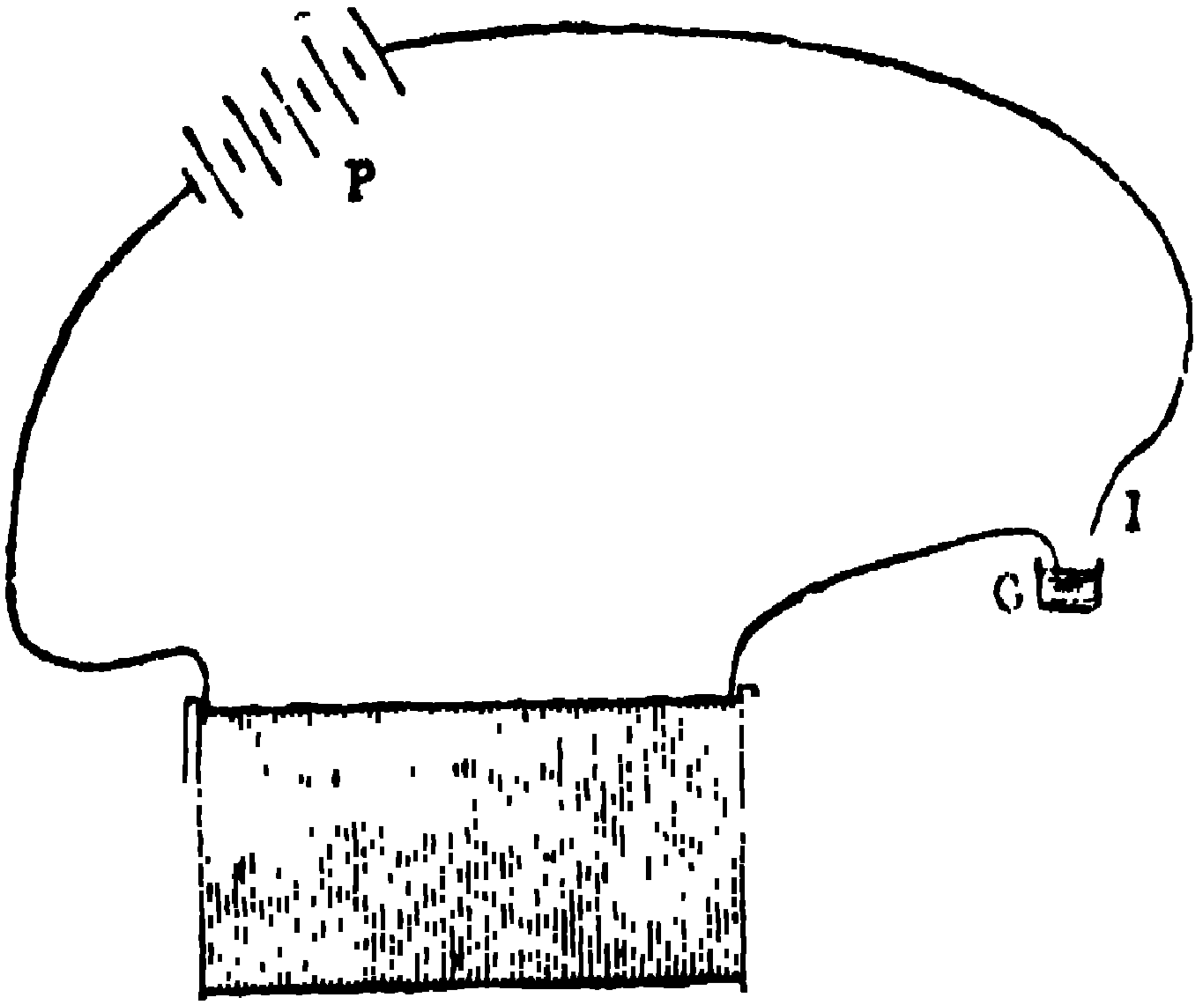

আত্ম-আবেশ

C-এ। C একটা ছোটো পেয়ালা, তাহাতে খানিকটা পারা আছে। এখন ব্যাটারির অন্য মেরুকে যদি তার দিয়া C-এ সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না কি? ব্যাটাবির বিদ্যুৎ বেষ্টনীর

ভিতর দিয়া C-এ যায়; তার পরে C হইতে ব্যাটারিতে প্রবেশ করে। এই রকম চক্রাকারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে। এখন যদি তোমরা হঠাৎ উপরের ছোটো তারটিকে C হইতে উঠাইয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ কর, তাহা হইলে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইবে। তখন C এবং I-এর মধ্যের ফাঁকে একটি সুস্পষ্ট স্ফুলিঙ্গ দেখা দিবে। কিন্তু I-কে যখন C-এর সহিত সংযুক্ত করা যায়, তখন এই স্ফুলিঙ্গ থাকে না। I-কে C হইতে পৃথক্ করিয়া ব্যাটারির বিদ্যুৎ বন্ধ করা হইয়াছে, তবে এই স্ফুলিঙ্গ কোথা হইতে আসিল?

ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যখন বেষ্টনীর পাকে পাকে বিদ্যুৎ চলে, তখন প্রত্যেক পাক তাহার নিকটবর্ত্তী পাকে বিদ্যুতের আবেশ করে এবং এই আবিষ্ট বিদ্যুতের দিক্ থাকে, তারের বিদ্যুতের দিকের ঠিক্ উল্‌টা মুখে। কাজেই I এবং Cকে সংযুক্ত করিলে এই আবিষ্ট বিদ্যুতে ব্যাটারির বিদ্যুতের প্রবাহ কমে এবং বিযুক্ত করিলে তারে ব্যাটারির যে-বিদ্যুৎ চলিতেছিল, তাহাকেই উহা স্থায়ী করে। I এবং C পরস্পর সংযুক্ত নাই, অথচ এই-রকমে তাহাদের ভিতরে বিদ্যুৎ চলায় একটা ঝোঁকের

সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এই ঝোঁকের মাথায় I এবং C-এর ভিতরকার সামান্য বাধা ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের আকারে চলিতে থাকে। কোনো তারে বিদ্যুৎ চলা হঠাৎ বন্ধ করিলে এই-রকমে যে-বিদ্যুতের প্রকাশ পায়, তাহাকে বলা হয় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ (Extra Current)। কোনো পরিচালক বস্তু নিজের বিদ্যুৎ দিয়া, নিজের ভিতরেই আর একটা প্রবাহের আবেশ করে বলিয়া কেহ কেহ আবার এই ব্যাপারটাকে আত্ম-আবেশ (Self Induction) নামও দিয়া থাকেন।

ডাইনামো অর্থাৎ বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র

কলিকাতা, ঢাকা, বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি বড় বড় সহরের রাস্তাঘাটে এবং লোকের বাড়িতে আলো দিবার জন্য বিদ্যুতের দরকার হয়। তা'ছাড়া ট্রাম গাড়ি, ইলেক্‌ট্রিক মোটর এবং পাখা চালাইতে গেলেও বিদ্যুৎ লাগে। এই বিদ্যুৎ কি-রকমে উৎপন্ন করা হয়, বোধ করি তোমরা জানো না। তোমরা সহরের বিদ্যুতের কারখানায় গেলে দেখিতে পাইবে, সেখানে দিবারাত্রি হুস্‌ হুস্‌ করিয়া কল চলিতেছে এবং সেই কলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া অনেক তার দিয়া বাহিরে আসিতেছে। এই কলের বিদ্যুতেই আলো জ্বলে, ট্রাম গাড়ি ও পাখা চলে। এই-রকমে যে-বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তাহা হাজার হাজার কোষ সাজাইয়াও পাওয়া যায় না। চুম্বকের বল-ক্ষেত্রে বেষ্টনীকে ঘুরাইলে যে-বিদ্যুতের আবেশ হয়, তাহাই ঐ-সব কাজে লাগানো হয়। যে-যন্ত্র দিয়া কারখানায় আবিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়, তাহারি নাম ডাইনামো। তোমাদিগকে ডাইনামো যন্ত্রের একটু পরিচয় দিব।

এখানকার ছবিটি দেখ। ইহাতে একটা বড় বৈদ্যুত চুম্বক আঁকা আছে। N এবং S তাহার উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। ইহা কোমল লোহা দিয়া প্রস্তুত। কোমল লোহার উপরকার বেষ্টনীর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ

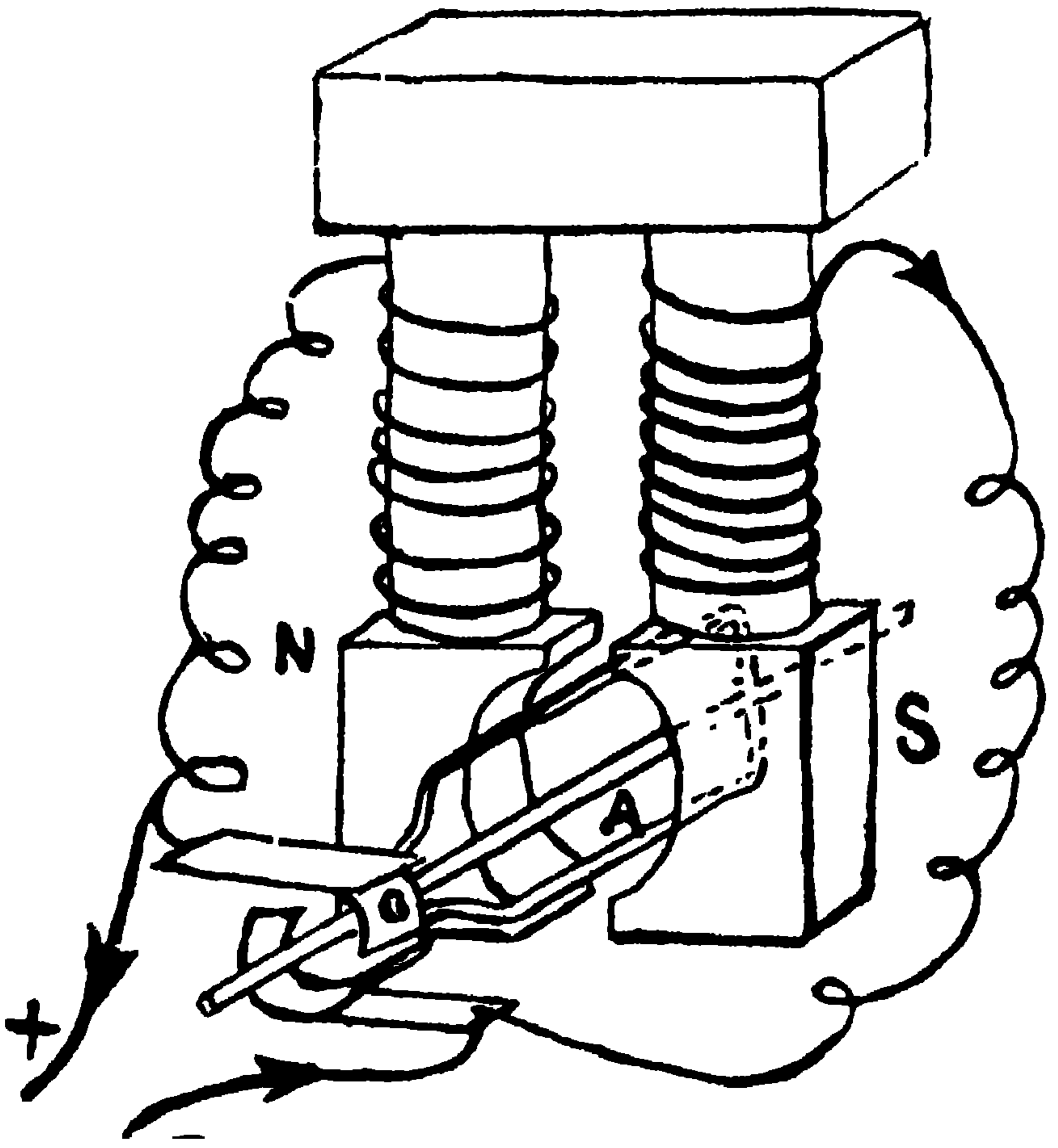

ডাইনামোর ক্রিয়া

চালাইলেই তাহা চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বিদ্যুৎ যখন না চলে, তখনো উহাতে একটু-আধটু চুম্বক শক্তি থাকে। কাজেই, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে সংযুক্ত করিয়া

কতকগুলি বল-রেখা সর্ব্বদাই রহিয়া যায়। মনে কর, এখন ছবির A-চিহ্নিত বেষ্টনীটিকে যেন চুম্বকের দুই মেরুর ফাঁকে রাখিয়া ক্রমাগত ঘুরানো যাইতেছে। ইহাতে কি হয়, বলা যায় না কি? এক এক বার পাক দেওয়ার সঙ্গে বেষ্টনীর ভিতরে একবার বেশি এবং পরক্ষণেই অল্প বল-রেখা প্রবেশ করিতে থাকিবে। কাজেই, বল-রেখার সংখ্যার হঠাৎ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু তোমরা জানো, বেষ্টনীর ভিতরকার বল-রেখার সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে আবিষ্ট বিদ্যুৎ যে-দিক্ ধরিয়া চলে, বল-রেখার সংখ্যা কমিয়া আসিলে সেই বিদ্যুতেরই দিক্ হইয়া পড়ে ঠিক্ উল্‌টা। কাজেই, এই যন্ত্রের চুম্বক-ক্ষেত্রে বেষ্টনীকে ঘুরাইতে থাকিলে, তাহাতে একবার বাঁ হইতে ডাইনে এবং পরক্ষণেই ডাইন হইতে বাঁয়ে বিদ্যুৎ চলিতে থাকিবে। ডাইনামোর চুম্বক-ক্ষেত্রে বেষ্টনীকে ঘুরাইলে এই-রকমই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ছবিতে আমরা কেবল একটা তারযুক্ত বেষ্টনী আঁকিয়া দিয়াছি। আসল ডাইনামো যন্ত্রে অনেক তার জড়াইয়া বেষ্টনী তৈয়ারি করা হয় এবং এই বেষ্টনীর নাম দেওয়া হয় আর্মেচার (Armature)।

যাহা হউক আর্মেচারে যে-বিদ্যুতের দিক্ ক্ষণে ক্ষণে ওলট্-পালট হইতেছে, তাহাকে সব সময়ে কাজে লাগানো যায় না। তাই বিদ্যুতের দিক্ একই করার জন্য যন্ত্রে সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ছবিতে C-চিহ্নিত অংশটি দেখ। ইহাকে কমিউটেটার (Commutator) বলা হয়। দুই বিপরীত-দিক্‌গামী বিদ্যুৎকে এক মুখে চালাইবার জন্য প্রত্যেক ডাইনামোতে এই অংশটি লাগানো থাকে। কোনো ধাতুর আংটির পরিধিকে দুই খণ্ডে ভাগ করিলে যে-রকমটি হয়, ইহার গঠন ঠিক্ সেই রকমের। আংটির দুই অংশকে অপরিচালক বস্তু দিয়া পরস্পর বিযুক্ত রাখিয়া আর্মেচারের দুই প্রান্তকে ঐগুলিতে লাগানো থাকে। ছবিতে দেখ, যন্ত্রের আংটির দুই অংশকে ছুঁইয়া দুটি ধাতু-ফলক রহিয়াছে। এই দুটিকে বলা হয় ব্রস্ (Brush)। আর্মেচারের সঙ্গে যেমন আংটির দুই অংশ ঘুরিয়া বেড়ায়, ব্রস্ সে-রকমে ঘোরে না,—উহা স্থায়িভাবে যন্ত্রে আঁটা থাকে।

এখন মনে করা যাউক, যেন আমরা আর্মেচারকে দুই চুম্বকের মধ্যে বন্‌বন্ করিয়া ঘুরাইতেছি। ইহাতে কি হয়, আগেই বলিয়াছি। ঘোরার সঙ্গে

সঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং ঐ ব্রস্ দুখানি তাহা সংগ্রহ করে। তার পরে ব্রসে যে-তার লাগানো থাকে তাহা দিয়া সেই বিদ্যুৎ চলিতে থাকে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, আর্মেচারে যেমন ক্ষণে ক্ষণে উল্টা প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তার দিয়া সেই-রকম উল্টা প্রবাহ চলে। কিন্তু তাহা নয়। ব্রস্ দুখানি এমনি লাগানো থাকে, যে, যেই বেষ্টনীর বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক্-পরিবর্ত্তন হয়, অমনি কমিউটেটর বেষ্টনীর সঙ্গে ঘুরিয়া এক ব্রস্‌কে ছাড়িয়া অন্য ব্রসের গায়ে ঠেকে। ইহাতে আর্মেচারের বেষ্টনীর ওলট্-পালট্ বিদ্যুৎ ব্রসের তারের ভিতর দিয়া এক-মুখো হইয়া চলিতে থাকে। দেখ, যে-বিদ্যুৎ একবার এক দিকে চলিয়া পরক্ষণেই উল্টা দিকে চলিতেছিল, কেমন সহজ উপায়ে তাহাকে এক-মুখো করা যায়।

ছবিতে দেখ, ব্রস হইতে যে-তার বাহির হইয়াছে, তাহা ছাড়া ব্রস-সংলগ্ন অপর দুটা তার বৈদ্যুত-চুম্বককে জড়াইয়া আছে। এই তার কেন বৈদ্যুত-চুম্বকে জড়ানো থাকে, বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। ব্রসের বিদ্যুতের কিছু অংশ ঐ তারের ভিতর দিয়া চলে বলিয়া যেমন ডাইনামোকে চালানো যায়, অমনি

বৈদ্যুত-চুম্বকের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাতে উহার বল-রেখার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কাজেই, আর্মেচারের বেষ্টনী বেশি বল-রেখার ভিতর দিয়া চলে বলিয়া বিদ্যুতের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। তাই ডাইনামোকে চালাইতে থাকিলে প্রথমে এক আধ মিনিট বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। তার পরে ব্রসের বিদ্যুতের কিয়দংশ বৈদ্যুত-চুম্বকের তারে গিয়া যখন তাহার চৌম্বক শক্তি বাড়াইয়া দেয়, তখন প্রবাহের জোর বাড়িয়া যায়। তাহা হইলে দেখ, এই যন্ত্র নিজের তৈয়ারি বিদ্যুতে নিজের চৌম্বক-শক্তি বাড়ায় এবং তাহার ফলে বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। আবার কোনো কোনো ডাইনামোতে ব্রসের সমস্ত বিদ্যুৎই বৈদ্যুত-চুম্বকের তারে ঘুরিয়া বাহিরে আসে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ডাইনামোর আর্মেচারের বেষ্টনী বুঝি আগেকার ছবির মতো একটাই থাকে। কিন্তু তাহা নয়, ডাইনামোতে অনেক বেষ্টনী লইয়া এক-একটা আর্মেচার তৈয়ারি করা হয়। পরপৃষ্ঠায় একটা বড় ডাইনামোর আর্মেচারের ছবি দিলাম। গুণিয়া দেখ, ইহাতে P_1, P_2 ইত্যাদি তেরটি বেষ্টনী রহিয়াছে এবং কমিউটেটরের আংটিতেও তেরোটা ভাগ

আছে। কিন্তু ব্রস্ আছে মোটে দুখানি। এই ব্রস্ জোড়া জোড়া বেষ্টনীর বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া, তাহার প্রবাহের দিক্ এক-মুখো করে। কাজেই, ব্রসের তারের

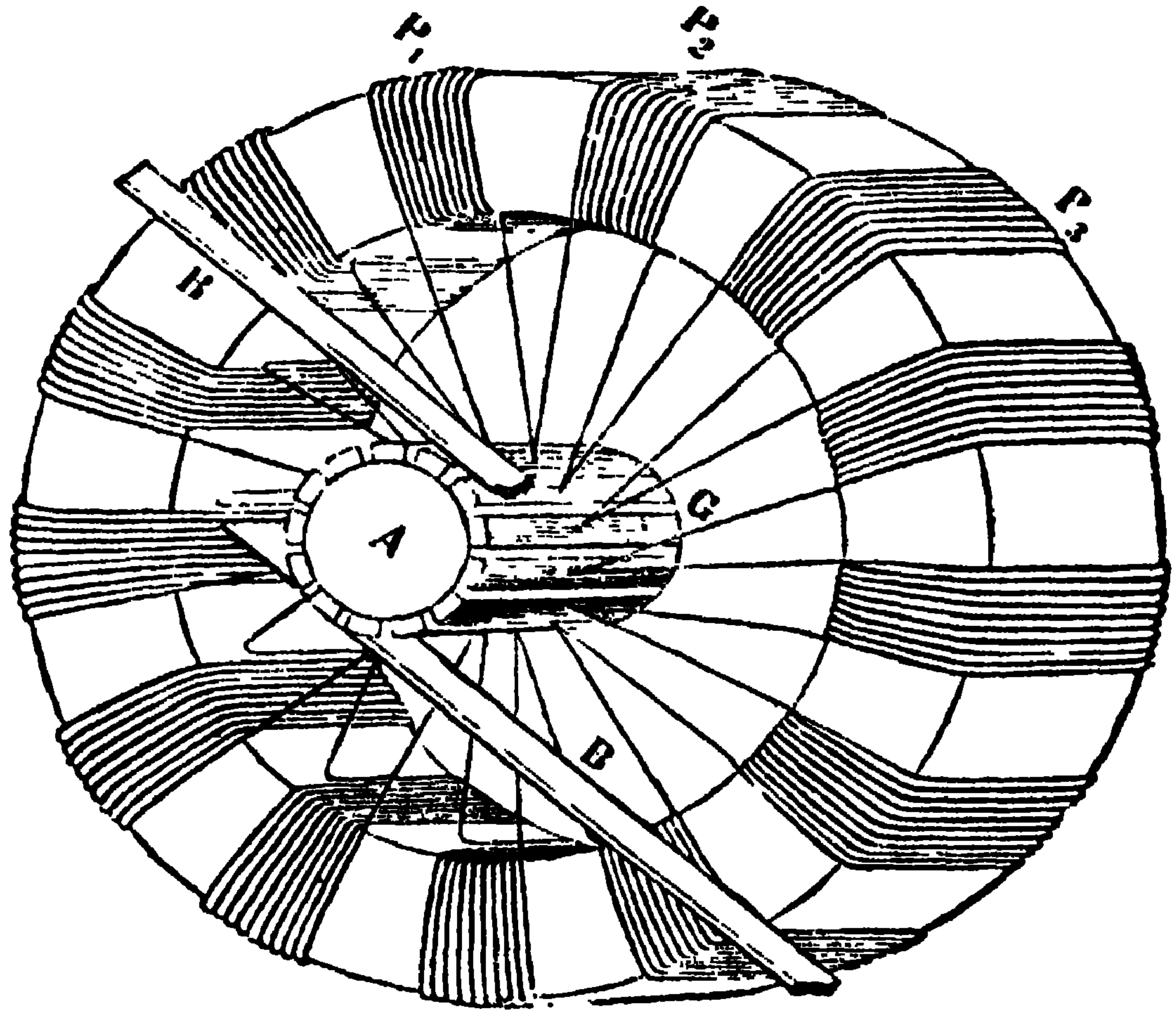

ডাইনামোর আর্মেচার

এক দিক ধরিয়া বিদ্যুতের প্রবল প্রবাহ চলিতে থাকে। আর্মেচারে একটা বেষ্টনী থাকিলে তাহার প্রবাহ কমিউটেটার দ্বারা এক-মুখো হইলেও, তাহা অবিরাম সমান জোরে চলে না। অর্থাৎ, উহা থামিয়া থামিয়া বাড়ে-কমে। অনেক বেষ্টনী দিয়া আর্মেচার তৈয়ারি করিলে প্রবাহের এই দোষটা কাটিয়া যায়।

আরো দেখ, ছবিতে যে আর্মেচার রহিয়াছে, তাহার বেষ্টনী একটা বাঁকানো কোমল লোহাকে জড়াইয়া আছে। তাহা হইলে বলিতে হয়, অনেক বেষ্টনী এবং তাহাদের ভিতরকার কোমল লোহা লইয়া এই আর্মেচার তৈয়ারি করা হইয়াছে। বেষ্টনীতে কোমল লোহা থাকে বলিয়া যে-চৌম্বকক্ষেত্রে আর্মেচার ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। কাজেই, বেষ্টনীগুলিতে বেশি বিদ্যুৎ জন্মে। এই রকম আর্মেচারকে ঘুরাইয়া যে-যন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়, তাহাকে বলা হয় গ্রামের (Gramme) ডাইনামো। লিগ্ সহরের গ্রাম্ নামে এক বৈজ্ঞানিক ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। বেশি দিন নয়, চব্বিশ বৎসর আগেও গ্রাম্ সাহেব জীবিত ছিলেন।

১৯৭ পৃষ্ঠায় গ্রামের ডাইনামোর একটা সম্পূর্ণ ছবি দিলাম। দেখ, N ও S-চিহ্নিত বৈদ্যুত-চুম্বকের মাঝে আর্মেচার রহিয়াছে। এই আর্মেচারকে ঘোরানো হয় এন্‌জিনের জোরে। হাতের জোরে ঘোরাইতে গেলে অনেক লোকের দরকার হয়। দেখ, ছবিতে এন্‌জিনের C-চিহ্নিত বেল্‌ট্ লাগানো আছে। B-চিহ্নিত ধাতু-ফলক দুটি যন্ত্রের ব্রস্ এবং G তাহার

কমিউটেটার। বৈদ্যুত-চুম্বকের E E-চিহ্নিত জায়গায় কত তার জড়ানো আছে, ছবি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। আর্মেচারের খানিকটা বিদ্যুৎ ঐ তারে চলিয়া বৈদ্যুত-চুম্বকের শক্তি বাড়ায়, কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যুৎই তলাকার দুইটা মোটা তার দিয়া বাহিরে আসে। আবার এ-রকম ডাইনামোও আছে, যাহাতে সমস্ত বিদ্যুৎই বৈদ্যুত-চুম্বকের তারের ভিতর দিয়া চলিয়া বাহিরে আসে। ইহাতে বাহিরের বিদ্যুতের পরিমাণ বিশেষ কমে না, অথচ চুম্বকের ক্ষেত্র খুব জোরালো হইয়া দাঁড়ায়।

তা'ছাড়া এ-রকম ডাইনামোও আছে, যাহাতে কমিউটেটার লাগানো থাকে না। কাজেই, আর্মেচারের ঘোরার সঙ্গে যে উল্টা-পাল্টা অর্থাৎ বিপরীত-দিক্‌গামী বিদ্যুৎ হয়, যন্ত্রের বাহিরের তারে ঠিক সেই-রকম বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। ইংরাজিতে এই ডাইনামোকে বলা হয় অল্‌টারনেটার (Alternator)। যে-বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে দিক্‌-পরিবর্ত্তন করিতেছে, তাহা দিয়া আলো জ্বালাইতে গেলে, আলো স্থির না থাকিয়া দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলারই সম্ভাবনা। এই-রকম দপ্‌দপে চঞ্চল আলোতে রাস্তা-ঘাট বা ঘর-বাড়ি আলো করার কাজ চলে না। কিন্তু

আজকাল যে-সব অল্‌টারনেটার ডাইনামো ব্যবহার করা হইতেছে, সেগুলিতে এই অসুবিধা হয় না। এই-সব যন্ত্রে যে-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ১০০ বার, কখনো কখনো ১২০ বার পর্য্যন্ত দিক্ পরিবর্ত্তন করে। কাজেই, আমাদের চোখে তাহার আলো স্থির বলিয়াই বোধ হয়। এই যন্ত্রের বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহা হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে-বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তাহার প্রবাহক-বল খুব বেশি থাকে। কোনো কোনো যন্ত্রে ইহার পরিমাণ পাঁচ শত ভোল্‌ট পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

যে-সব ডাইনামোর একটিই বড় বড় সহরের রাস্তা-ঘাটে বাতি জ্বালায়, গৃহস্থ বাড়ির পাখা ঘুরায় এবং মোটর চালায়, তাহাতে যে কত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, একবার ভাবিয়া দেখ। কিন্তু সকল সময়েই যে, এন্‌জিনের জোরে ডাইনামো চালানো হয়, তাহা নয়। পাহাড়ে নদী ও জলপ্রপাত হইতে যে-জলস্রোত নীচে নামে, তাহার জোরেও আজকাল অনেক জায়গায় ডাইনামো চালানো হইতেছে। আমাদের দেশের মহীশূর, কাশ্মীর প্রভৃতি জায়গায় জলস্রোতের শক্তিতে ডাইনামো চলিতেছে। আমেরিকায় যে নাইগ্রা

জল-প্রপাত আছে তাহার শক্তিতে ডাইনামো চালাইয়া অতি অল্প খরচে অনেক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। তাই সেখানকার ঘরে ঘরে বিদ্যুতের বাতি জ্বলে এবং নানা

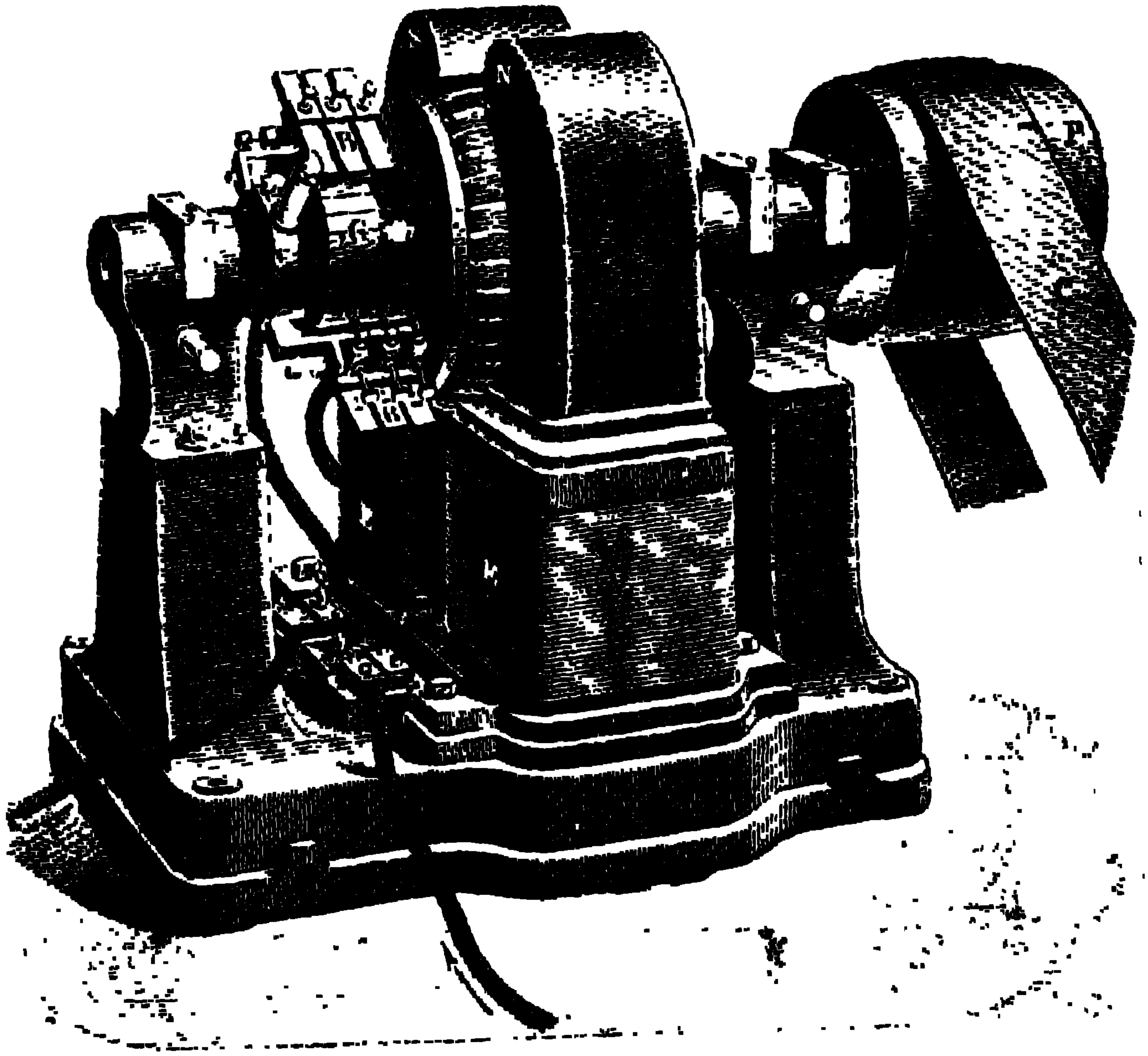

ডাইনামো

রকম কল কেবল বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হয়। কয়লার বা তেলের আগুনে এন্‌জিন্‌ চালাইয়া বিদ্যুৎ

উৎপন্ন করিতে গেলে, সেখানে বিদ্যুৎ কখনই সস্তা হইত না। বাংলা দেশের সর্ব্বত্র কয়লা বা কেরোসিন্ পুড়াইয়া এন্‌জিন্ চালানো হয় এবং সেই এন্‌জিনের জোরে ডাইনামোর আর্মেচার ঘোরে। এইজন্য এ-দেশে বিদ্যুতের এত বেশি দাম। তিস্তা নদীর জলস্রোতের জোরে দার্জ্জিলিঙে ডাইনামো চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে দার্জ্জিলিঙে সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে।

বৈদ্যুত মোটর

ডাইনামোতে বাহিরের শক্তি বিদ্যুতের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ যখন গায়ের জোরে বা এন্‌-জিনের জোরে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করি, তখন গায়ের বা এন্‌জিনের শক্তিই বিদ্যুতের রূপ পায়। যে-যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ইহারি উল্‌টা প্রণালীতে বৈদ্যুত শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে (Mechanical Energy) পরিণত করিতে পারি, তাহাকেই বলা হয় মোটর। ডাইনামোর বিদ্যুৎ ট্রামগাড়ির কলে প্রবেশ করিয়া চাকাকে ঘোরায় এবং গাড়ি আপনিই রেলের উপর দিয়া চলে। সুতরাং, ট্রামগাড়ির কলকে বলিতে হয় মোটর। ময়দার কলে বিদ্যুতের তার লাগাইয়া দাও, কলের ভিতরে গিয়া বিদ্যুৎ যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইবে এবং তাহা গমকে পিষিয়া ময়দা করিয়া দিবে। সুতরাং, ময়দার কলকেও বলিতে হয় মোটর। আজকাল সহরের ঘরে-ঘরে যে রকম-রকম মোটর দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ করি তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না। কূয়ো হইতে জল তোলা, বোট্ ও পাখা চালানো, এমন কি

ঘর ঝাঁট্ দেওয়ার কাজও মোটরের সাহায্যে করা হইতেছে। বিদ্যুতের শক্তি মোটরে আসিয়া যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয় বলিয়াই, এই-সব কাজ চলে।

মোটরের গঠন অবিকল ডাইনামোরই মতো। তাহাতে ডাইনামোর মতো বৈদ্যুত চুম্বক, আর্মেচার, কমিউটেটার প্রভৃতি সকল অংশই থাকে। তফাতের মধ্যে এই যে, এই যন্ত্রের আর্মেচারের বেষ্টনীর ভিতর দিয়া বিদ্যুতের প্রবাহ চালানো হয়। চুম্বকের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-যুক্ত বেষ্টনী থাকিলে তাহা যে আপনিই ঘুরিয়া বেড়ায়, তোমরা তাহা আগে দেখিয়াছ। এখানে তাহাই ঘটে। মোটরের ব্রসের সঙ্গে বাহিরের বিদ্যুতের তারের দুই প্রান্ত যোগ করিলেই, সেই বিদ্যুৎ কমিউটেটারের ভিতর দিয়া আর্মেচারের বেষ্টনীতে যায়। তার পরে বেষ্টনী আপনা হইতেই চৌম্বকক্ষেত্রে ঘুরিয়া দাঁড়ায়। ভিন্ন-মুখো বিদ্যুৎ-প্রবাহ যেমন কমিউটেটারের সাহায্যে এক-মুখো হয়, এখানে এক-মুখো বিদ্যুৎ-প্রবাহ কমিউটেটার দিয়া বেষ্টনীতে পৌঁছিবার সময়ে ক্ষণে-ক্ষণে ভিন্নমুখী হইয়া পড়ে। কাজেই, ইহাতে বেষ্টনী ও আর্মেচার অবিরাম ঘুর-পাক্ খাইতে থাকে। আমরা আর্মেচারের এই গতি

লইয়া ট্রামগাড়ি, পাখা এবং আরো অনেক যন্ত্র চালাই।

তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত ইলেক্‌ট্রিক ট্রামে চড়িয়াছ। যেখানে দাঁড়াইয়া ড্রাইভার ট্রাম চালায়, সেখানে একটা মোটর থাকে। বিদ্যুতের কারখানা হইতে আসিয়া যে-বিদ্যুৎ রাস্তার ধারের তার দিয়া চলিতে থাকে, তাহাতেই এই মোটর চালানো হয়। রাস্তার তারের বিদ্যুৎ কি-রকমে মোটরের আর্মেচারে আসে, তাহা বোধ করি তোমরা দেখিয়াছ। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, গাড়ির ছাদের উপরকার একটি দাণ্ডা সর্ব্বদা রাস্তার তারকে ছুঁইয়া চলিতেছে। এই দাণ্ডার সঙ্গে মোটরের ব্রসের যোগ থাকে। তাই, তারের বিদ্যুৎ আর্মেচারের ভিতরে চলিয়া ট্রাম্‌ রাস্তার লোহার রেলে গিয়া পৌঁছে এবং তার পরে তাহা সেখান হইতে রেল ধরিয়া বিদ্যুতের কারখানায় হাজির হয়। এই-রকমে মোটরের আর্মেচার দিয়া একটা বিদ্যুতের প্রবাহ অবিরাম চলে বলিয়াই সেই আর্মেচার ঘুরিয়া ট্রামগাড়িকে চালাইতে থাকে। ইলেক্‌ট্রিক লঞ্চ অর্থাৎ বৈদ্যুতিক নৌকাও ঐ-রকমে চলে। সঞ্চয়ক কোষ ইহাদের মোটরে বিদ্যুৎ জোগায়।

যে-সব বাড়িতে বিদ্যুতের জোরে পাখা চলে বা আলো জ্বলে, সেখানকার স্যুইচ্-বোর্ডে ঘড়ির মতো একটা যন্ত্র লাগানো থাকে। আলো জ্বালাইতে বা পাখা ঘুরাইতে কত বিদ্যুৎ খরচ হইল, যন্ত্রের কাঁটা দেখিয়া তাহা জানা যায়। এই যন্ত্রকে বলা হয় মিটার (Meter)। মিটারের কাঁটা সপ্তাহে বা মাসে কতটা সরিয়া গেল, তাহা দেখিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানি গৃহস্থের কাছ হইতে বিদ্যুতের দাম আদায় করিয়া লয়। তোমরা সকলে বোধ করি মিটারের ভিতরকার কল দেখ নাই। খুলিলে দেখা যায়, উহার আবরণের মধ্যে একটা ছোটো মোটর রহিয়াছে। তাহাতে বৈদ্যুত চুম্বক, বেষ্টনী, আর্মেচার প্রভৃতি সকলি আছে। স্যুইচ্ টিপিলে যেমনি ঘরের আলো জ্বলিয়া উঠে এবং পাখা ঘুরিতে থাকে, অমনি সেই বিদ্যুতেরই একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ মিটারের মোটরে গিয়া তাহার আর্মেচারকে ঘুরাইতে আরম্ভ করে। আর্মেচারের সঙ্গে যে-কাঁটা লাগানো থাকে, তাহা ইহাতে সরিয়া যায়। এই-রকমে কাঁটা কত সরিল দেখিয়া, বিদ্যুতের কতটা শক্তি খরচ হইল, ধরা পড়ে।

বিদ্যুতের সামর্থ্য (Power) অর্থাৎ কাজের

হার কি-রকমে জানা যায়, তোমাদিগকে তাহা আগেই বলিয়াছি। কোনো প্রবাহের আম্পিয়ারের পরিমাণকে তাহার ভোল্‌ট্ দিয়া গুণ করিলে যাহা হয়, তাহাই উহার কাজের হার। কাজের হারকে বলা হয় ওয়াট (Watt)। কিলোওয়াটের অর্থাৎ হাজার ওয়াটের এক ঘণ্টার কাজকে মিটারে "১" চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ কাঁটা ঘুরিয়া যখন ১-এর ঘরে দাঁড়ায়, তখন বুঝিতে হয়, এক ঘণ্টায় এক হাজার ওয়াটে যে-কাজ পাওয়া যায়, বিদ্যুৎ দ্বারা আমরা সেই কাজ পাইয়াছি। সেই রকম ২-এর ঘরে দাঁড়াইলে বুঝিয়া লইতে হয়, এক হাজার ওয়াট্ দুই ঘণ্টা ধরিয়া বা দুই হাজার ওয়াট্ এক ঘণ্টা ধরিয়া যে-কাজ করে, বিদ্যুতে সেই কাজ পাওয়া গিয়াছে। এই-রকমে এক হাজার ওয়াটের এক ঘণ্টার কাজকে এক মাত্রা (Unit) ধরিয়া ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানি গৃহস্থদের কাছ হইতে দাম আদায় করে। বিদ্যুতের কাজের এই মাত্রাকে বলা হয় ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিট্ (British Trade Unit) বা B. T. U. বিদ্যুতের এক ইউনিট্ কাজের জন্য কলিকাতায় ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানি তিন আনা দাবি করে। মান্দ্রাজে তাহারি দাম অনেক কম।

আমাদের দেশে কয়লার বা পেট্রোলিয়মের আগুনে এন্‌জিন্‌ চালানো হয়। তার পরে সেই এন্‌জিনের জোরে ডাইনামো চালাইলে যে-বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের বাড়িতে গিয়া বাতি জ্বালায় বা পাখা ঘোরায়। এই-সব হাঙ্গামার জন্য এদেশে বিদ্যুতের দাম বেশি। নদীর বা জলপ্রপাতের স্রোতের জোরে যে-সব দেশে ডাইনামো চলে, সেখানে বিদ্যুৎ খুব সস্তা।

ট্রান্স্‌ফরমার্‌

তোমরা রুম্‌কর্ফ-বেষ্টনীতে দেখিয়াছ, ইহার মুখ্য বেষ্টনীর তারে সামান্য বিদ্যুৎ চালাইলে গৌণ বেষ্টনীতে প্রবল প্রবাহক-বলের বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। ইহারি উল্‌টা প্রক্রিয়ায় বেশি প্রবাহক-বলের বিদ্যুৎকে যে অল্প প্রবাহক-বলে পরিণত করা যায়, তাহা ফ্যারাডে সাহেব সর্ব্বপ্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

পরপৃষ্ঠার ছবিটি দেখ। কোমল লোহার কতকগুলি তারকে গোলাকারে বাঁকাইয়া N-চিহ্নিত আংটি তৈয়ারি করা হইয়াছে। তারপরে দেখ, সেই আংটিতেই I এবং II-চিহ্নিত রেশম-মোড়া তার জড়ানো হইয়াছে। এখন যদি I তার দিয়া রুমকর্ফ-বেষ্টনীর বা (Alternator) ডাইনামোর বিদ্যুৎ চালানো যায়, তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না কি? বিদ্যুৎ চালানো বা বন্ধ করার সময়ে II-চিহ্নিত তারে এক-একটি ক্ষণিক প্রবাহের আবেশ হয়। কেন ইহা হয়, বলা কঠিন নয়। I তারে বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ

করিলেই, লোহার আংটি চুম্বক হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার বল-রেখাগুলি II তারের বেষ্টনীর ভিতর দিয়া চলে। কাজেই, আংটির চুম্বক-শক্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দ্বিতীয় বেষ্টনীর তারে বিদ্যুতের আবেশ হয়।

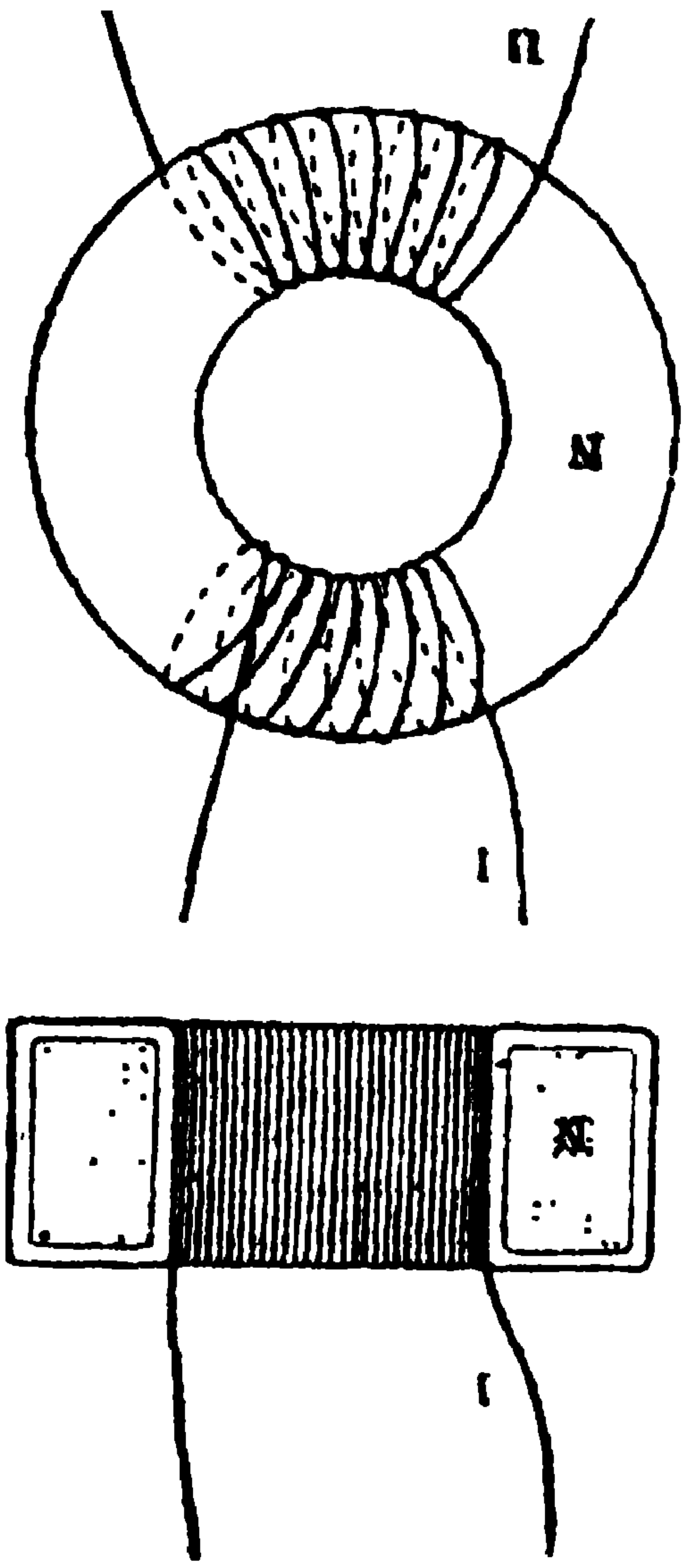

ট্রান্সফর্মার্

এখন মনে করা যাউক, I বেষ্টনীর তার যেন খুব মোটা এবং আংটির গায়ে তাহা দশ বা বারো প্যাঁচের বেশি জড়ানো নাই। কিন্তু II বেষ্টনীতে রহিয়াছে সরু তারের এক হাজার বা দুই হাজার প্যাঁচ। এখন I বেষ্টনীতে থামিয়া থামিয়া বিদ্যুৎ চলিলে II বেষ্টনীর অবস্থা কি হইবে বলা যায় না কি? ইহাতে এক হাজার প্যাঁচ রহিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক প্যাঁচে যে প্রবাহক-বলের আবেশ হইবে, তারের দুই প্রান্তে তাহারি হাজার গুণ প্রবাহক-বল দেখা যাইবে। যে-বিদ্যুতের প্রবাহক-বল খুব কম, এই-রকমে তাহার প্রবাহক-

বলকে বাড়াইয়া দূরে চালানো হইতেছে। কেবল ইহাই নয়, যে-বিদ্যুতের প্রবাহক-বল বেশি, উহারি বিপরীত প্রক্রিয়ায় তাহার প্রবাহক-বলকে কমাইয়া কাজে লাগানো সম্ভব হইয়াছে।

একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি তোমরা বিষয়টা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিবে। মনে কর, ১০,০০০ ওয়াটের বিদ্যুৎকে আমরা যেন তার দিয়া ২৫ মাইল দূরে লইয়া যাইতে চাই। ওয়াট্ কাহাকে বলে, তোমাদিগকে তাহা অনেক বার বলিয়াছি। কোনো প্রবাহের বিদ্যুতের পরিমাণ অর্থাৎ আম্পিয়ারকে তাহার ভোল্ট্ অর্থাৎ প্রবাহক-বল দিয়া গুণ করিলে ওয়াট্ পাওয়া যায়। এই প্রবাহের কার্য্যকারী শক্তি অর্থাৎ সামর্থ্যকেই বলা হয় ওয়াট্। সুতরাং ১০,০০০ ওয়াট্কে আমরা ১০০০ আম্পিয়ার এবং ১০ ভোল্ট্ করিয়া, অথবা ১০ আম্পিয়ার এবং ১০০০ ভোল্ট্ করিয়া দূরে লইয়া যাইতে পারি। কারণ, ১০০০ এবং ১০ এর গুণফল যাহা, ১০ এবং ১০০০-এর গুণফল তাহাই। কিন্তু এই দুই উপায়ের কোন্টা সুবিধাজনক? ১০ ভোল্টের বিদ্যুৎকে দূরে লইয়া কাজ চালাইতে গেলে সংযোজক তারকে খুব মোটা

করিতে হয়। সরু তারের চেয়ে মোটা তারের দাম বেশি। কাজেই, অপর উপায়ে ১০০০ ভোল্‌টের বিদ্যুৎকে সরু তারের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়াই সুবিধাজনক। বিদ্যুতের ভোল্‌ট অর্থাৎ প্রবাহক-বল বাড়ানোর কাজটি ট্রান্সফর্‌মার্‌ (Transformer) দ্বারা করিয়া আজকাল সরু তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎকে দূরে লওয়া হইতেছে।

কিন্তু বেশি প্রবাহক-বলের বিদ্যুতেও অসুবিধা আছে অনেক। ইহা দিয়া আলো জ্বালিতে গেলে বাতি পুড়িয়া যায়, ইহার তার কোনো রকমে হঠাৎ গায়ে ঠেকিলে বিপদ্‌ হয়। তাই প্রবাহক-বল বাড়াইয়া যে-বিদ্যুৎকে লওয়া হইয়াছে, তাহার প্রবাহক-বল না কমাইলে কাজের সুবিধা হয় না। ইহাও ট্রান্‌স্‌ফরমার্‌ দ্বারা করা হয়। ট্রান্‌স্‌ফর্‌মারের যে-বেষ্টনীতে সরু-তারের পাক বেশি আছে, তাহা দিয়া এই বিদ্যুৎকে চালাইতে থাকো, তাহা হইলে ইহার যে বেষ্টনীতে কয়েক প্যাঁচ মাত্র মোটা তার আছে, তাহাতে অল্প প্রবাহক-বলের বিদ্যুৎ আবিষ্ট হইবে। তাহা হইলে দেখ, প্রবাহক-বল বাড়াইয়া বিদ্যুৎকে দূরে লইয়া যাওয়া এবং সেখানে সেই প্রবাহক-বলকে কমাইয়া

কাজে লাগানোর কেমন সুব্যবস্থা এই যন্ত্রে রহিয়াছে।

বড় বড় আল্টারনেটার ডাইনামোতে আজকাল যে জোরালো বিদ্যুৎ হয়, দূরে লইয়া গিয়া এই-রকমেই তাহার প্রবাহক-বল কমানো হইতেছে এবং তার পরে উহা দিয়া আলো জ্বালার কাজ চলিতেছে। কেবল ইহাই নয়, আল্টারনেটার ডাইনামোর বিপরীত-দিক্‌গামী ক্ষণিক বিদ্যুৎকে এই উপায়ে দূরে লইয়া যাওয়ার পরে কমিউটেটর দ্বারা এক-মুখো করা হইতেছে এবং তাহা দিয়া ট্রামগাড়ী ও মোটর প্রভৃতিও চালানো যাইতেছে। আমেরিকার নায়গ্রা জলপ্রপাতের জলধারার জোরে যে-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রবাহক-বল থাকে ২৫০০ ভোল্টের সমান। ট্রান্স্ফর্মার দ্বারা সেই বলকে ১২০০০ ভোল্ট করিয়া সরু তারে কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে লইয়া যাওয়া হয় এবং তার পরে আর এক ট্রান্স্ফর্মার দিয়া সেই প্রবাহক-বলকে কমাইয়া ইচ্ছামতো কাজে লাগানো হইতেছে। দেখ, ট্রান্স্ফর্মারে সুবিধা কত। কিন্তু মনে রাখিয়ো, যে-বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে থামিয়া উল্‌টা-পাল্‌টা প্রবাহিত হয়, কেবল তাহাতেই ট্রান্স্ফর্মার ব্যবহার করা

চলে। এক-মুখো বিদ্যুৎ অবিচ্ছেদে চলিলে, তাহা কাছের বেষ্টনীতে বিদ্যুতের আবেশ করিতে পারে না। কাজেই, সে-রকম বিদ্যুতে ট্রান্‌স্‌ফর্‌মারের সাহায্যে কাজ পাওয়া যায় না।

টেলিফোন্

পাঁচ বা দশ হাজার মাইল দূরে কি-রকমে টেলিগ্রাফের সঙ্কেত পাঠানো যায়, তোমাদিগকে তাহা আগে বলিয়াছি। টেলিফোন্ আর এক রকম খবর পাঠানোর যন্ত্র। ইহাতেও তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলে। কিন্তু খবর সঙ্কেত দ্বারা যায় না। আমরা যে-রকম কথাবার্ত্তা বলি, হুবহু সেই-রকম কথাই এই যন্ত্রের বিদ্যুতের সাহায্যে বহু দূরে যায়। আজকাল টেলিফোনে পাঁচ শত বা হাজার মাইল তফাতের লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালানো হইতেছে। আশ্চর্য্য নয় কি? তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ টেলিফোন্ দেখিয়াছ এবং টেলিফোনে কথাবার্ত্তাও শুনিয়াছ। কলিকাতা প্রভৃতি বড় সহরের অনেক বাড়িতে এবং আফিসে টেলিফোন্ আছে। তা'ছাড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আজকাল টেলিফোন্ ব্যবহার করা হইতেছে। কখন্ ট্রেন্ ছাড়িল বা আসিল, এই-রকম খবর টেলিগ্রাফে না পাঠাইয়া আজকাল টেলিফোনে বলা হইতেছে।

টেলিফোন্ যন্ত্রের সব কথা বুঝিতে গেলে, কি-রকমে আমরা শব্দ শুনিতে পাই তাহা জানা দরকার। তাই সেই কথাটি তোমাদিগকে অতি-সংক্ষেপে আগেই বলিয়া রাখিতেছি। কোনো জিনিষে ঘা দিলে তাহা কাঁপে, ইহা বোধ করি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। পেটা ঘড়িতে মুগুর পিটাইলে ঘড়ি কাঁপে, হাত হইতে থালা বা বাটি পড়িয়া গেলে তাহাও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। এই কাঁপুনির কি ফল হয়, তাহা তোমরা সকলেই জানো। বিশ্রী শব্দ হয়! যেন কান জ্বালা করে। যে পেটাঘড়ি কাঁপিতেছে, হাত ছোঁয়াইয়া তাহার কাঁপুনি বন্ধ কর। দেখিবে, কাঁপুনি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে শব্দও বন্ধ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, জল নাড়াইলে যেমন জলে ঢেউ উঠিয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলে, বাতাসে কোনো জিনিষকে কাঁপাইতে থাকিলে বাতাসেও সেই-রকম ঢেউ উঠে এবং তাহা বাতাসের ভিতর দিয়া চারিদিকে চলিতে থাকে। এই সকল ঢেউ যখন কানে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখনি আমরা শব্দ শুনিতে পাই। তুমি যখন কথা বলিতে থাকো, তখনো এই-রকমে শব্দ শুনা যায়। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার গলার ভিতরকার

একটা অংশ কাঁপে এবং সেই কাঁপুনিতে মুখের ভিতরকার বাতাস কাঁপিয়া বাহিরের বাতাসে ঢেউ তোলে। তার পরে সেই ঢেউ, যেই আমাদের কানে আসিয়া ধাক্কা দেয়, অমনি তোমার কথাগুলি শুনিতে পাই। ঢাকের আওয়াজ, মেঘের ডাক, বাঁশীর স্বর, পাখীর ডাক, ঢেঁকির কচ্‌কচি প্রভৃতি সব শব্দই এই-রকমে শুনা যায়। তোমরা শব্দের উৎপত্তির এই কথাগুলি মনে রাখিয়ো।

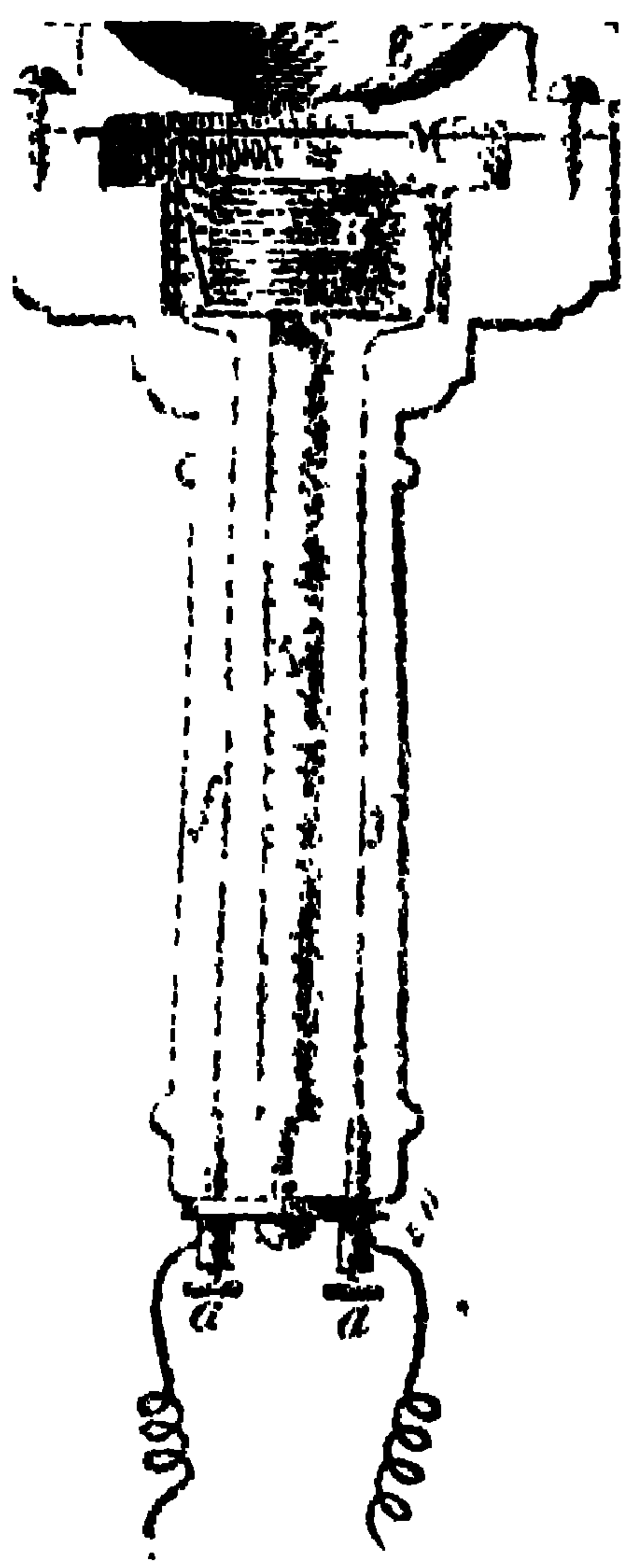

বেলের টেলিফোন্

এখন টেলিফোনের কথা বলা যাউক। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে আমেরিকার গ্রেহাম্ বেল্ (Graham Bell) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক যে-টেলিফোন্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহারি একটা ছবি দিলাম। ছবির A-চিহ্নিত অংশটি একটি ইস্পাতের চুম্বক। B অংশটি তাহারি এক প্রান্তে জড়ানো রেশম-মোড়া তারের বেষ্টনী। দেখ, এই তারেরই f f-চিহ্নিত দুই

প্রান্তে a a স্ক্রুপ আসিয়া ঠেকিয়াছে। বেষ্টনীর সম্মুখের M অংশটি কোমল লোহায় তৈয়ারি একটা গোলাকার পাত্‌লা পাত। ইহা এত পাত্‌লা যে, E-চিহ্নিত জায়গায় মুখ রাখিয়া কথা বলিলে শব্দের ঢেউয়ে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে থাকে।

টেলিগ্রাফ্‌ যন্ত্রে যেমন বিদ্যুৎ-কোষ থাকে, এই যন্ত্রে সে-রকম কোষের দরকার হয় না। যন্ত্রে কথা বলিলে আপনা হইতে যে-বিদ্যুৎ হয়, তাহা টেলিগ্রাফের বিদ্যুতের মতো তার দিয়া চলিয়া দূরে যে-যন্ত্র থাকে, তাহাতে মানুষের গলার কথা মতো কথা উৎপন্ন করে। ছবিতে যে f f-চিহ্নিত তার রহিয়াছে, তাহাকেই লাইনের দুই তারে সংযুক্ত রাখিতে হয়, কিংবা যন্ত্রের দুই তারের মধ্যে একটিকে মাটিতে পুতিয়া অপরটিকে লাইনের তারে সংযুক্ত রাখিলেও চলে। এই ব্যবস্থায় লাইনের একটা তারেই কথা চলে।

তোমরা আগেই দেখিয়াছ, কোনো বেষ্টনীর কাছে তাড়াতাড়ি একটা চুম্বককে আনিলে বা বেষ্টনী হইতে চুম্বকটিকে দূরে লইয়া গেলে, তাহাতে বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রবাহের আবেশ হয়। টেলিফোনের কাজ এই ব্যাপারটিকে লইয়াই চলে।

মনে কর, আমরা E-চিহ্নিত মাউথ্-পিসে (Mouth Piece) মুখ রাখিয়া কোনো কথা বলিতেছি। ইহাতে যন্ত্রের ভিতরে কি হইবে, অনায়াসে বলা চলে। প্রথমে গলার শব্দের ঢেউয়ে M-চিহ্নিত লোহার পাতটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। কাজেই, ইহাতে B-চিহ্নিত বেষ্টনীর বলক্ষেত্রের শক্তির পরিবর্ত্তন হইবে এবং তাহারি ফলে f f তারের ভিতরে ক্ষণিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া তাহা দূরের ষ্টেশনের টেলিফোনের বেষ্টনীর ভিতর দিয়া চলিতে থাকিবে। এই বেষ্টনীর ভিতরেও ইস্পাতের চুম্বক আছে এবং তাহার সম্মুখে M-এর মতো কোমল লোহার পাতও আছে। সুতরাং যেমনি বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রবাহ চলিয়া বেষ্টনীর চুম্বক-শক্তির পরিবর্ত্তন করিবে, তেমনি তাহার সম্মুখের লোহার পাতের কাঁপুনি দেখা যাইবে। আমরা কথা কহিয়া প্রথম টেলিফোনের লোহার পাতকে যেমনটি কাঁপাইয়াছিলাম, দূরের টেলিফোনের পাতের কাঁপুনি ঠিক্ তাহারি মতো হইবে। কাজেই, এখন যদি কেহ এই টেলিফোনে কান লাগাইয়া থাকে, তবে প্রথম টেলিফোনে যে-কথাগুলি বলা হইয়াছিল, চার-পাঁচ শত মাইল

তফাতে থাকিয়াও সে অবিকল সেই কথাগুলি শুনিতে পাইবে।

ইহাই টেলিফোনের মোটামুটি ব্যাপার। এই-রকম যন্ত্রেই বহুকাল ধরিয়া কথাবার্ত্তা চালানো হইত। কিন্তু আজকাল আমাদের সহরে যে-সব টেলিফোন্ ব্যবহার করা হয়, তাহার গঠনে তফাৎ আছে। কিন্তু মূল ব্যাপার একই। টেলিফোনের উদ্ভাবক বেল্ সাহেব তাঁহার যন্ত্র দিয়া আড়াই শত মাইল দূরে কথাবার্ত্তা চালাইতেন। আজকালকার যন্ত্র দিয়া পাঁচ হাজার মাইল দূরের ষ্টেশনের সঙ্গেও কথা বলা চলিতেছে! বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য্য কাজ দেখিয়া সত্যই অবাক্ হইতে হয়।

মাইক্রোফোন্

যে-সব ছোটো জিনিষকে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাহাদিগকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করি। ইহাতে খুব ছোটো জিনিষকে বড় দেখায়। যে মৃদু শব্দকে কানে শুনা যায় না, এক-রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়া তাহা সুস্পষ্ট শুনা যায়। এই যন্ত্রের নাম মাইক্রোফোন্ (Microphone)। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে অধ্যাপক হিউগিস্ (Hughes) ইহার উদ্ভাবন করেন। এখানে তোমাদিগকে মাইক্রোফোনের একটু পরিচয় দিব।

ব্যাপারটি বিশেষ কিছুই নয়। পরপৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, A এবং B দুইটা ধাতুর ফলক রহিয়াছে। এই ফলক দুটির সঙ্গে C C¹-চিহ্নিত জায়গায় স্ক্রুপ আঁটা আছে। এবং তাহারি সঙ্গে P ব্যাটারির তারের দুই প্রান্ত সংযুক্ত রহিয়াছে,—মাঝে আছে T-চিহ্নিত টেলিফোন। ছবির M-চিহ্নিত জিনিষটা দুই-মুখ-ছুঁচ্লো একটা জমাট কয়লার পেন্‌সিল্। ইহা A এবং B-কে অতি-আল্‌গাভাবে ছুঁইয়া আছে। যখন ব্যাটারির বিদ্যুৎ

তার এবং কয়লার পেন্‌সিলের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে, তখন যন্ত্রের নীচেকার অতি-সামান্য শব্দ হইলেও তাহা টেলিফোনে বড় করিয়া শুনা যায়।

ছবিতে দেখ, পীঠের উপরে একটা খুব ছোটো

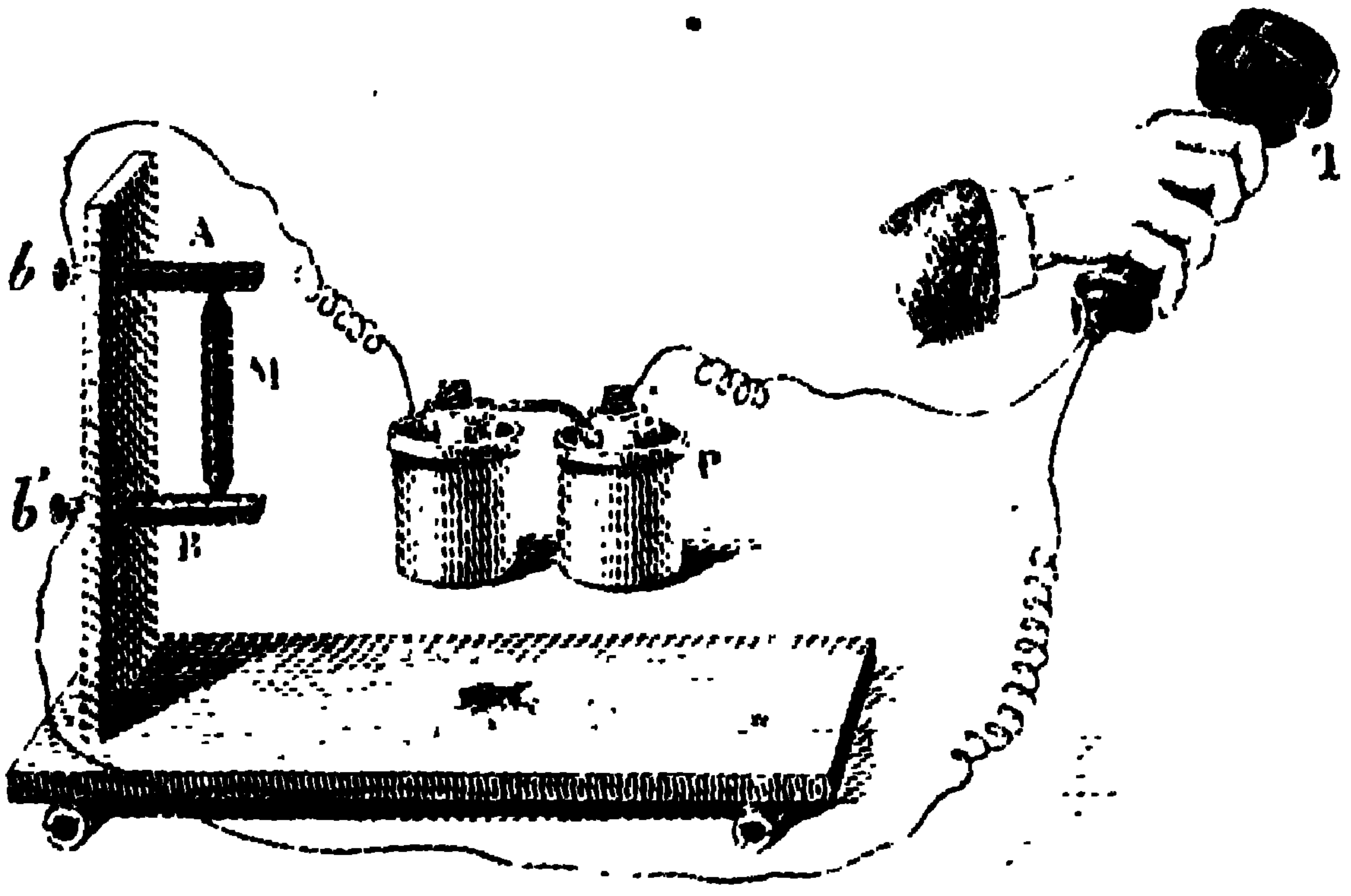

মাইক্রোফোন্

পোকা রহিয়াছে। গরু বা ঘোড়া যখন চলিয়া বেড়ায়, তখন তাহার পায়ের শব্দ শুনা যায়। কিন্তু আরসুলা বা মাছির চলার শব্দ কখনই কানে আসে না। মাইক্রোফোনে শুনিলে এই শব্দও সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

কেন ইহা ঘটে, বলা কঠিন নয়। পোকার

চলা-ফেরার সঙ্গে যন্ত্রের কাঠ কাঁপে এবং সেই কাঁপুনি কাঠের ভিতর দিয়া চলিয়া যখন কয়লার পেন্সিলে ঠেকে, তখন তাহাও কাঁপে। ইহাতে পেন্সিল্ তাহার উপর-নীচের ধাতুফলকের গায়ে থাকিয়া থাকিয়া বেশি চাপ দিতে থাকে। চাপ যখন বেশি পড়ে, তখন ধাতু ও কয়লার সংযোগ ভালো হয়। কাজেই, এই অবস্থায় কোষের বিদ্যুৎ সহজে চলিবার পথ পায়। এই-রকমে কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে কখনো বেশি এবং কখনো কম বিদ্যুৎ চলিয়া টেলিফোনের সেই লোহার পাতকে কাঁপাইতে থাকে। কাজেই, টেলিফোনে কান রাখিলে শব্দ শুনা যায়। এই-রকমে মাইক্রোফোন্ দ্বারা মৃদু শব্দ প্রবল হইয়া উঠে।

বাষ্পের ভিতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ

বাতাস বা অপর বায়বীয় পদার্থ বিদ্যুতের অপরিচালক। ইহা তোমরা নানা পরীক্ষায় দেখিতে পাইয়াছ। রুম্‌কর্ফ-বেষ্টনীর দুইটি তারকে কাছাকাছি না রাখিলে এক তার হইতে অন্য তারে বিদ্যুৎ যায় না। কারণ, মাঝের বাতাস বিদ্যুতের পথে বাধা দেয়। সেই রকম উইমহর্ষ্ট বৈদ্যুত-যন্ত্র হইতে দশ গজ দূরে দাঁড়াইলে স্ফুলিঙ্গ গায়ে ঠেকে না। মাঝের অপরিচালক বাতাস বিদ্যুতের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে বাতাস নাই সেখানে বিদ্যুতের যে-প্রবাহ চলে, তাহার আশ্চর্য্য কাজ দেখা যায়। গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের পরীক্ষা দ্বারা এসম্বন্ধে যে-সকল আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাঁর কথা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

এখানকার ছবিটি দেখ। একটা কাচের নলের দুই প্রান্তে দুইটা প্লাটিনমের তার বসাইয়া সেই নলের ভিতর হইতে খানিকটা বাতাস বাহির করা হইয়াছে। এখন রুমকর্ফ-বেষ্টনীর তারের দুই প্রান্ত নলের দুই প্রান্তের প্লাটিনমে লাগাইয়া তোমরা যদি

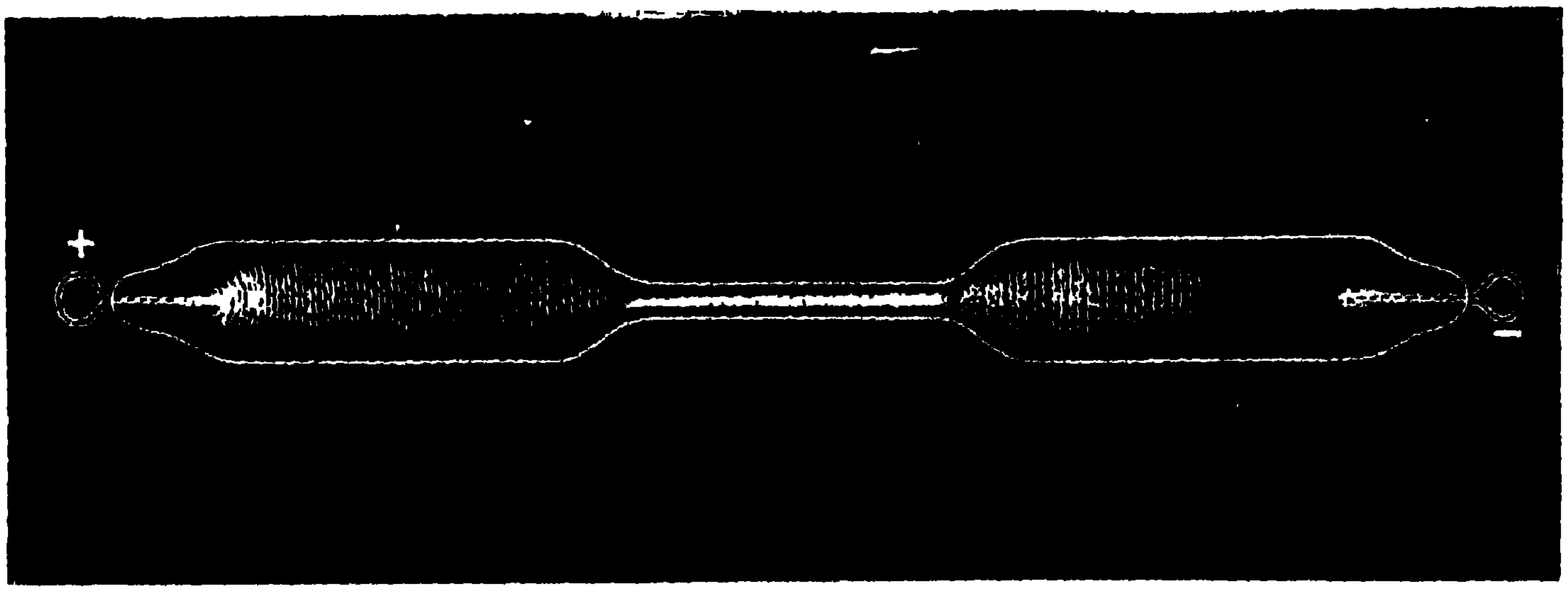

গেস্লারের নল

বিদ্যুৎ চালাইতে থাকো, তাহা হইলে অতি-আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইবে। নলের ভিতরে অতি অল্পই বাতাস আছে। সুতরাং এখন সেখানকার বাতাসের চাপ কমিয়া যাওয়ায় নলের ভিতরকার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নলের ভিতরে সুন্দর আলো দেখা যাইবে। নলে অত্যল্প হাইড্রোজেন্ বাষ্প থাকিলে সেই আলোর রঙ্ হইবে গোলাপী, এবং অঙ্গারক

বাষ্প থাকিলে তাহাই হইয়া দাঁড়াইবে ফুট্ সাদা। গেস্‌লার (Geissler) নামে এক জন বৈজ্ঞানিক ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া এই নলের নাম দেওয়া হইয়াছে (Geisslers' tube) অর্থাৎ গেস্‌লারের নল।

গেস্‌লারের নল অনেক দিন ধরিয়া কেবল বৈজ্ঞানিক খেলনার মতো করিয়া ব্যবহার করা হইতেছিল। ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক সার্ উইলিয়ম ক্রুক্সের (Crookes) পরীক্ষায় ইহা যে কেবল খেলনা নয়, তাহা জানা গিয়াছিল। তিনি নলকে প্রায় বাষ্প-শূন্য করিয়া পরীক্ষা করার সময়ে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার ভিতরকার রঙিন্ আলো লোপ পায় এবং নলের ঋণ প্রান্ত হইতে এক-রকম অণুর প্রবাহ সোজা পথে অপর প্রান্তের দিকে ছুটিয়া চলে। মাঝে কোনো বাধা থাকিলে এই প্রবাহ তাহা ভেদ করিয়া চলিতে পারে না। ক্রুক্স যে-রকম নল লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাকে বলা হয় ক্রুক্সের নল (Crooke's tube)।

পরপৃষ্ঠায় ক্রুক্সের নলের একটা ছবি দিলাম। দেখ, প্রায় বাষ্পশূন্য নলের দুই জায়গায় খুব জোরালো

ব্যাটারির দুই প্রান্ত লাগানো হইয়াছে। বিদ্যুৎ চলিবার সময়ে ঋণ-প্রান্ত হইতে যে-অণুর প্রবাহ

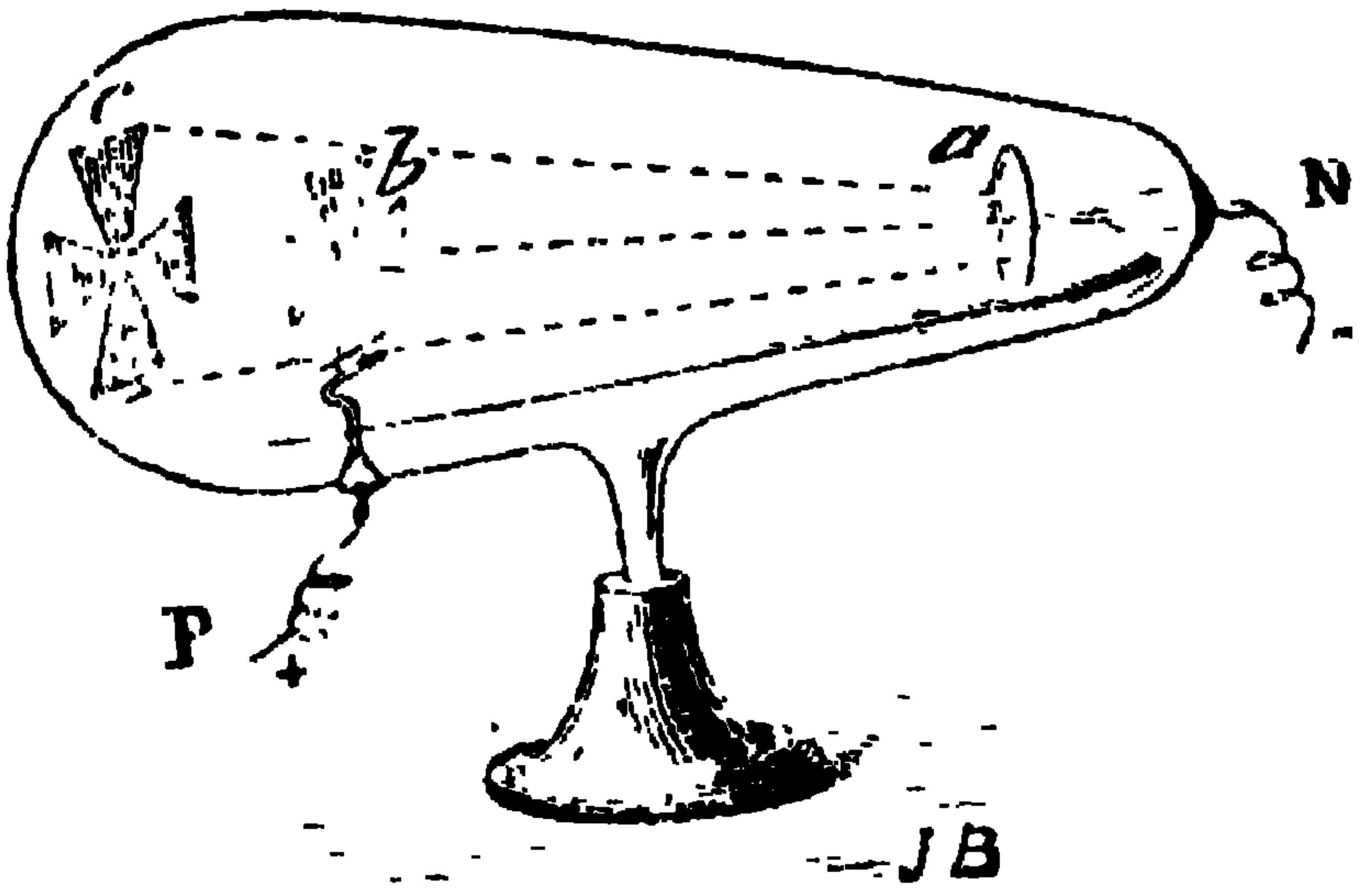

ক্রুক্সের নল

চলিতেছিল, তাহা C-চিহ্নিত অবরোধে বাধা পাইয়া নলের গায়ে C-চিহ্নিত ছায়া ফেলিয়াছে। এই আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকগণ অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। এই অণু-প্রবাহের উৎপত্তি কি-রকমে হইল, কেহই অনেক দিন ঠিক করিতে পারেন নাই। কত বেগে প্রবাহ চলে, হিসাব করিতে গিয়া দেখা গেল, উহা সেকেণ্ডে আঠারো হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলিতেছে। নলের বাহিরে চুম্বক রাখিয়া জানা গেল, কণিকাগুলি চুম্বকের আকর্ষণে সাড়া দেয়। ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পেরিন্ (Perrin) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সে-গুলি ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ।

তারের ঋণ-প্রান্ত (Cathode) হইতে প্রবাহ বাহির হয় বলিয়া, বার্লিনের বৈজ্ঞানিক গোল্ডষ্টেন্ (Goldsten) ইহার নাম দিলেন (Cathode rays) অর্থাৎ ঋণ-রশ্মি। নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ বহু বৎসর পরীক্ষা করিয়া এই ঋণ-রশ্মির কণিকাগুলিকে এখন ইলেক্‌ট্রন্ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। নলের ভিতরে যে-বাষ্পের পরমাণু থাকে, তাহাই ভাঙিয়া-চুরিয়া ইলেক্‌ট্রন্ হয়। তাহা হইলে দেখ, আজকালকার পণ্ডিতেরা যে-ইলেক্‌ট্রন্‌কে জড়ের মূল উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অবিষ্কার হইয়াছিল, একটা বৈজ্ঞানিক খেলনার ভিতরে। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

কিন্তু এখানেই শেষ হয় নাই। আমরা যাহাকে এক্স-রে (X-Rays) বলি, তাহাও ক্রুক্সের নলে ধরা পড়িয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাভেরিয়াবাসী বৈজ্ঞানিক রন্‌জেন্ (Rontgen) ক্রুক্স নল লইয়া পরীক্ষা করার সময়ে দেখিয়াছিলেন, ঋণ-রশ্মি (Cathode rays) ইলেক্‌ট্রনের প্রবাহ লইয়া কোনো জিনিষে ধাক্কা পাইলে, সেখান হইতে আর এক-রকম রশ্মি বাহির করে। এই রশ্মি সাধারণ ঋণ-রশ্মি নয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, যে-সব জিনিষ সাধারণ আলোক-রশ্মির

পথে বাধা দেয়, সেগুলি কোনোক্রমে এই রশ্মিকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু দস্তা লোহা প্রভৃতি অনেক ধাতুর এবং কাচের বাধা ইহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। অ্যালুমিনিয়ম্ দস্তা কাঠ কাগজ এই রশ্মির নিকটে অস্বচ্ছ। কাচের সঙ্গে সীসা মিশানো থাকে বলিয়া তাহাও অস্বচ্ছ। কেবল ইহাই নয়, তোমার আমার শরীরের মাংস এই রশ্মির পথে বাধা দিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়া যেমন আলো চলে, ইহা সেই-রকমে মাংস ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। কিন্তু হাড় ভেদ করিয়া চলিবার ইহার সাধ্য নাই। অর্থাৎ এক্স-রের কাছে হাড় অস্বচ্ছ।

ইহার নাম এক্স-রে হইল কেন, বোধ করি তোমরা জানো না। গণিতের কোনো অজ্ঞাত সংখ্যাকে X ধরিয়া অঙ্ক কষিতে হয়। এই রশ্মি কি-প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আবিষ্কারের অনেক দিন পরেও কোনো বৈজ্ঞানিক স্থির করিতে পারেন নাই। তাই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল, (X-Rays) অর্থাৎ অজ্ঞাত রশ্মি। কিন্তু এখন ইহার নাড়ী-নক্ষত্র সবই জানা গিয়াছে।

তোমরা বোধ হয় জানো, ঈথরের ঢেউয়ে আলো উৎপন্ন হয়। এই ঢেউ চোখে আসিয়া ঠেকিলে আমরা আলো দেখি। যে-সব ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য $\frac{২}{৬৩৫০০}$ ইঞ্চি, তাহাতে আমরা লাল আলো দেখিতে পাই। এই দৈর্ঘ্য কমিয়া যখন $\frac{১}{৬৭৫০০}$ ইঞ্চি হইয়া দাঁড়ায়, তখন বেগুনে আলো দেখা যায়। ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য এই দুই সীমার বেশি বা কম হইলে সে-সকল ঢেউয়ে আমাদের চোখ্‌ সাড়া দেয় না। আমরা যাহাকে এক্স-রে বলি, তাহাতে আলোক-রশ্মির ঢেউয়ের চেয়ে

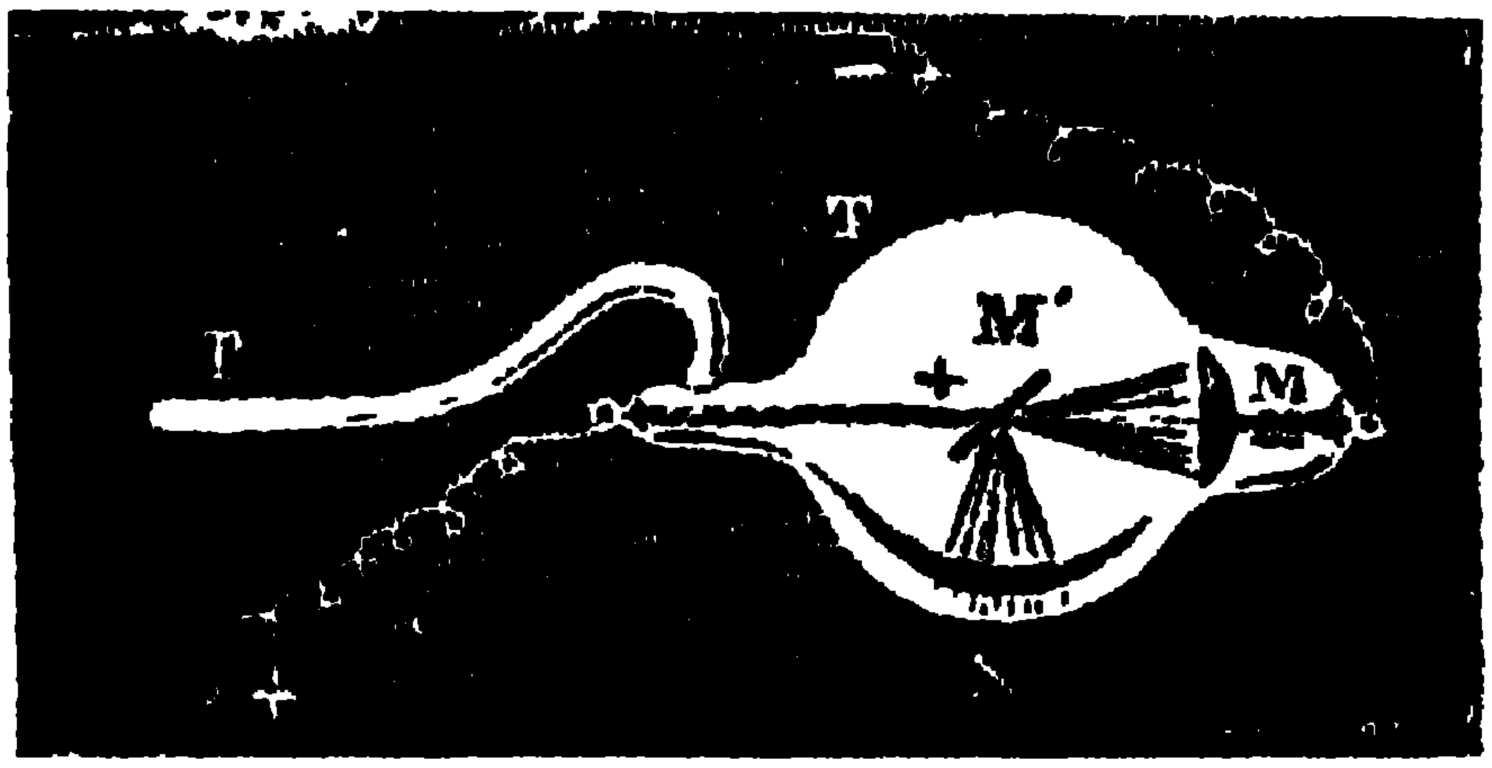

এক্স-রে-উৎপাদক যন্ত্র

অনেক ছোটো ঢেউ থাকে। তাই উহাতে আমরা আলো দেখিতে পাই না। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এক্স-রের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের হাজার ভাগের এক ভাগ

মাত্র। ভাবিয়া দেখ, এগুলি কত ছোটো। এত ছোটো বলিয়াই এই রশ্মির পথে কাঠ, কাগজ, রক্ত-মাংস বাধা দিতে পারে না। কিন্তু ফোটোগ্রাফের কাচে সাধারণ আলো পড়িলে যে-সকল রাসায়নিক কাজ হয়, এক্স-রে সেই-রকমেরই কাজ করে। কাঠের বা পেষ্ট-বোর্ডের বাক্সে ফোটোগ্রাফের কাচকে কাগজ মুড়িয়া রাখো এবং তার পরে বাহির হইতে বাক্সের উপরে এক্স-রে ফেলিতে থাকো। দেখিবে, ইহা কাঠ ও কাগজ ভেদ করিয়া ভিতরকার কাচগুলিকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। অদ্ভুত ব্যাপার!

যে-রকম যন্ত্র দিয়া আজকাল এক্স-রে উৎপন্ন করা হইতেছে, পরপৃষ্ঠায় তাহার একটা ছবি দিলাম। ছবিতে দেখ, রুম্‌কর্ফ-বেষ্টনীর তারের দুই প্রান্ত ক্রুক্‌স্-গোলকের দুই প্রান্তে লাগানো রহিয়াছে এবং গোলকের ভিতরে M-চিহ্নিত ধাতুর চাক্‌তি আছে। ইহা টংষ্টেন (Tungsten)-নামক ধাতু দিয়া তৈয়ারি এবং পেয়ালার মতো ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ (Concave)। তারের ঋণ-প্রান্তের সহিত এই পেয়ালার যোগ আছে। ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ আয়নায় যেমন সাধারণ আলোক-রশ্মি পুঞ্জীভূত হয়, এখানে ঋণ-রশ্মির (Cathode rays)

ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি পুঞ্জীভূত হওয়ার পরে M¹ চাক্‌তিতে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কাতেই এক্স-রে উৎপন্ন হয়। দেখ, ইহা ছবির X-চিহ্নিত জায়গা দিয়া বাহির

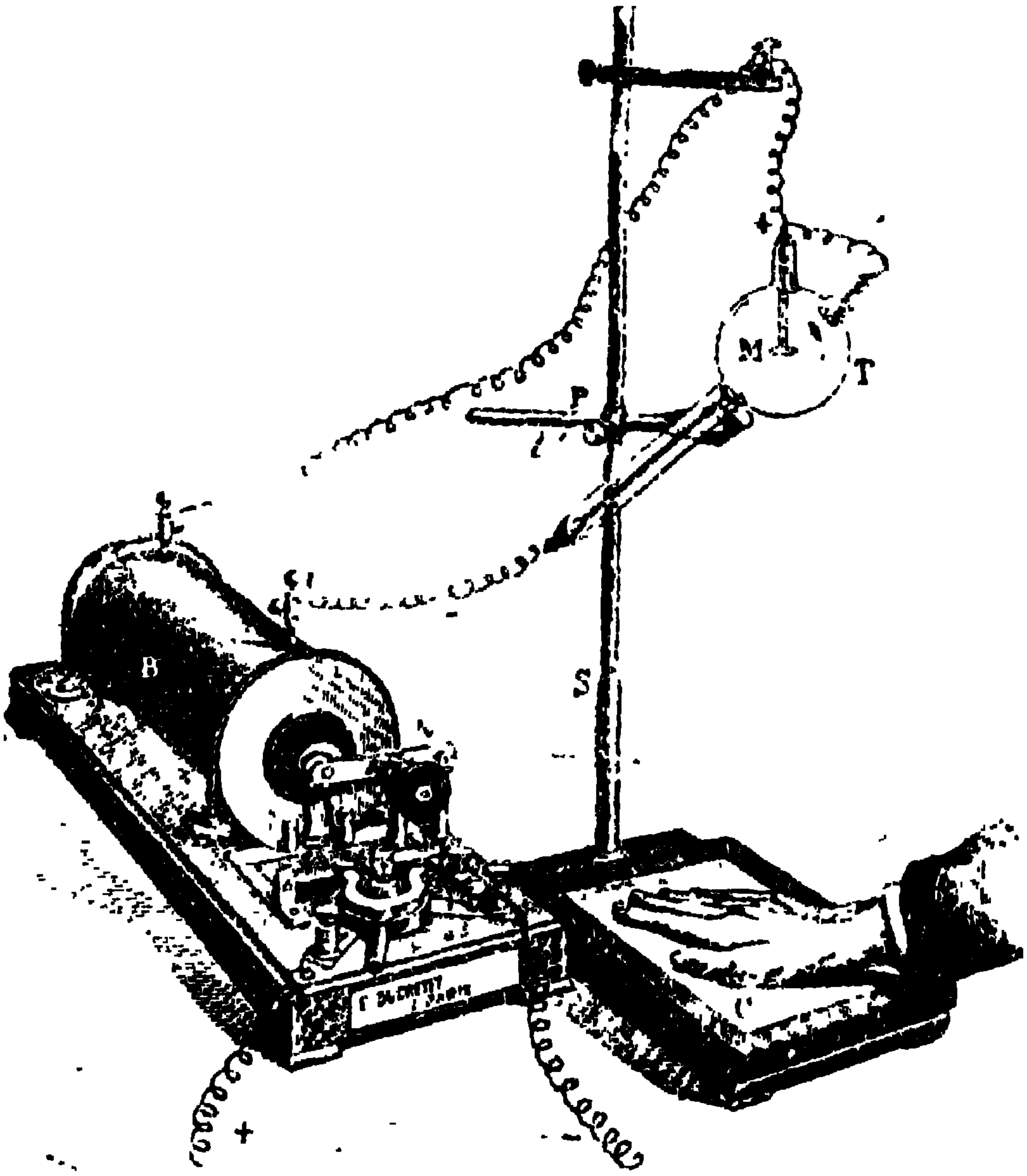

এক্স-রে দ্বারা হাতের হাড়ের ফোটোগ্রাফ গ্রহণ

হইতেছে। আগেই বলিয়াছি, যে-কাচে সীসা মিশানো থাকে, তাহা এক্স-রের পথে বাধা দেয়। এই

যন্ত্রের কাচে সীসা থাকে না, তাই কাচের আবরণ ভেদ করিয়া উহা অনায়াসে চলিতে পারে।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, প্রাণিদেহের রক্তমাংস এক্স-রেকে বাধা দিতে পারে না; কিন্তু ইহার হাড় ভেদ করিয়া চলার শক্তি নাই। এক্স-রের এই গুণটিকে চিকিৎসকেরা অনেক কাজে লাগাইতেছেন। মনে কর, আঘাত পাইয়া কাহারো হাতের বা পায়ের হাড় ভাঙিয়া গেল। হাড় থাকে মাংসের মধ্যে। কাজেই, কোন্ হাড় কোথায় ভাঙিল, চোখে দেখার উপায় থাকে না। আজকাল ডাক্তাররা এক্স-রে দিয়া শরীরের আহত অংশের ফোটোগ্রাফ্ লইতেছেন। মাংস এই রশ্মির পথে বাধা দেয় না। কাজেই, ছবিতে আহত অংশের কেবল হাড়গুলিরই আকৃতি দেখা যায়। এই আকৃতি পরীক্ষা করিয়া কোথায় কোন্ হাড় ভাঙিল, চিকিৎসকেরা অনায়াসে বলিয়া দিতেছেন। কেবল ইহাই নয়, যুদ্ধে আহত ব্যক্তির শরীরের কোন্ জায়গায় গুলি প্রবেশ করিয়া রহিল, তাহাও এক্স-রে দিয়া ধরা যাইতেছে। পরপৃষ্ঠার ছবি দুখানি দেখ। ডাইনের ছবিখানি সুস্থ হাতের হাড়ের চিত্র। এক্স-রে মাংস ভেদ করিয়া চলিয়াছে,

কিন্তু হাড়কে ভেদ করিতে পারে নাই। তাই ফোটোগ্রাফে হাড়ের ছবি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ডাইনের ছবিখানি বন্দুকের গুলিতে আহত হাতের

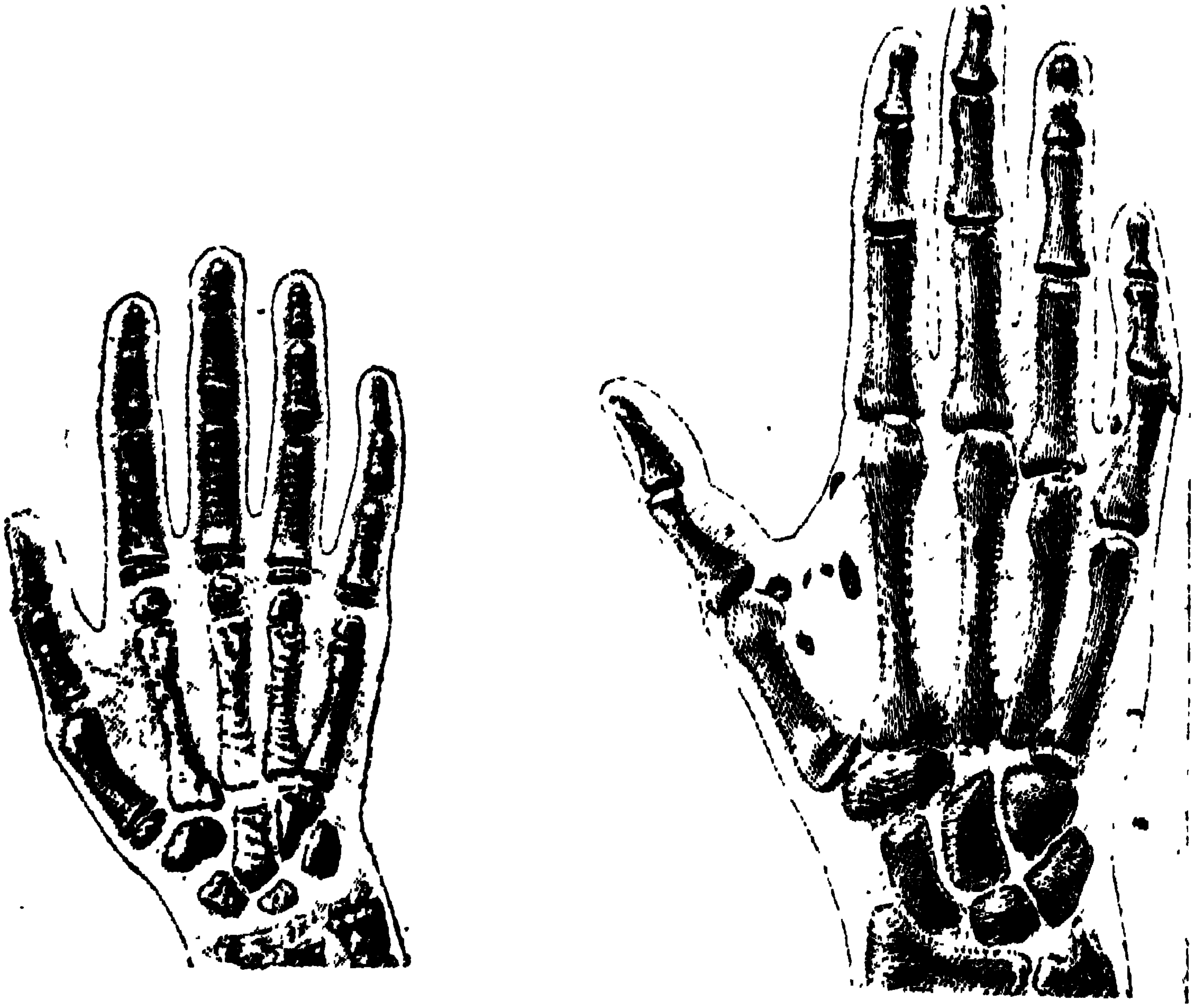

এক্স-রে ফোটোগ্রাফে হাতের হাড়

চিত্র। দেখ, ইহাতে হাড়ের আকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে মাংসের ভিতরকার গুলিরও ছবি দেখা যাইতেছে।

* আজকাল আমাদের দেশের প্রায় সকল বড়

হাসপাতালেই এক্স-রের যন্ত্র আছে। কেহ গাছ হইতে পড়িয়া বা কাদায় পিছলাইয়া হাত-পা ভাঙিলে সকলের আগে ডাক্তাররা এক্স-রের ছবি তুলিয়া পরীক্ষা করেন এবং তার পরে চিকিৎসা চলে।

এক্স-রে দিয়া ফোটোগ্রাফ্ তোলার ব্যবস্থা তোমরা ২২৮ পৃষ্ঠার ছবিতে দেখিতে পাইবে। দেখ, রুম্‌কর্ফ-বেষ্টনীর তার কাচের গোলকে এক্স-রে উৎপন্ন করিতেছে। ইহাই C-চিহ্নিত জায়গায় হাতের উপরে পড়িতেছে। হাতের তলায় কালো-কাগজে-মোড়া ফোটোগ্রাফের কাচ আছে। ইহার উপরেই এক্স-রে দ্বারা হাতের হাড়ের ছবি আঁকা হইয়া যায়।

বৈদ্যুত-তরঙ্গ

লীডেন্ জার্ বা অপর বিদ্যুৎ-সংগ্রহ যন্ত্রের (Condenser) দুই পিঠ যোগ করিলে বৈদ্যুতিক আন্দোলন হয়। ইহা বোধ করি তোমাদের মনে আছে। লীডেন্ জারের দুই পিঠ যোগ করিলে যে-মোটা স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়, তাহা একটা স্ফুলিঙ্গ নয়। জারের এক-একটা স্ফুরণে বাহির হইতে ভিতরে এবং ভিতর হইতে বাহিরে হাজার হাজার স্ফুলিঙ্গ থাকে। বিদ্যুতের এই আনাগোনা প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ, দুই লক্ষ এবং কখনো কখনো দশ লক্ষ বার হয়, বলিয়া আমরা স্ফুলিঙ্গগুলিকে পৃথক্ দেখিতে পাই না। যাহা হউক, বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের এই যে বাম হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে বামে আনাগোনা, তাহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা বৈদ্যুতিক আন্দোলন বলিয়া থাকেন। ব্যাপারটা বহুকাল হইতে বৈজ্ঞানিকদের জানা ছিল। কিন্তু ইহা যে, ঈথরে এক প্রকার আন্দোলন তোলে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কার।

ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের (Maxwell) নাম বোধ করি

তোমরা সকলে শুন নাই। ইনি কেম্‌ব্রিজ্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আচার্য্য ছিলেন। এত বড় পণ্ডিত বোধ করি গত শতাব্দীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়াছিলেন, জলে ঢিল ফেলিলে যেমন ঢেউ উঠে, বিদ্যুতের চলাফেরায় ঈথরে সেই-রকম ঢেউয়ের উৎপত্তি হয়। জলের ঢেউ সেকেণ্ডে দু হাত বা চারি হাত যায়, কিন্তু এই বিদ্যুতের ঢেউ চলে আকাশের চারিদিকে সেকেণ্ডে ১৮০,০০০ মাইল বেগে। অর্থাৎ আলোর ঢেউ যে-বেগে চলে, বিদ্যুতের ঢেউ অবিকল সেই বেগে ছুটিয়া চলে। ম্যাক্সওয়েল্‌ বলিলেন, আলোর উৎপত্তি যেমন ঈথরের ঢেউয়ে হয়, বৈদ্যুত চুম্বকের শক্তিও এক-রকম ঈথর-তরঙ্গে জন্মে। আলো উৎপন্ন হয়, ঈথরের পাশাপাশি কম্পনে এবং বিদ্যুৎ-প্রবাহ ও চৌম্বক-শক্তি জন্মে ঈথরের ঘূর্ণীপাকে। কিন্তু এত বড় আবিষ্কারটা কিছুকালের জন্য চাপা পড়িয়া রহিল। বিধি বাম হইলেন। ম্যাক্সওয়েল্‌ যখন প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার অনুমানের আলোচনা করিতেছিলেন, তখন ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

ইহার পরে য়ুরোপের আর এক প্রান্ত হইতে আর

একটি মহাসূর্য্যের উদয় হইল। ইহার নাম হার্জ (Hertz)। ইনি জর্ম্মানির অধিবাসী ছিলেন। ম্যাক্স-ওয়েল্ যে-বিদ্যুৎ-তরঙ্গের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু ম্যাক্সওয়েল্ ঈথরে যে ঘূর্ণীপাক কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। হার্জ দেখাইলেন, আলোর ঢেউ ও বিদ্যুতের ঢেউ একই ব্যাপার। তফাতের মধ্যে এই যে, আলোর ঢেউ খুব ছোটো, এক ইঞ্চিতে সেগুলি দেড় কোটী হইতে আড়াই কোটী পর্য্যন্ত পাশাপাশি থাকিতে পারে। কিন্তু বিদ্যুতের এক-একটা ঢেউ হয় প্রায় দুই-ইঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া ১১০০০ গজের সমান। তা'ছাড়া আলোর ঢেউয়ের যেমন প্রতিফলন ইত্যাদি হয়, বিদ্যুতের ঢেউয়েও যে সেগুলি আছে, তাহাও তিনি চোখের সম্মুখে দেখাইয়াছিলেন। হার্জের জয়-জয়কার হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে সার্ অলিভার লজ্ এবং আমাদের ভারতবর্ষে সার্ জগদীশচন্দ্র বসু নূতন নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ঈথরে বিদ্যুতের ঢেউ উৎপন্ন করিয়া নানা পরীক্ষা দেখাইতে লাগিলেন। জগদ্বাসী চমৎকৃত হইল। সকলে বুঝিতে পারিল, আলো ও বিদ্যুতের মধ্যে নাড়ীর যোগ আছে।

হার্জ যে-যন্ত্র দিয়া বৈদ্যুত-তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, এখানে তাহার একটি ছবি দিলাম। ছবির SS দুইটি ধাতুর গোলক, R-চিহ্নিত রুমকর্ফ-বেষ্টনীর তারের দুই প্রান্ত উহাতে লাগানো আছে। বেষ্টনী

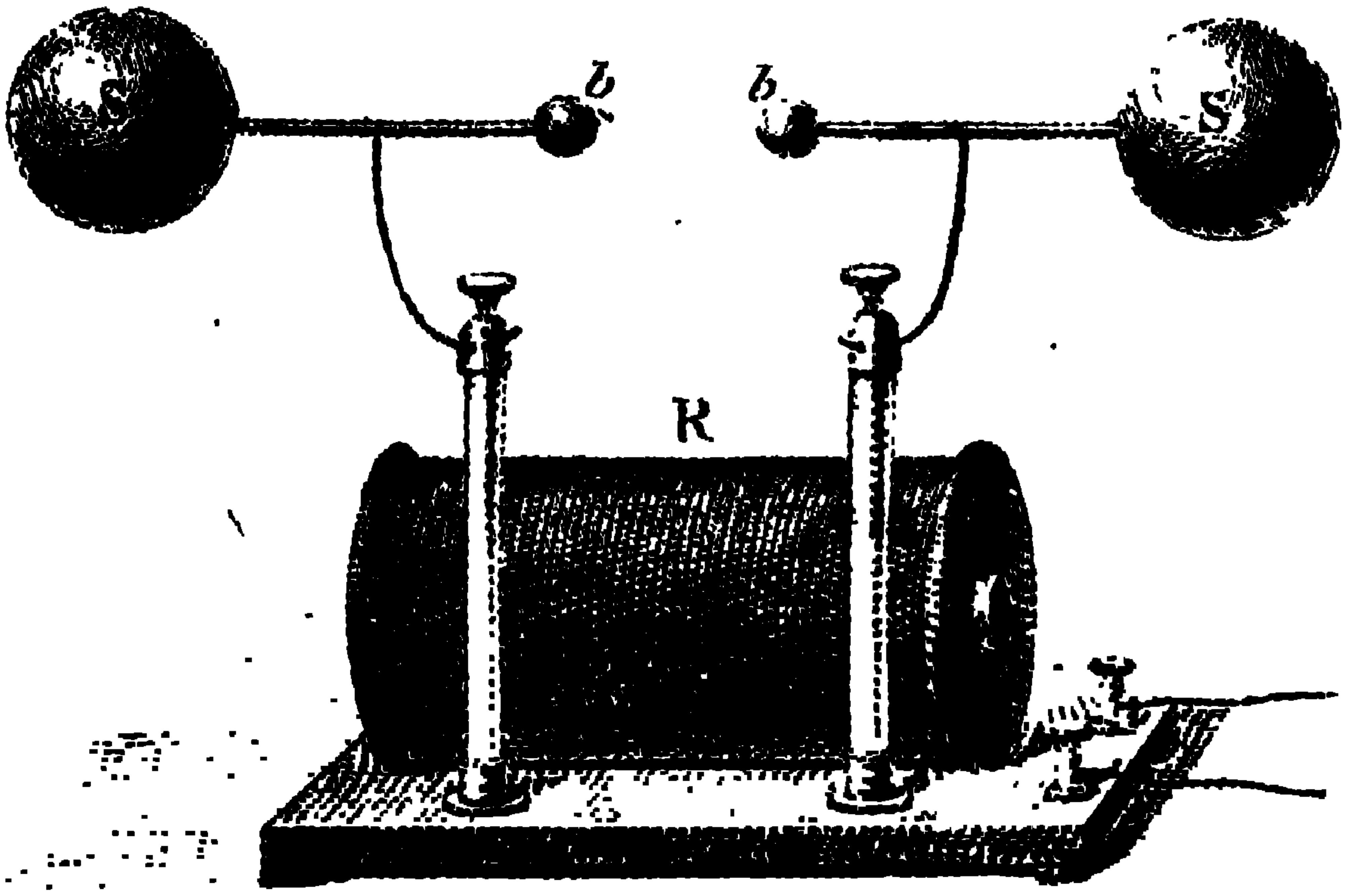

হার্জের তরঙ্গ-উৎপাদনের যন্ত্র

চালাইলেই bb-এর মাঝে ক্রমাগত বাঁ হইতে ডাইনে এবং ডাইন হইতে বাঁয়ে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ চলিতে থাকে। এই আন্দোলনেই চারিদিকের ঈথরে বিদ্যুতের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। তোমাদের আগেই বলিয়াছি, বিদ্যুতের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের মতো কোনো

নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে না। সেগুলি দুই ইঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ-ছয় মাইল পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। যন্ত্রের বিদ্যুৎ-ধারণ শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া হার্জ সাহেব বিদ্যুতের ঢেউকে ইচ্ছামতো ছোটো-বড় করিয়াছিলেন।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন হইল। কিন্তু সেগুলিকে ধরিয়া তাহাদের অস্তিত্ব জানার উপায় কোথায়? জলের ঢেউয়ে নদীর পাড় ভাঙে, জলের উপরকার সব জিনিষে ধাক্কা মারিয়া নাচায়। এগুলি চাক্ষুষ দেখা যায়। বাতাসের যে-ঢেউয়ে শব্দ হয়, তাহা কাণে ধাক্কা দিলে আমরা শব্দ শুনি, সার্সি-জানালাতে ধাক্কা দিলে সেগুলি ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে। আলোর ঢেউ চোখে আসিয়া পড়িলে আমরা আলো দেখি। তা'ছাড়া ইহার রাসায়নিক ক্রিয়াও চাক্ষুষ দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যুতের ঢেউয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে কি-রকমে? হার্জ সাহেব ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অল্প দিনের চেষ্টায় বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধরিবার ফাঁদ

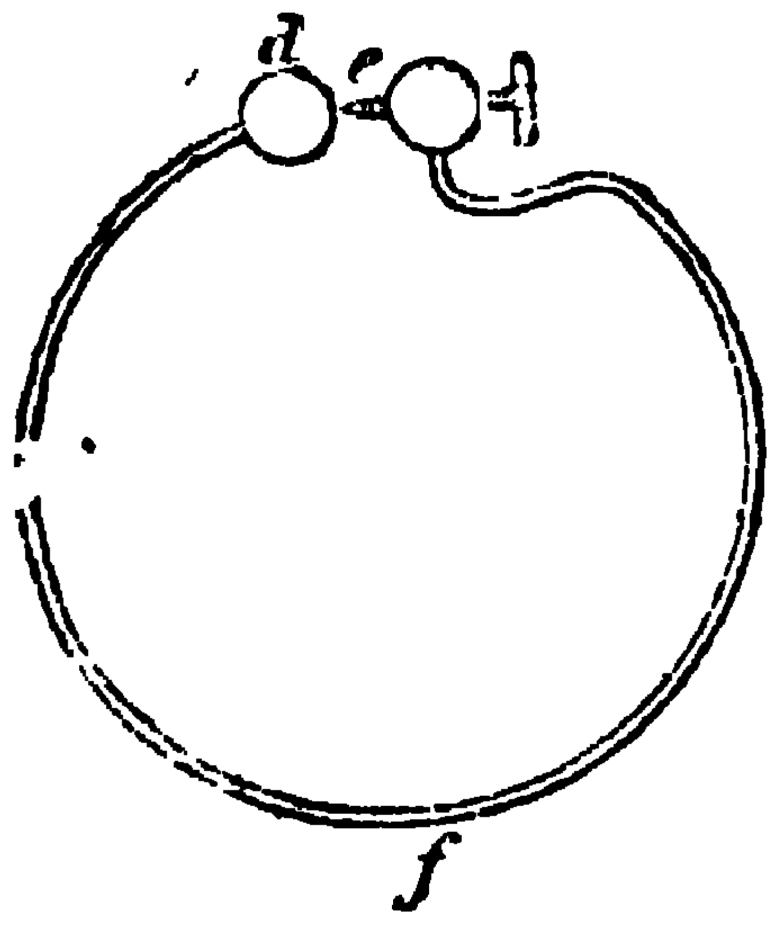

বৈদ্যুত-তরঙ্গ ধরার ফাঁদ

আবিষ্কার করিলেন। পূর্ব্বপৃষ্ঠায় যে-যন্ত্রটির ছবি দিলাম, তাহাই সেই ফাঁদ। যন্ত্রটি একটি এক হাত ব্যাসের তারের বৃত্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। ছবিতে দেখ, বৃত্তের বেড়ে একটু ফাঁক রহিয়াছে। স্ক্রু ঘুরাইয়া এই ফাঁককে ইচ্ছামতো ছোটো-বড় করা যায়। হার্জ সাহেব তাঁহার প্রথম যন্ত্র দিয়া বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তুলিতে লাগিলেন এবং এই ফাঁদে তাহাই ধরিতে লাগিলেন। দেখা গেল, তরঙ্গের আঘাতে ফাঁদের ফাঁকের ভিতর দিয়া একটু-একটু বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ যাওয়া-আসা করিতেছে। কিন্তু একটা মুস্কিল হইল। দেখা গেল, সব তরঙ্গে ফাঁদে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় না। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যেমন বাড়ে-কমে, তেমনি স্ক্রু ঘুরাইয়া ফাঁদের ফাঁকটা কম-বেশি না করিলে স্ফুলিঙ্গ হয় না। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ, এস্রাজ, বীণা প্রভৃতি যন্ত্রে অনেক জুড়ি তার বাঁধা থাকে। মূল তার বাজাইলেই তাহাদের কতকগুলি আপনিই কাঁপিয়া ঝঙ্কার দেয়। কিন্তু যে-সে তার এলোমেলোভাবে কাঁপে না। জুড়ির যে-সব তার মূল তারের সঙ্গে একই রকমে বাঁধা থাকে, কেবল সেইগুলিই আপনা হইতে বাজিয়া ঝঙ্কার দেয়। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধরার ফাঁদ যেন

এস্‌রাজের জুড়ি তার। যন্ত্র হইতে যে-তরঙ্গ উঠিতেছে, ফাঁদের ফাঁকটুকুকে তাহার সহিত মিলাইয়া যতক্ষণ নিয়মিত করা না যায়, ততক্ষণ ফাঁদে তরঙ্গ ধরা দেয় না।

বেতার টেলিগ্রাফ্

গত শতাব্দীতে টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোনের কাজ দেখিয়া জগদ্বাসী যে-রকম চমৎকৃত হইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীতে তারহীন টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোনে তাহার চেয়েও বেশি বিস্ময় উপস্থিত করিয়াছে। মাঝে দশ হাজার বা বিশ হাজার মাইলের ব্যবধান, টেলিগ্রাফ্-তারের সংযোগ নাই, তুমি একটা যন্ত্রে "টরে-টক্কা" শব্দে সঙ্কেত করিলে, নিমেষের মধ্যে অপর প্রান্তে সেই সঙ্কেত পৌঁছিল এবং সেখানকার লোকে তাহা শুনিয়া কোন্ খবর পাঠান হইতেছে জানিতে পারিল। সঙ্কেত মাঝের সাগর-মহাসাগর এবং পাহাড়-পর্ব্বতের বাধা মানিল না। আশ্চর্য্য নয় কি? কিন্তু এই আশ্চর্য্য ব্যাপার আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চলিতেছে।

তোমাদিগকে এখন বেতার টেলিগ্রাফের একটু আভাস দিব।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বেতার টেলিগ্রাফ্ কোনো বৈজ্ঞানিক একদিনে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নয়। ফ্যারাডে হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাক্সওয়েল, হার্জ, লজ্ এবং আমাদের পরম-পূজ্য সার্ জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিকের হস্তচিহ্ন এই যন্ত্রে রহিয়াছে। মালমসলা সকলি প্রস্তুত ছিল, এক ভাগ্যবান্ পুরুষ সেগুলিকে জুড়িয়া এই অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণের পথ দেখাইয়াছিলেন মাত্র।

ইটালির বৈজ্ঞানিক মার্কনির (G. Marconi) নাম বোধ করি তোমরা শুনিয়াছ। বড় বৈজ্ঞানিক বলিয়া ইহার খ্যাতি ছিল না। কিন্তু হাতের কাজে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। কল-কব্জা দিয়া যন্ত্র তৈয়ারি করার কাজ তাঁহার মতো কেহই পারিত না। যখন ম্যাক্সওয়েলের অনুমান অনুসারে হার্জ সাহেব বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া তাহার কাজ প্রত্যক্ষ দেখাইতে লাগিলেন, তখন মার্কনির মনে হইল, যখন বিনা-তারে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চলিয়া দূরের যন্ত্রে আত্মপরিচয় দেয়, তখন সেই তরঙ্গ দ্বারা দূরে সঙ্কেত পাঠানো সম্ভব

হইবে না কেন? মার্কনির অর্থ ছিল এবং সামর্থ্যও ছিল। তিনি বেতার টেলিগ্রাফ্ যন্ত্র তৈয়ার করিতে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু গোড়াতেই মুস্কিল হইল। মার্কনি দেখিলেন, হার্জের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দশ হাত বিশ হাত তফাতে চলিয়া যন্ত্রে সাড়া দিতে লাগিল, কিন্তু বেশি দূরে চলার শক্তি তাহাতে দেখা গেল না।

পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলিতে লাগিল। শেষে মার্কনি দেখিলেন, তরঙ্গ-উৎপাদক যন্ত্রের যে-দুইটা তারের ফাঁক দিয়া বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ চলে, তাহাদের একটাকে মাটির নীচে পুতিলে এবং আর একটাকে মাস্তুলের মতো করিয়া আকাশে খাড়া রাখিলে তরঙ্গ অনেক দূরে যায়। এই-রকমে তিনি দুই-তিন মাইল দূরে বিদ্যুতের তরঙ্গ পাঠাইতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই তরঙ্গ ধরিবার জন্য এক-রকম যন্ত্রও নির্ম্মাণ করিলেন। ইহা প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কি-রকম যন্ত্র দিয়া মার্কনি প্রথমে বেতার টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এখন ঠিক জানা যায় না। দেশ-দেশান্তরের বৈজ্ঞানিকেরা মিলিয়া তিলে তিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গের এমন পরিবর্ত্তন করিয়াছেন যে, তাহাতে মার্কনির কাঠামো খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল হয়।

এখানে খুব সাদাসিধে বেতার যন্ত্রের ছবি দিলাম। ইহা হইতে তোমরা আধুনিক যন্ত্রের মোটামুটি অংশ-গুলিকে জানিতে পারিবে। এই ছবির মতো যন্ত্র দিয়া আজকাল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া দূরে সঙ্কেত পাঠানো হইতেছে। সংবাদ পাঠানো হয় বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে Transmitter অর্থাৎ প্রেরক যন্ত্র। ছবিতে দেখ, B-চিহ্নিত রুম্‌কর্ফ-বেষ্টনী আঁকা আছে। C বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক যন্ত্র (Condenser)। A-চিহ্নিত অংশটি মার্কনির

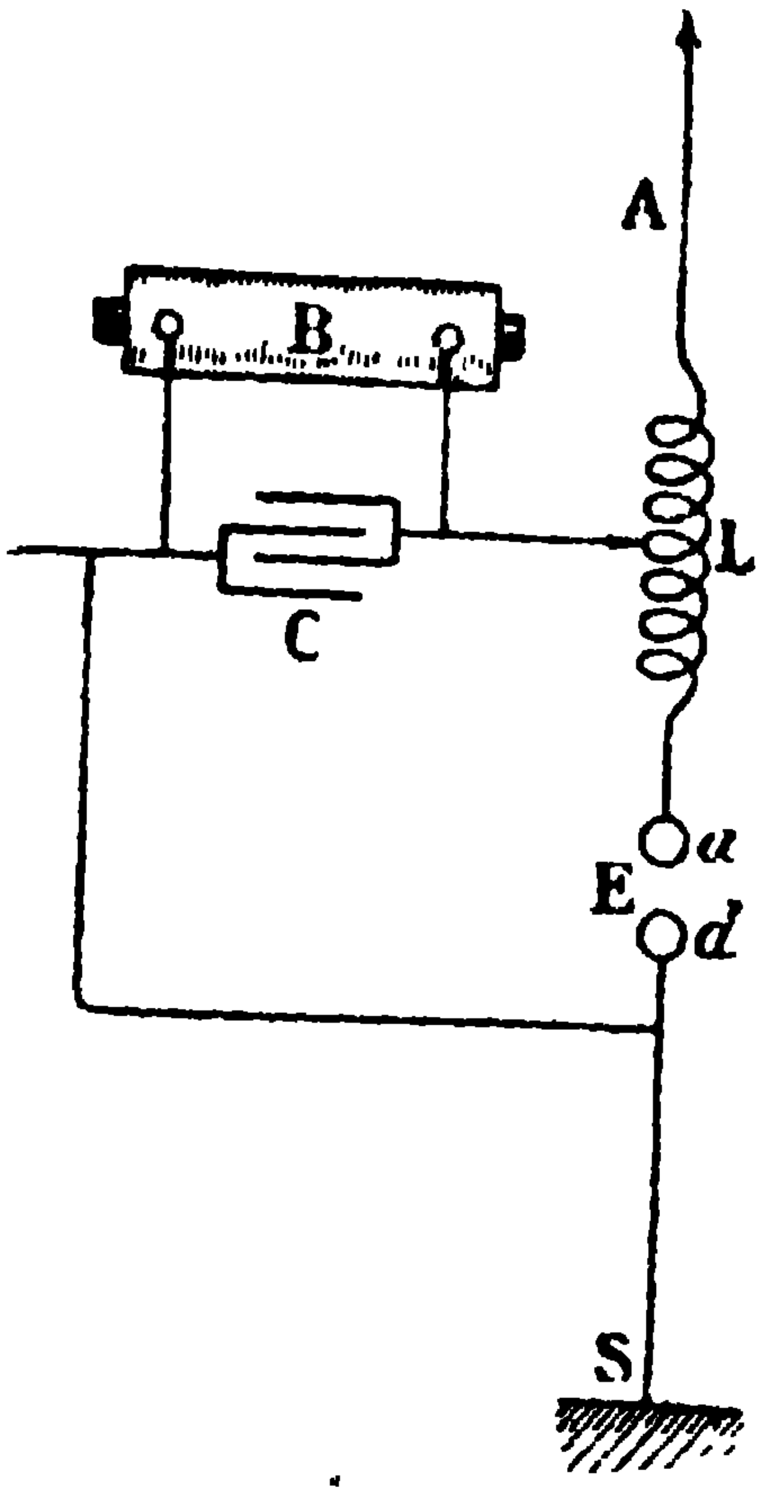

বেতার প্রেরক যন্ত্র

উদ্ভাবিত সেই মাস্তুল। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে Aerial আকাশ-তার। L একটি তারের বেষ্টনী। দেখ, রুমকর্ফ-বেষ্টনীর তারের এক প্রান্ত L-চিহ্নিত বেষ্টনীর সঙ্গে লাগানো আছে,—কিন্তু স্থায়িভাবে নয়। ইচ্ছা করিলে রুমকর্ফের তারকে L বেষ্টনীর দুই-দশ প্যাঁচ উপরে বা নীচে উঠানো-নামানো যায়। তার পরে দেখ, রুমকর্ফ-বেষ্টনীর তারের অপর প্রান্তটি একেবারে

মাটির সঙ্গে S-চিহ্নিত জায়গায় পোতা রহিয়াছে। তাহা হইলে বলিতে হয়, ঐ বেষ্টনীর একটা প্রান্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া ছবির *a*-চিহ্নিত জায়গায় এবং আর এক প্রান্ত d-চিহ্নিত জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে,—মাঝে আছে E-চিহ্নিত ফাঁক। রুমকর্ফের বেষ্টনী চালাইলে এই ফাঁকে স্ফুলিঙ্গ আনাগোনা করিয়া বৈদ্যুত আন্দোলন উপস্থিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে।

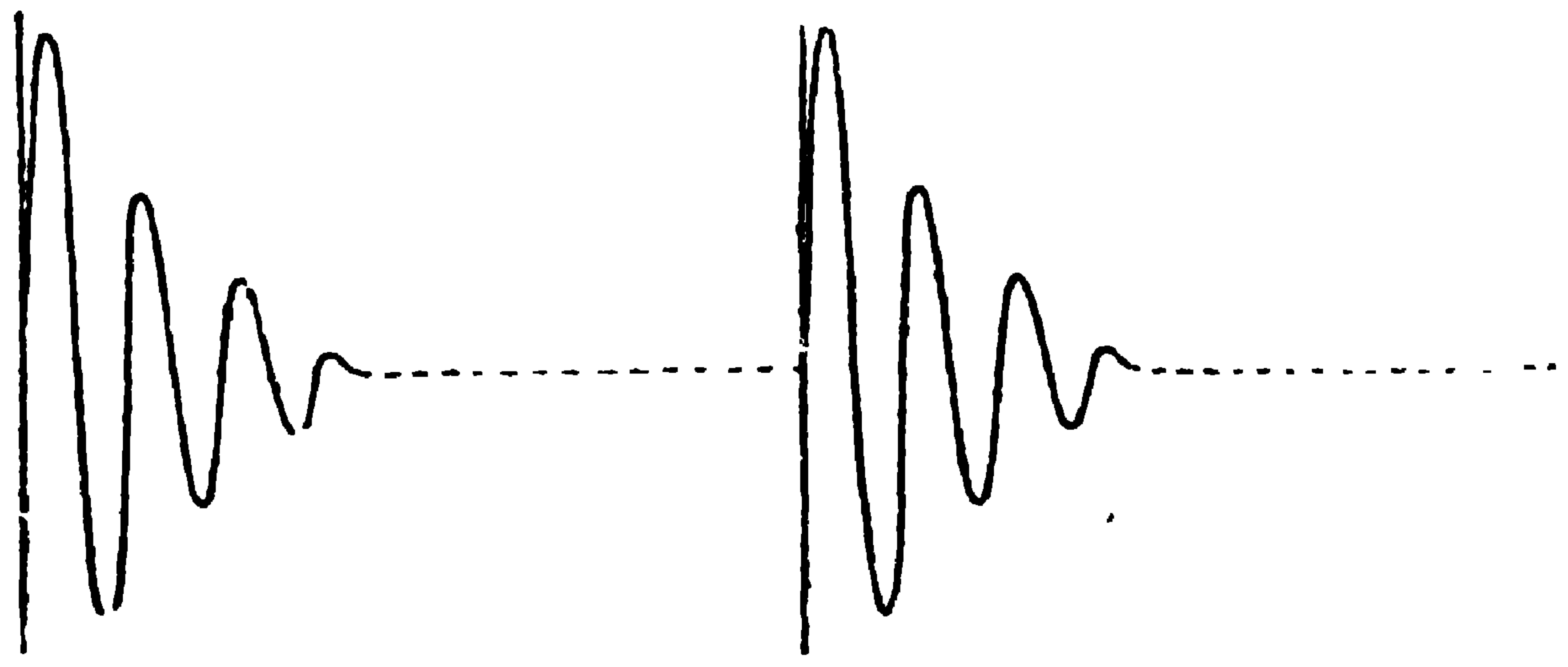

বিচ্ছিন্ন বৈদ্যুত তরঙ্গ

বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ধরাবাঁধা নাই। এগুলি অবস্থা-বিশেষে কখনো ছোটো এবং কখনো বড় হয়। বেতার টেলিগ্রাফ্ পাঠাইবার সময়ে প্রয়োজন অনুসারে ছোটো এবং বড় দুই রকম ঢেউয়েরই দরকার হয়। সুতরাং ইচ্ছামতো ছোটো-বড় ঢেউ তুলিবার ব্যবস্থা যন্ত্রে

থাকা প্রয়োজন। ছবিতে প্রেরক যন্ত্রের যে কাঠামো আঁকা আছে, তাহাতে ঐ ব্যবস্থা রহিয়াছে। উহার L-চিহ্নিত বেষ্টনীর উপরে বা নীচে রুমকর্ফের যে-তার লাগানো হয়, তাহা দিয়া ঢেউগুলিকে ছোটো বা বড় করা যায়। তা'ছাড়া আজকালকার যন্ত্রে তারের মাঝে যে বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক (Condenser) যন্ত্র থাকে, তাহা দিয়াও ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যকে নিয়মিত করা হয়।

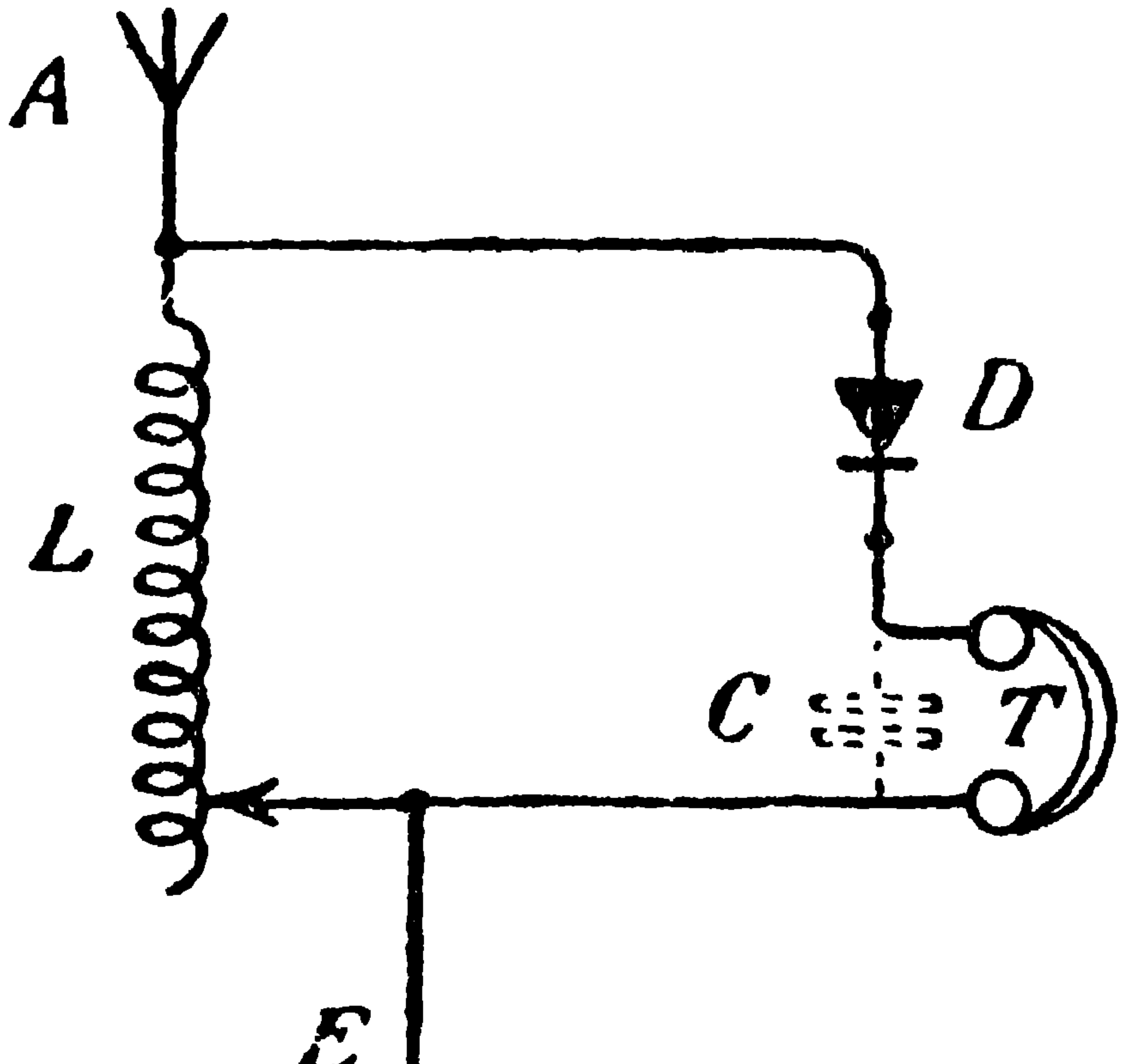

বেতার গ্রাহক যন্ত্র

বেতার-প্রেরক যন্ত্র দিয়া যে-বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বপৃষ্ঠায় তাহার ছবি দিয়াছি। ঢিল ফেলিয়া জলের

কোন জায়গাকে আন্দোলিত করিলে যেমন আলোড়িত জায়গা হইতে চারিদিকে ঢেউ ছুটিয়া চলে, এই ঢেউ সে-রকম নয়। বিদ্যুতের প্রত্যেক আন্দোলনের সঙ্গে প্রেরক যন্ত্র থামিয়া থামিয়া এক-একটা টুক্‌রা ঢেউ তোলে। ২৪৩ পৃষ্ঠা ছবিতে দেখ, সেই-রকম দুইটা টুকরা ঢেউ আঁকা আছে। গ্রাহক যন্ত্রে (Reciever) এই ঢেউগুলি ঠেকিলে, ঠিক্ এই রকমেরই টুক্‌রা টুকরা সঙ্কেত প্রকাশ করে। কাজেই, সাধারণ "টরে টক্কার" মতো সঙ্কেত প্রেরণের ইহাতে বাধা হয় না। এই সঙ্কেত চলে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ হাজার মাইল বেগে।

এই ত গেল বেতার-প্রেরক যন্ত্রের মোটামুটি কথা। এখন গ্রাহক যন্ত্রটা কি-রকম দেখা যাউক। ইহারো গঠন প্রেরক যন্ত্রের মতো। পূর্ব্বপৃষ্ঠার ছবিতে গ্রাহক যন্ত্রের চেহারা দেখিতে পাইবে। ইহাতেও সেই *A* চিহ্নিত আকাশ-তার *L*-চিহ্নিত বেষ্টনী এবং *C*-চিহ্নিত বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক রহিয়াছে। আকাশ-তারের নীচের *E* প্রান্ত মাটিতে পোতা আছে। এই যন্ত্রে বিদ্যুতের টুক্‌রা তরঙ্গ থামিয়া থামিয়া আসিয়া ঠেকিলে *T*-চিহ্নিত ফাঁকে সেই-রকম বিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সঞ্চার হয়। তার পরে ঐ ফাঁকে টেলিফোন্ লাগাইলে তাহাতে "টরে-টক্কা"

শব্দ শুনা যায়। কিন্তু মনে রাখিয়ো, প্রেরক যন্ত্র হইতে যতটা লম্বা ঢেউ বাহির হয়, গ্রাহক যন্ত্রকে সেই ঢেউ গ্রহণের উপযুক্ত না করিলে তাহাতে তরঙ্গের সাড়া পাওয়া যায় না। তাই কন্‌সার্টের বাদ্য-যন্ত্রগুলিকে যেমন সুর মিলাইয়া বাঁধা হয়, তেমনি বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রকে মিলাইতে হয়। এই ব্যাপারটাকে ইংরাজিতে Tuning অর্থাৎ সুর-মিলানো বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কাজটা মোটেই কঠিন নয়। L-চিহ্নিত বেষ্টনীকে ছোটো-বড় করিয়া এবং বিদ্যুৎ-সংগ্রাহকের শক্তিকে কমাইয়া বাড়াইয়া গ্রাহক যন্ত্রকে প্রেরক যন্ত্রের ঢেউ গ্রহণের উপযোগী করা চলে।

কিন্তু এখানে একটা মুস্কিল আছে। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, কথার আওয়াজে টেলিফোনের প্রেরক যন্ত্রে লোহার চাক্‌তির যে-কাঁপুনি হয়, তাহাই কাঁপুনির মাত্রা অনুসারে কখনো প্রবল এবং কখনো মৃদু বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া উহার গ্রাহক যন্ত্রের চাকতিকে কাঁপায় এবং ইহাতেই গ্রাহক যন্ত্রে কান পাতিয়া থাকিলে কথা শুনা যায়। সুতরাং বেতার প্রেরক যন্ত্রে যত তাড়াতাড়ি স্ফুলিঙ্গ আনাগোনা করে, গ্রাহক যন্ত্রের

টেলিফোনের চাক্তি ততই ঘন ঘন কাঁপে। এই কাঁপুনির সংখ্যা অবস্থাবিশেষে সেকেণ্ডে ১৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ পর্য্যন্তও হয়। কিন্তু সব কাঁপুনিতেই কি আমরা শব্দ শুনিতে পাই ? কখনই না। ভগবান্ আমাদের কান ছুটিকে এমনভাবে গড়িয়াছেন যে, কোনো জিনিষের ঘন কাঁপুনিতে বাতাসে যে-ঢেউ উঠে, তাহা কানে ঠেকিলে আমরা তাহার শব্দ শুনিতে পাই না। আবার কাঁপুনির সংখ্যা যদি নিতান্ত কম হয়, তাহাও আমাদের কানে শুনার মতো শব্দ উৎপন্ন করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা নানা পরীক্ষায় আমাদের শ্রবণ-শক্তির সীমা আবিষ্কার করিয়াছেন। কাঁপুনির সংখ্যা সেকেণ্ডে ষোলর বেশি এবং আটচল্লিশ হাজারের কম থাকিলেই আমরা শব্দ শুনিতে পাই। কিন্তু বিদ্যুৎ-তরঙ্গের আঘাতে টেলিফোনের চাক্তিতে যে-কাঁপুনি হয়, তাহার সংখ্যা আটচল্লিশ হাজারকে ছাড়াইয়া যায়, কাজেই ইহার শব্দ শুনা যায় না। আবার ঘন কম্পনে চাক্তি আড়ষ্ট হইয়া থাকে,—তখন তাহা মোটেই কাপে না। তাই, গ্রাহক যন্ত্রে কাঁপুনির সংখ্যাকে কমাইয়া আওয়াজকে ফুটাইয়া তোলা দরকার হয়। এই কাঁপুনি কমানোর

কাজ হয় যন্ত্রের D-চিহ্নিত অংশ দিয়া। এই অংশটির ইংরাজি নাম ভাল্‌ভ্ (Valve) বা ডিটেক্টর (Detector)। প্রেরক যন্ত্রের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন গ্রাহক যন্ত্রের আকাশ-তারে ঠেকিয়া তাহাতে বৈদ্যুতিক আন্দোলন উপস্থিত করে, তখন প্রত্যেক আন্দোলনের আধখানা ডিটেক্টরে বাধা পাইয়া যায়। ইহাতে আন্দোলন অর্দ্ধেক হইয়া দাঁড়ায়। এই-রকমে কাঁপুনির সংখ্যা কমানো হয় বলিয়াই টেলিফোনের "টরে টক্কা" শুনার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।

বেতার টেলিফোন্

বেতার টেলিফোন্, বেতার টেলিগ্রাফের চেয়ে বিস্ময়কর। মাঝে তারের সংযোগ নাই, তুমি প্রেরক যন্ত্রের টেলিফোনে কথা কহিলে, অমনি তাহা দশ হাজার বা বিশ হাজার মাইল দূরের গ্রাহক যন্ত্রে কান পাতিলেই শুনা গেল ? ইহা আশ্চর্য্য নয় কি ? এই আশ্চর্য্য ব্যাপার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজকাল চলিতেছে। আমরা সে-দিন খবরের কাগজে পড়িতেছিলাম, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ্ লণ্ডনে বসিয়া কথা কহিলেন, তাহা নিমেষের মধ্যে বেতার যন্ত্র দিয়া বোম্বাই সহরে পৌঁছিল এবং সেই কথা সহরের হাজার হাজার লোকে শুনিতে পাইল। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আজকাল বেতার খবরের রীতিমত ব্যবসা চলিতেছে। বেশি দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই- আমাদের এই কলিকাতা সহরে বেতার টেলিফোন্ লইয়া কি কাণ্ড হইতেছে, তোমরা দেখ নাই কি ? আজ কয়েক বৎসর হইল সায়ান্স কলেজে বেতার-প্রেরক যন্ত্র বসানো হইয়াছে। যন্ত্রের সম্মুখে দেশী ও বিলাতী নানা গান

বাজনা চলিতেছে। কলিকাতার লোকে নিজের বাড়িতে এক-একটা বেতার গ্রাহক-যন্ত্র বসাইয়া তাহা শুনিতেছে। সম্প্রতি এক বেতার কোম্পানি কলিকাতায় যে প্রকাণ্ড প্রেরক-যন্ত্র বসাইয়াছে, তাহার সাহায্যে ভারতবর্ষের যে-কোনো জায়াগায় খবর পাঠানো হইতেছে।

যাহা হউক, কি-রকমে বেতার টেলিফোনের কাজ চলে, তোমাদিগকে সেই কথাটি বলিব। এই যন্ত্রের আকৃতি-প্রকৃতি অবিকল বেতার টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের মতো। সুতরাং যন্ত্রের ছবি দিবার প্রয়োজন নাই। টেলিগ্রাফের প্রেরক-যন্ত্র হইতে কি-রকম খণ্ড খণ্ড ঢেউ বাহির হয়, তাহা তোমাদিগকে আগে ছবি দিয়া দেখাইয়াছি। এই ঢেউয়ে টেলিগ্রাফের হ্রস্ব-দীর্ঘ "টরে টক্কা" সঙ্কেত পাঠাইবার বাধা হয় না। কিন্তু বেতার টেলিফোনে ধারাবাহিক কথাবার্ত্তা শুনার কাজে, এই ঢেউ একেবারে অচল। ইহাতে যে-রকম ঢেউয়ের প্রয়োজন পরপৃষ্ঠায় তাহার একটা ছবি দিলাম। এই-রকম তরঙ্গ যখন প্রেরক-যন্ত্র হইতে বাহির হয়, তখনি সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কথাবার্ত্তার তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রে আসিয়া ঠেকিতে পারে। বিচ্ছিন্ন

ঢেউকে অবিচ্ছিন্ন করার হাঙ্গামা বিশেষ কিছুই নাই। **Triode Valve** নামক এক-রকম যন্ত্র দিয়া এই কাজটি করা হয়। যন্ত্রটির গঠন একটু জটিল, তাই তাহার বিবরণ এই পুস্তকের উপযোগী হইবে না।

অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুত-তরঙ্গ

ঢেউমাত্রেই দূরে চলিতে থাকিলে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসে এবং শেষে লোপ পায়। পুকুরের জলে ঢিল ফেলিয়া ঢেউ উৎপন্ন কর, দেখিবে, প্রথমে সেগুলি যত জোরে উঁচুনীচু হইতেছিল, দূরে গিয়া আর সে-রকম হইতেছে না এবং আরো দূরে গিয়া সেগুলি মিলাইয়া যাইতেছে। বিদ্যুতের তরঙ্গেও তাহা হয়। প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে যেমনি দূরে যায়, তেমনি সেগুলি ক্ষীণ হইয়া আসে। কাজেই, যে-সব ঢেউ দূরে আসিয়া ক্ষীণ হইয়াছে, সেগুলিকে কোনো উপায়ে সবল করিতে না পারিলে দশ হাজার

বিশ হাজার মাইল দূরের যন্ত্রে কথাবার্ত্তা শুনা অসম্ভব হয়। আমরা যে Triode Valve-এর কথা বলিলাম, সেই যন্ত্র দিয়া দুর্ব্বল ঢেউকে সবল করা চলে। এই যন্ত্রের গঠন-কৌশল জানা না থাকিলে, বেতার টেলিফোন্ নির্ম্মাণ কখনই সম্ভবপর হইত না।

সমাপ্ত

এই পুস্তকে ব্যবহৃত কতকগুলি বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা

Spark	...	স্ফুলিঙ্গ
Attraction	...	আকর্ষণ
Repulsion		বিকর্ষণ
Positive Electricity		ধন-বিদ্যুৎ
Negative Electricity		ঋণ-বিদ্যুৎ
Conductor	..	পরিচালক
Non-Conductor	...	অপরিচালক
Magnet	...	চুম্বক
Molecule	..	অণু
Atom	...	পরমাণু
Electron	...	ইলেকট্রন্
Proton	..	প্রোটন্
Nucleus	...	কোষ-সামগ্রী
Induction	...	আবেশ
Induced	...	আবিষ্ট
Lines of force	...	বল-রেখা

Capacity	...	ধারণ-শক্তি
Leyden Jar	...	লীডেন্ জার্
Electric Oscillation		বৈদ্যুতিক আন্দোলন
Potential	...	শক্তি
Unit	...	মাত্রা
Electro-magnet	...	বৈদ্যুত-চুম্বক
Ohm's Law	...	ওম্‌সের নিয়ম
Electromotive force		প্রবাহক-বল
Resistance	...	বাধা
Ampere	...	আম্পিয়ার
Ohms	...	ওম্‌স্
Coulomb	...	কুলম্ব
Intensity	...	প্রাখর্য্য
Specific resistance	...	আপেক্ষিক বাধা
Circular mil	...	বৃত্ত মিল্
Wheatstone Bridge		হুইট্‌ষ্টোন্ ব্রিজ্
Rheostat	...	রিওষ্টাট্
Switch	...	সুইচ্
Cell	...	কোষ
Battery	...	ব্যাটারি

In Series	...	মালাকারে
Volt	..	ভোল্‌ট্‌
In parallels	...	সমান্তরাল-ভাবে
Shunts	...	শাখা তার
Energy	...	শক্তি
Power	...	সামর্থ্য
Horse power	...	হর্স-পাওয়ার
Foot-pound	...	ফুট্‌-পাউণ্ড
Watt	...	ওয়াট্‌
Arc Light	...	আর্ক লাইট্‌
Fuse	...	ফিউজ, পলিতা
Electrolysis	...	বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ
Accumulator	...	সঞ্চয়ক কোষ
Galvanometre	...	বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্র
Magnetic field	..	চৌম্বক বলক্ষেত্র
Anode	...	ধনপ্রান্ত
Moving Coil	...	সচল বেষ্টনী
Amperemetre	...	আম্পিয়ার মিটার
Voltmetre	...	ভোল্‌ট্‌ মিটার
Primary Coil	...	মুখ্য বেষ্টনী

Secondery Coil	...	গৌণ বেষ্টনী
Induction Coil	...	আবেশ- বেষ্টনী
Self-Induction	...	আত্ম-আবেশ
Dynamo	...	ডাইনামো
Mechanical	...	যান্ত্রিক
Opaque	...	অস্বচ্ছ
X-ray	...	এক্স-রে
Concave	...	ন্যুব্জ
Cathode Ray	...	ঋণ-রশ্মি
Condenser	...	বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক
Electric wave	...	বৈদ্যুত তরঙ্গ
Wireless Telegraph	...	বেতার টেলিগ্রাফ্
Transmitter	...	প্রেরক যন্ত্র
Reciever	...	গ্রাহক যন্ত্র
Aerial	...	আকাশ-তার
Valve	...	ভাল্‌ভ্
Ditector	...	ডিটেক্টর
Wireless Telephone	...	বেতার টেলিফোন